ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা

তত্ত্ব ও প্রয়োগ

ইউসুফ আল-কারযাভী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা
তত্ত্ব ও প্রয়োগ

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

অনুবাদ
মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা: তত্ত্ব ও প্রয়োগ

মূল : ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

অনুবাদ : মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান

সম্পাদনা : ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব

ISBN : 978-984-8471-38-8

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

ফোন : ০২-৫৮৯৫৪২৫৬, ০২-৫৮৯৫৭৫০৯

E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com

Website : www.iiitbd.org

প্রথম প্রকাশ

মার্চ : ২০১৫

ফাল্গুন : ১৪২১

জমাদিউল উলা : ১৪৩৬

মূল্য : ২৪০.০০ টাকা মাত্র US $ 10.00

Islami Rashtrababostha: Thotto O Proyug (Min Fikhi Ad Dawlah Fil Islam) originally written by Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Translated by Md. Habibur Rahman. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka- 1230. Phone: 02-58954256, 02-58957509. E-mail: *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com*, Website: *www.iiitbd.org*, Price: BDT 240.00, US $ 10.00

প্রকাশকের কথা

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ মানুষের মধ্যে এমন একটি বিভাজন সৃষ্টি করতে সফল হয়েছে যারা বিশ্বাস করে ধর্মে রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো অস্তিত্ব নেই। তারা মনে করে ধর্ম পালন ও রাষ্ট্র পরিচালনা দু'টি ভিন্ন বিষয়। এর সফলতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হচ্ছেঃ সেক্যুলার মতবাদ যা একরকম সংঘাতের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশ করে এবং ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে পৃথক করার দাবিতে স্বোচ্চার ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ইসলামি জীবন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রব্যবস্থা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কথা কোনো ইসলামি ব্যক্তিত্বের নিজস্ব আবিষ্কৃত কোনো বিষয় নয়, বরং ইহা ইসলামের মূলগ্রন্থ, সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং ইসলামের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণিত বাস্তব একটি বিষয়। নিকট অতীতের মুসলমানরা এ বিষয়ে বেশ উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে। মুসলিম বুদ্ধিজীবিগণ ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বিশেষত ইবাদতের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে যেরূপ অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছেন, ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে গবেষণার ব্যাপ্তি ততটা বিশাল ও ব্যাপকতা লাভ করেননি।

তদুপরি, হিজরি পঞ্চদশ শতকে বসবাস করলেও বর্তমান যুগের অনেক ফকীহগণ এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন যা কয়েক যুগ পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। স্থবিরতায় আক্রান্ত এ সকল ফকীহগণ ভুলে গেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী র. স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর মতামত (মাজহাব) পরিবর্তন করেছিলেন। ইমাম আবু হানিফার র. অনুসারীরা যুগের ভিন্নতার কারণে প্রায়ই এক-তৃতীয়াংশ মাসআলায় তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং তারা আরো বলেছেনঃ 'যদি আমাদের ইমাম জীবিত থাকতেন তাহলে তিনিও তাঁর মত পরিবর্তন করে আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতেন'। একই বিষয়ে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের একাধিক মতামত পাওয়া যায়, এমনকি কখনো সাতটি বা ততোধিক পর্যন্ত। ব্যক্তি, সময়, যুগ, অবস্থা ইত্যাদির পরিবর্তনের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে থাকে।

এ বিষয়গুলো সামনে রেখেই ড. ইউসুফ আল-কারযাভী 'মিন ফিকহি আদ দাওলাহ্ ফিল ইসলাম' শীর্ষক এ আন্তর্জাতিক মানের গ্রন্থটি আরবিতে পেশ করেছেন। গ্রন্থটি 'ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থাঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ' শিরোনামে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছেন IIUM-এর পিএইচডি গবেষক জনাব মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান। সম্পাদনার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন CZM-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব। বিআইআইটি এ প্রয়াসের জন্য লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদকের নিকট কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করছে।

পাঠকদের হাতে গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে বিআইআইটি কর্তৃপক্ষ সত্যিই আনন্দিত। আশা করি জ্ঞানপিপাসু গবেষকদের নিকট এটি একটি বিশেষ উপহার হিসেবে বিবেচিত হবে। গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের প্রয়াস কবুল করুন। আমিন॥

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রকাশনা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

আল কুরআন থেকে -

বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হে মুসলিমগণ! আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা সব আমানত তার মালিককে ফিরিয়ে দেবে। যখন মানুষের বিরোধ করবে তখন বিচারক হিসেবে ন্যায়বিচার করবে। আল্লাহ্ তায়ালার উপদেশ সবসময়ই উত্তম। আর অবশ্যই আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

হে ইমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসূলের আর সেই সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল ও ক্ষমতার অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান এনে থাকো। এটিই সঠিক কর্মপদ্ধতি ও পরিণতির দিক দিয়েও উৎকৃষ্ট।

হে নবি! তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা এ মর্মে দাবি করে চলছে যে, তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি যা তোমাদের উপর নাজিল করা হয়েছে এবং সেইসব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমাদের পূর্বে নাজিল করা হয়েছিল; কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়গুলো ফায়সালা করার জন্য 'তাগুতে'র দিকে ফিরতে চায়, অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার হুকুম দেয়া হয়েছিল? শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সরল সোজা পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

> আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই জিনিসের দিকে, যা আল্লাহ্ নাজিল করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে, তখন তোমরা দেখতে পাও ওই মুনাফিকরা তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে (সূরা নিসা, ৪: ৫৮-৮১)।

সূচি

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। দরুদ ও সালাম মুহাম্মদ রসুলুল্লাহর সা. এর প্রতি তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি। আল্লাহ তায়ালা সবার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

অতঃপরঃ ...।

ইসলামে রাষ্ট্র গঠনের কতিপয় মূলনীতি হচ্ছে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। নিকট অতীতের মুসলমানেরা এ বিষয়ে বেশ উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে। মুসলিম বুদ্ধিজীবিগণ ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে যে ধরনের অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছেন ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে ততটা করেননি। এর ফলশ্রুতিতে গবেষনার ব্যাপ্তি যথেষ্ট বিশাল ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, বিশেষত ইবাদতের বিধি-বিধানের বিষয়টি।

ইমাম ইবনুল কাইয়েম (র.) তাঁর যুগে (অষ্টম শতাব্দী) সমসাময়িক ফকিহদের এ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে স্থবিরতার অভিযোগ করেছেন। তাঁর মতে, এর ফলে প্রয়োজনের নিরিখে রাজা-বাদশাহ ও শাসকবর্গ ইসলামি শরিয়াহ থেকে দূরে অবস্থান করে নিজেদের স্বার্থ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনার বিধি-বিধান তৈরি করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইমাম ইবনুল কাইয়েম র. শাসক গোষ্ঠীর পদভ্রষ্টতা এবং সহজ সরল ইসলামি জীবনব্যবস্থা থেকে তাদের দূরে অবস্থান ও এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির সকল দায়-দায়িত্ব স্থবির ও অলস ফকীহদের উপর চাপিয়েছেন। সম্ভবতঃ এভাবেই ইসলামি জীবনব্যবস্থার স্থলে মানবরচিত জীবনব্যবস্থার প্রথম অনুপ্রবেশ ঘটে।

বর্তমান যুগেও এ সব স্থবির ফক্বীহরা বেশ পশ্চাৎপদ অবস্থানে রয়েছেন। তারা এখন হিজরি পঞ্চদশ শতকে বসবাস করছেন বটে, কিন্তু এখনও তারা এমন মনোভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করেন যা কয়েক যুগ পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কয়েক যুগ পূর্বে অতিবাহিত হয়ে যাওয়া ফকীহগণ যে অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেছেন তার সবকিছুই এখন প্রায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে। স্থবিরতায় আক্রান্ত বর্তমানের এ সকল ফকীহগণ ভুলে গেছেন যে ইমাম শাফেয়ী র. স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর মতামত (মাজহাব) পরিবর্তন করেছিলেন। প্রাচীন ও নতুন নামে তার দু'টি মাজহাব পাওয়া যায়। ইমাম আবু হানিফার র. অনুসারীরা যুগের ভিন্নতার কারণে প্রায়ই এক-তৃতীয়াংশ মাসআলায় তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন, এবং তারা আরো বলেছেনঃ 'যদি আমাদের ইমাম জীবিত থাকতেন তাহলে তিনিও তার মত পরিবর্তন করে আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করতেন'। একই বিষয়ে ইমাম আহমদ

ইবনে হাম্বলের একাধিক মতামত পাওয়া যায়, এমনকি কখনো সাতটি বা ততোধিক পর্যন্ত। ব্যক্তি, সময়, যুগ, অবস্থা ইত্যাদির পরিবর্তনের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে থাকে।

বর্তমান সময়ে আমরা দেখে থাকি 'ফকীহ' ও 'মুফতী' বলে যারা নিজেদের পরিচয় দেন এবং ইসলামি জাগরণের পরিবারভুক্ত বলে দাবি করেন তাদের মধ্য থেকে অনেকে বলে থাকেন, শুরা বা পরামর্শ সভা ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যকীয়; এবং সেটি একটি নির্দেশনা (guidance) মাত্র! কোনো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অর্জনের নিমিত্তে রাষ্ট্রপ্রধান পরামর্শ তলব করতে পারেন, পরবর্তীতে তিনি ইচ্ছে করলে তা বাস্তবায়ন করতে পারেন, অথবা পর্দার অন্তরালে নিক্ষেপ করতে পারেন! রাষ্ট্রপ্রধানই শুরার সদস্য নিয়োগ দিবেন, পরবর্তীতে তার ইচ্ছে মোতাবেক কাউকে বহাল রাখবেন অথবা কাউকে বরখাস্ত করতে পারবেন।

আমরা দেখে থাকি অনেকেই ইসলামি রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় বহুদলের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন! আবার অনেকে রাষ্ট্রপ্রধান, সংসদ সদস্য ও শুরা সদস্য ইত্যাদি মনোনয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচনের ধারনা প্রত্যাখ্যান করেন। অনেকে ভোটের ক্ষেত্রে অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করাকে মেনে নিতে রাজি নন। আবার অনেকে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেয়াকে অস্বীকার করেন। তাদের মধ্যে কতিপয় এমনও রয়েছে যারা মনে করেন বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা কিছু উপহার দিয়েছে এর সবকিছুই খারাপ ও ইসলামি শরিয়াহ বর্হিভূত, এর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা উচিত।

আমরা দেখে থাকি, এ সকল ফকীহ মুফতীদের কেউ কেউ আবার মহিলাদের পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া তো দূরের কথা, বরং এদের ভোটাধিকার প্রদান করতেও রাজি নন। এর মাধ্যমে মূলত: মুসলিম জাতির অর্ধেকাংশকে সমাজের অকার্যকর যাবতীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে দূরে রাখতে চান।

শুধু তাই নয়, বরং এদের মধ্যে এমনও অনেকে রয়েছে যারা মনে করেন পার্লামেন্ট নির্বাচনসহ এ সব নির্বাচনে স্বেচ্ছায় মনোনয়ন নেওয়া জায়েজ হবে না, কারণ এর মাধ্যমে নিজের জন্য ক্ষমতার দাবি করা হয়। আর যে ক্ষমতা দাবি করে অথবা যে ক্ষমতা চায় তাকে ক্ষমতা দেওয়া হয় না।

ইসলামি রেনেসাঁ পরিবারের মধ্যে এ জাতীয় ব্যক্তিদের সংখ্যা নগন্য, যদিও তাদের কণ্ঠস্বর বেশ বলিষ্ঠ। ইসলামের পুনর্জাগরণের যারা বিরোধিতা করে এবং যারা সর্বস্তরে ইসলামে জাগরণকে রুখে দিতে চায় তারা সবাই নগণ্য কণ্ঠস্বরকে সর্বদা ফলাও করে প্রচার করে নিজেদের স্বার্থ আদায়ে সচেষ্ট থাকে।

জড়তা-স্থবিরতায় আক্রান্ত এ সব মুফতী ও ফকীহদের বিপরীতে আমরা অপর একটি দলের সন্ধান পাই যারা আল্লাহর বিধানের আলোকে শাসনকার্য পরিচালনা করে এমন রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং ধর্মকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বিবেচনা করে থাকে। তাদের ভাষ্যমতে রাজনীতিতে ধর্মের কোনো স্থান নেই এবং ধর্মে কোনো রাজনৈতিক সমাধান নেই। পাশ্চাত্যের জীবন খ্রিস্টধর্মের যে অবস্থা বিরাজ করছে প্রাচ্যে তারা ইসলামকেও সে অবস্থায় দেখতে চায়। অথচ ইসলাম তো খ্রিস্টধর্ম নয়, মসজিদও গীর্জাতুল্য নয়, ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস ঐতিহ্য এক ধরনের নয়। "আল্লাহর অধিকার আল্লাহকে দাও এবং কাইজারের অধিকার কাইজারকে দাও"- ইসলামে এ জাতীয় চিন্তাধারার কোনো স্থান নেই; বরং ইসলামের সুস্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে 'কাইজার' এবং তারা যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। ইসলাম কখনো জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-গবেষণা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, মুক্তচিন্তা ইত্যাদির বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেনি যেমনিভাবে পাশ্চাত্যের উপাসনালয়গুলো করেছিল। এমনিভাবে পাশ্চাত্যের উপাসনালয়ের পথ ধরে জীবিত-মৃত সকল উলামা, মাশায়েখ, বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও চিন্তাবিদদের নিঃশেষ করে দেওয়ার লক্ষ্যে তাদের বিরুদ্ধে প্রহসনমূলক বিচারকার্য সম্পাদন করার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

আমরা দেখে থাকি এ শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ইসলামকে পার্থিব ও ধর্মীয় ক্ষমতা থেকে মুক্ত করতে চায়; অথচ ইসলামে ধর্মীয় কর্তৃত্বের কোনো সুযোগ নেই, যা কিনা খ্রিস্ট ধর্ম রয়েছে। ইসলামকে তারা ধর্ম ও রাষ্ট্র থেকে দূরে রেখে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন অবস্থায় দেখতে চায়।

আমরা দেখে থাকি এসব লোক মুসলিম জাতিকে তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের গণ্ডি থেকে বের করে নিতে চায়। যুগ যুগ ধরে মুসলিম জাতির সুদৃঢ় ও সম্মিলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলাম হচ্ছে ধর্ম ও রাষ্ট্র, ইবাদত ও দেশ পরিচালনা, সালাত ও জিহাদ ইত্যাদির সমষ্টির নাম। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. ছিলেন ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপ্রধান। পরবর্তীতে তাঁর পথ ধরে চলেছেন খোলাফায়ে রাশেদীন। রসূলুল্লাহ সা.-এর অনুপস্থিতিতে ইকামাতে দ্বীন ও দুনিয়া পরিচালনার কাজে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার নামই খেলাফাত।

মার্কসবাদী ও লিবারেল এ সকল সেক্যুলার জনগোষ্ঠী মুখে ইসলামের জিকির তুলে, নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয়ও দেয়; কিন্তু ইসলামের জীবন বিধান মেনে চলতে তারা রাজি নয়। ইসলামের বিধি নিষেধের তারা কোন পরোয়া করে না। এমনকি অপব্যাখ্যার তাগিদেই তারা কুরআন-সুন্নাহর আশ্রয় নিয়ে থাকে।

নিজেদেরকে ইসলামের বিধান মোতাবেক নয়; বরং ইসলামের বিধানকে নিজেদের পছন্দ মাফিক ব্যবহার করাই তাদের কাছে মৌলিক কাজ হিসেবে বিবেচিত। অথচ ইসলামের ঘোষণানুযায়ী এটি সত্যিকার মুসলমানের কাজ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন: 'মুমিনদের পরিচয় হচ্ছে যখন তাদেরকে কোনো বিষয়ে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তার রসূলুল্লাহ সা. এর দিকে আহবান করা হয় তখন তারা বলে : 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্যের শির নত করলাম, আর এরাই হবে সফলকাম'।[১]

এ সব জনগোষ্ঠী জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপকে নিয়ে উপহাস করে থাকে; যার সাথে মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে পরিচিত হয়ে আসছে। ইসলামের এ রূপকে তারা 'রাজনৈতিক ইসলাম' (Political Islam) বলে নতুনভাবে নামকরণ করেছে। মনে হচ্ছে ইসলামের কতিপয় রূপ রয়েছে, যেমন: আধ্যাত্মিক ইসলাম, আদর্শিক ইসলাম, সামাজিক ইসলাম, রাজনৈতিক ইসলাম ইত্যাদি। মূলত: প্রকৃতি, উপাদান ও উৎস হিসেবে ইসলাম এক ও অভিন্ন। কুরআন ও সুন্নাহর এ ইসলাম এক ও অভিন্ন।

এ সব সেক্যুলার গোষ্ঠি যারা ইসলামের বাঁধনকে শিথিল করতে সর্বদা সচেষ্ট এবং স্থবিরতায় আক্রান্ত জনগোষ্ঠী যারা সমসাময়িক যুগ থেকে অনুপস্থিত অবস্থায় জীবন আতিপাত করে, এ দু'য়ের মাঝখানে অপর একটি মধ্যমপন্থী ইসলামি মতবাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যারা ইসলামকে তার সঠিক উৎস থেকে গ্রহণ করে থাকে এবং বিশ্বাস করে ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা; যেখানে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যার যথাযথ সমাধান রয়েছে। এ দল ইসলাম ও সময় উভয়ের চাহিদার সমন্বয় সাধন করতে সচেষ্ট থাকে, পুরাতন ও নতুন প্রয়োজনীয় সকল বিষয়কে একীভূত করে থাকে, নবায়নযোগ্য অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং স্থিতিশীল প্রমাণিত ও পরিবর্তনশীল বিষয়াবলীর মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে থাকে। জ্ঞান বৃদ্ধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে, চিন্তার পুনর্গঠন ঘটাতে, ধর্মীয় বিষয়াবলীতে ইজতেহাদ করতে এবং দুনিয়ায় নিত্য-নতুন জিনিস আবিষ্কার করার প্রতি আহবান করতে থাকে। এ দল মনে করে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্য সব নীতির তুলনায় প্রচলিত গণতন্ত্র ইসলামের খুবই কাছাকাছি এবং এর মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি দূর করে একে ইসলামি মূল্যবোধে সজ্জিত করা সহজসাধ্য ও সম্ভবপর।

---

[১] সুরা আন নূর, ২৪: ১৫

এ গ্রন্থ হচ্ছে মধ্যমপন্থী এ চিন্তা-চেতনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিধি-বিধান সম্বলিত। ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব কী? এ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকার হুকুম কী? এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী কী? এর প্রকৃতি কী? এটি কি বেসামরিক ও নাগরিক কোনো রাষ্ট্র যেখানে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়, নাকি স্বৈরাচারী ধর্মীয় পৌরহিত্য কোনো রাষ্ট্র? ইসলামি রাষ্ট্র ঈশ্বরতান্ত্রিক ধর্ম-রাষ্ট্রেরই প্রতিলিপি বলে মনে করেন তাদের প্রত্যুত্তরে কি বলা হবে? বহুদলীয় গণতন্ত্র, নারী এবং অমুসলিমদের বিষয়ে এ রাষ্ট্রে অবস্থান কী? কোনো ইসলামি দলের জন্য সেক্যুলার কোনো রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা বৈধ হবে কি-না? ইত্যাদি যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয় এ বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আশা করি আলোচ্য বইয়ের এ কয়টি অধ্যায় আমাদের ইসলামে রাষ্ট্রনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করতে, এ বিষয়ে উত্থাপিত বিভিন্ন সন্দেহের নিরসন ঘটাতে এবং স্থবিরতায় আক্রান্ত ও অস্বীকারকারী উভয় পক্ষের মাঝামাঝি অবস্থান নিতে সহযোগিতা করতে সক্ষম হবে।

এ বইয়ে যা লিখেছি তার কিছু অংশ ইতঃপূর্বে লিখিত আমার অন্যান্য বই থেকে চয়ন করেছি, বিশেষ করে 'ফাতওয়া মুআসারাহ' গ্রন্থের ২য় খণ্ড থেকে চয়ন করা হয়েছে। সম্ভবত রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত এ ফাতওয়া প্রমাণসহ ও স্পষ্টভাবে এখানেই বর্ণনা করা উত্তম হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন কথা বলেন যা প্রকৃত সত্য এবং তিনি সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।

ড. ইউসুফ আল কারযাভী
কায়রো
জুমাদা আল উলা ১৪১৭ হিজরি
১৫.০৯.১৯৯৬ ইং

প্রথম অধ্যায়

ইসলামে রাষ্ট্রের মর্যাদা ও গুরুত্ব

ইসলামে রাষ্ট্রের মর্যাদা

যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিম বিশ্বকে শাসন ও শোষণ করেছিল, তারা মুসলমানদের মন-মস্তিষ্কে এক ঘৃণ্য ও ধ্বংসাত্মক চিন্তা-চেতনা ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল যার সারসংক্ষেপ হচ্ছেঃ ইসলাম কতিপয় বিধি-বিধান সম্বলিত একটি ধর্মমাত্র, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষ রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করবে, এখানে ধর্মের কোনো স্থান নেই।

সাম্রাজ্যবাদ খ্রিস্ট ধর্মকে পাশ্চাত্যে যেভাবে গ্রহণ করেছে ইসলামকে প্রাচ্যে সেরূপে দেখতে চায়। পাশ্চাত্যে যেমনিভাবে ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পুনর্জাগরণ সম্ভব হয়েছে বলে তারা মনে করে, তেমনিভাবে পুনর্জাগরণের শ্লোগান তুলে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকেও তারা ধর্মের অনুশাসন থেকে মুক্ত করা আবশ্যক বলে মনে করে।

পাশ্চাত্যে ধর্মের রূপ হচ্ছে : গীর্জা, মহান পোপের দাপট, মানুষের জান-মালের উপর পুরোহিতদের স্বেচ্ছাচার ও জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি। প্রাচ্যের ধর্ম তথা ইসলামে এসবের অবস্থান কোথায়? এ ধর্মে পবিত্র পাদ্রি নেই, নেই কোনো পৌরহিত্য এবং তাদের জুলুম-অত্যাচার?[১]

যা হোক, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ মানুষের মধ্যে এমন একটি বিভাজন সৃষ্টি করতে সফল হয়েছে যারা বিশ্বাস করে ধর্মে রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোনো অস্তিত্ব নেই, রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো বিধি-বিধান এখানে বর্তমান নেই। তারা মনে করে ধর্ম পালন ও রাষ্ট্র পরিচালনা দু'টি ভিন্ন বিষয়। ইসলাম ধর্ম খ্রিস্ট ধর্ম থেকে ভিন্ন কিছু নয়। তাদের প্রচলিত ভ্রান্ত শ্লোগান হচ্ছেঃ "ধর্ম আল্লাহর এবং রাষ্ট্র সকলের"। এর ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়। এ শ্লোগানকে সম্পূর্ণভাবে উল্টিয়ে আমরা বলতে পারি, 'ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়ই আল্লাহর জন্য', অথবা 'ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়ই সকলের জন্য', অথবা এও বলতে পারি 'ধর্ম সবার জন্য এবং রাষ্ট্র আল্লাহর জন্য'।

---

[১] দেখুন : ড. মুহাম্মদ আল বাহী রচিত "আলফিকরুল ইসলামী আল হাদিস ওয়া সিলাতুহু বিল ইসতি'মার আল গারবী" নামক রাষ্ট্র নয় ধর্ম" শীর্ষক পরিচ্ছেদ।

"ধর্ম আল্লাহর জন্য", তাদের এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ ধর্ম হচ্ছে শুধুমাত্র মানুষ এবং তার প্রভুর মাঝে বিদ্যমান সম্পর্কের নাম, জীবন ও জগত পরিচালনার বিধি-বিধানের কোনো অস্তিত্ব এখানে নেই।

এর বাস্তব দৃষ্টান্ত হচ্ছে তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক প্রতিষ্ঠিত সেক্যুলার রাষ্ট্র যা ইসলামের সর্বশেষ রাজনৈতিক দুর্গ উসমানিয়া খেলাফতকে ধ্বংস করার পর জুলুম অত্যাচার ও রক্তপাতের মাধ্যমে তুরস্কের মুসলিম জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের অপর দেশগুলো ধীরে ধীরে নতুন তুরস্ককে তাদের মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। নাগরিক জীবন, ফৌজদারীসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের বিধি-বিধান প্রণয়নে ইসলাম ও এর বিধি-বিধানকে দূরে ঠেলে দেয়া হয়। ইসলাম শুধুমাত্র পারিবারিক আইনের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। এমনিভাবে সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামকে সংকীর্ণ পর্যায়ে আবদ্ধ করা হয় এবং এর বিপরীতে পাশ্চাত্য কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য জগত সংসারের সকল বিভাগের রাস্তা সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

আরবের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছেন যে আতাতুর্কের মনোভাবের প্রতি তাদের আবেগের লাগামকে টেনে ধরে রাখতে পারেনি। এমনকি মিসরের একজন বড় রাজনীতিবিদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তার এক বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বলেনঃ কামাল আতাতুর্ক এবং আধুনিক রাষ্ট্র সংক্রান্ত তার দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি পুরোপুরিভাবে শ্রদ্ধা করি এবং আমি রীতিমতো এর প্রতি মুগ্ধ... শহীদ হাসানুল বান্না রহ. সুস্পষ্টভাবে এর প্রতিউত্তর দেন, যা পরবর্তীতে "ইখওয়ানুল মুসলিমিন" নামক দৈনিকে প্রচার করা হয়।

পাশ্চাত্য কর্তৃক পরিচালিত স্নায়ু ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধের সফলতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হচ্ছেঃ সেক্যুলার মতবাদ যা এধরনের সংঘাতের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশ করে এবং যা ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে পৃথক করার দাবিতে স্বোচ্চার ভূমিকা পালন করে, এর ছোবল শুধুমাত্র সাধারণ নাগরিকদের আক্রমণ করে থেমে থাকেনি; বরং আল আযহারের মতো সুপ্রসিদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যারা পড়াশোনা করেছেন তাদের পর্যন্তও পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। আলী আবদুর রাজ্জাক রচিত "আল ইসলাম ও উসুলুল হুকম" এরই সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এখানে এ কথা উল্লেখ করতে হয় যে, উল্লেখিত গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সাথে সমাজে, বিশেষ করে আল আজহারের সীমানায় আলোচনার ঝড় তোলে। এর রচয়িতার বিরুদ্ধে বিচারকার্য সমাধানের জন্য আল আজহারের বড় আলেমদের

সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এমনটি আল আজহার কর্তৃক প্রদত্ত ডক্টরেট ডিগ্রী বাতিল করা হয় এবং আলেম সমাজ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। এ ভাবে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদগণ তার এ ভ্রান্ত চিন্তাধারার প্রতি-উত্তর দিয়েছেন।[২]

সেক্যুলার মতবাদ, এর ধারক বাহক এবং এর যথার্থতার যুক্তির অসারতা প্রমাণের লক্ষ্যে ইসলামের ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতার রূপ সবার কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং এর যাবতীয় বিধি-বিধান ইসলামি জীবন ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের স্বার্থকতা প্রকাশ পায় এবং তা ইসলামের ব্যাপকতার একটি উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে যাতে রয়েছে জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের এক সুন্দর ও সার্বজনীন সমাধান। "... এবং আমি আপনার উপর এমন কিতাব নাজিল করেছি যাতে রয়েছে সবকিছুর সমাধান এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ স্বরূপ" (আন নাহল, ১৬: ৮৯)[৩]।

ইসলামের মূলগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত দলিল-প্রমাণ

রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামি জীবন-ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অংশ, এ কথা কোনো ইসলামি আন্দোলন কিংবা এর আহবায়ক ও প্রতিষ্ঠাতাদের নিজস্ব আবিষ্কৃত কোনো বিষয় নয়, বরং এটি হচ্ছে ইসলামের মূলগ্রন্থ, সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং ইসলামের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট ইত্যাদির মাধ্যমে প্রমাণিত বাস্তব একটি বিষয়।

পবিত্র কুরআনের সুরা নিসায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আমানত তার যথাযথ মালিকের নিকট সোপর্দ করতে এবং ইনসাফের সাথে মানুষের মাঝে শাসনকার্য পরিচালনা করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন, নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু দেখেন এবং শুনে থাকেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তার রসুল এবং তোমাদের দায়িত্বশীল তথা শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য করো, যদি তোমরা কোনো

---

[২] যারা এর প্রতি উত্তর দিয়েছেন তাদের মধ্যে আল আযহারের সাবেক রেক্টর মুহাম্মদ আল খিজর হুসাইন এবং তৎকালীন মিশরের গ্রান্ড মুফতী শাইখ মুহাম্মদ বাখীত আল মুতিয়ী উল্লেখযোগ্য।

[৩] দেখুন : আমাদের গ্রন্থ (শুমূলুল ইসলাম তথা ইসলামের ব্যাপক রূপ) এবং "আল খাসায়িস আল আম্মাহ লিল ইসলাম তথা ইসলামের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য" নামক গ্রন্থের 'শুমূল' অর্থাৎ ইসলামের ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা শীর্ষক আলোচনা।

বিষয়ে বাক-বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ো তাহলে আল্লাহ ও তার রসুলের প্রদর্শিত পথেই ফিরে আস" (সুরা নিসা, ৪: ৫৮, ৫৯)।

প্রথম আয়াতে শাসকগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে তারা যেন আমানতের হেফাজত এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আমানত বিনষ্ট এবং ইনসাফের অনুপস্থিতি কোনো জাতির বা জনগোষ্ঠীর ধ্বংসের পথকে সুগম করে। বুখারি শরিফে বলা হয়েছে : "যখন আমানত বিনষ্ট করা হয় তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর"। জিজ্ঞেস করা হলো কিভাবে এর বিনষ্ট করা হয়? রসুল সা. বললেন: "অযোগ্য ও অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে যখন কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তখন কেয়ামতের (ধ্বংসের) অপেক্ষা করো"[৪]।

দ্বিতীয় আয়াতে মুমিন নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে: তারা যেন তাদের শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য করে, তবে সে শাসক অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে হতে হবে, এবং এ আনুগত্যকে আল্লাহ ও তাঁর রসুল সা.-এর আনুগত্যের পরে তাদের স্থান দেয়া হয়েছে, এবং ঝগড়া-বিবাদের মুহূর্তে মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসুল তথা কুরআন ও হাদিসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলা হয়েছে। এখান থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের জন্য অবশ্যই এমন রাষ্ট্র হবে যা তাদেরকে শাসন করবে এবং যার আনুগত্য করতে তারা বাধ্য থাকবে, অন্যথায় আয়াতের উল্লেখিত নির্দেশ অর্থহীন হয়ে পড়ে।

উল্লেখিত দু'আয়াতের আলোকে শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ "আস সিয়াসাহ আশ শরয়ীয়াহ ফি ইসলাহে আর রায়ী ওয়ার রাবীয়াহ" অর্থাৎ 'শাসনকার্য ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের মূলনীতি' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। পুরো কিতাবখানা উল্লেখিত দু'আয়াতের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে।

আমরা যদি হাদিসের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই রসুল সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি মারা যায় এমন অবস্থায় যে তার কাঁধে আনুগত্যের কোনো শপথ নেই, সে যেন জাহেলিয়াতের ওপর মৃত্যুবরণ করল"।[৫] অবশ্য নিঃসন্দেহে কোন মুসলমানের জন্য এমন শাসকের সামনে আনুগত্যের শপথ হারাম যে ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার অভ্যস্ত নয়। আনুগত্যের যে শপথ মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারে তা হচ্ছে এমন শাসকের আনুগত্যের শপথ করা

---

[৪] বুখারি, কিতাবুল ইলম, (হাদিস নম্বর ৫৯, ফাতহুলবারী ১/১৪১) আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত, 'রিকাক' অধ্যায়ে পুনরায় এসেছে।

[৫] মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিস, হাদিস নম্বর (১৮৫১)

যে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে। যদি এ ধরনের শাসন পাওয়া না যায় তাহলে মুসলমানই গুনাহগার হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত আনুগত্যের শপথ এবং ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়। এমতাবস্থায় দু'টি কাজ মানুষকে এ গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারে : একটি হচ্ছে: ইসলামি ব্যবস্থার বিপরীত পরিচালিত এ শাসনকার্য ঘৃণা ও অপছন্দ করতে হবে: যদিও তা অন্তর দিয়ে হয়। অপরটি হচ্ছে: এ অবস্থার পরিবর্তন করে একটি শক্তিশালী ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা কোন ফল বয়ে আনতে সক্ষম হবে না; বরং এই পথের পথিক সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। মুমিনরা তো একটি ভবনের মতো, যার একাংশ তার অপর অংশকে শক্তিশালী করে।

ইসলামের শাসন ব্যবস্থা হলো: খেলাফত, ইমামত, বিচার ব্যবস্থা, শাসকগোষ্ঠীর গুণাবলী এবং জনগণের ওপর তাদের আনুগত্যের অধিকার, ন্যায়ের কাজে তাদের সহযোগিতা করা, তাদের কল্যাণ কামনা করা এবং পছন্দ-অপছন্দ সর্বাবস্থায় আনুগত্যের লাগাম ধরে রাখা, শাসকগোষ্ঠীর কাজের ওপর ধৈর্য ধারণ করা এবং এ ধৈর্যের সীমা, শাসকের কাজ ও দায়িত্ব নির্ধারণ। যেমন : আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ, চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ গ্রহণ, বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে দায়িত্ব অর্পণ, সালাত কায়েম, যাকাত উসুল করা, সৎ কাজের আদেশদান এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করা ইত্যাদি শাসনকার্য ও রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় বিস্তারিত বিধি-বিধান সম্বলিত বহু বিশুদ্ধ হাদিস রসুল সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

তাই এ কারণেই আমরা দেখে থাকি শাসনকার্য ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি-বিধান আকীদা ও ইসলামের মূল বিষয়বস্তু সম্বলিত গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, যেমনিভাবে তা ফিক্হর গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে। তেমনিভাবে আমরা সাংবিধানিক, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধি-বিধানসহ ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগের ওপর লিখিত বিশেষ গ্রন্থাবলীও পেয়ে থাকি। যেমন : মাওয়ারদী এবং ইয়া'লা রচিত 'আহকামুস সুলতানিয়্যাহ', ইমামুল হারামাইন রচিত 'আল গিয়াছী', ইবনে তাইমিয়াহ রচিত 'আস সিয়াসাহ আশ শরয়ীয়াহ', ইবনে জামায়া রচিত 'তাহরীরুল আহাকাম', ইমাম আবু ইউসুফ ও ইয়াহয়া ইবনে আদম রচিত 'আল খারাজ', আবু উবাইদ ও ইবন যান্‌জাওয়াইহ রচিত 'আল আমওয়াল' ইত্যাদি। এ ছাড়াও আত তুরুক আল হুকমিয়্যাহ, আত তাবসিরাহ, মুয়িনুল হুক্কাম জাতীয় অনেক গ্রন্থের অস্তিত্ব পাওয়া যায় (যা ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তথ্য যোগানোর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম)।

ইসলামের ইতিহাস থেকে দলিল-প্রমাণ

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মুহাম্মদ সা. আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে তাঁর জীবনের যাবতীয় চিন্তা ও শক্তি দিয়ে একটি খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর দাওয়াতের জন্য এমন একটি ভূখণ্ড তৈরি করতে সচেষ্ট ছিলেন যেটা শুধুমাত্র মুসলমানদের ভূমি বলে পরিচিত হবে, যেখানে ইসলামের কর্তৃত্ব ব্যতীত অন্য কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। তাই তিনি নিজেকে সময় সুযোগমতো বিভিন্ন গোত্রের ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামনে উপস্থাপন করতেন, তাদের সামনে ইসলামের বাণী পেশ করতেন, তাদেরকে আহবান করতেন তারা যেন কালেমার দাওয়াতে সাড়া দেয় এবং তার দাওয়াতের হেফাজতে এগিয়ে আসে। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আওস ও খাজরাজ গোত্র থেকে আনসারদেরকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করেন। তাদের মধ্যে কালেমার বাণী প্রসার লাভ করার পর তাদের মধ্য থেকে নারী পুরুষের সমন্বয়ে ৭২ জনের একটি প্রতিনিধি দল হজ্জের মৌসুমে মক্কায় এসে মহানবির সা. হাতে এ মর্মে বাইয়াত গ্রহন করলো যে, তারা তাদের পরিবার ও জান-মালের মত নবিকে এবং নবির দাওয়াতকে হেফাতজ করবে। তারা নবির হাতে আনুগত্যের এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে শপথ গ্রহণ করল। মদিনায় একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও সুন্দর সমাজের গোড়া পত্তনের মাধ্যমে পরবর্তীতে বিশ্ববাসীকে একটি সুন্দর, নিরাপদ, আদর্শিক ও অনুসরণীয় মুসলিম রাষ্ট্র উপহার দেওয়ার জন্যই মূলত মহানবি সা. স্বীয় মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনার পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন।

মদিনা ছিল ইসলামের আবাসভূমি এবং নব্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্রভূমি যার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা.। তিনি ছিলেন মুসলমানদের নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক, যেমনিভাবে তিনি ছিলেন নবি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য প্রেরিত রসুল।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত এ রাষ্ট্রকে হেফাজত ও এর ভিত্তি মজবুত করার জন্য এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, এ রাষ্ট্রের ছায়াতলে জীবন অতিবাহিত করা এবং এর পতাকাতলে জেহাদে অংশগ্রহণ করা সে সময়ের প্রত্যেকটি মুসলমানের উপর ফরজ ছিল। কাফির দুশমনদের ভূখণ্ড ত্যাগ করে ইসলামের ভূখণ্ডে হিজরত করা এবং মুমিন মুজাহিদদের সাথে মিলিত হওয়া ব্যতীত তখন কারো ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করত না। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "যারা ঈমান এনেছে হিজরত করেনি তাদের সাথে মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা হিজরত করে" (সুরা

আনফাল, ৮: ৭২)। অন্যত্র বলা হয়েছে "যারা হিজরত করেনি তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না যতক্ষণ না তারা হিজরত করে"। (সুরা নিসা, ৪: ৮৯)[৬]

এভাবে ইসলামের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিতে ও ফরজ-ওয়াজিব পালন করতে অক্ষম হয়েও যারা স্বেচ্ছায় অমুসলিম ও কাফির রাষ্ট্রে বাস করে তাদেরকে তিরস্কার ও নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করে কুরআন নাজিল হয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন: "যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় জিজ্ঞেস করলো: আল্লাহ্র জমিন কি প্রশস্ত ছিল না? তোমরা কি সেখানে হিজরত করে অন্যস্থানে যেতে পারতে না? জাহান্নাম এসব লোকের আবাস স্থিরীকৃত হয়েছে এবং আবাস হিসেবে তা বড়ই খারাপ জায়গা। তবে যে সব পুরুষ, নারী ও শিশু যথার্থই অসহায় এবং তারা বের হওয়ার কোন পথ-উপায় খুঁজে পায় নি, আল্লাহ্র তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়" (সুরা নিসা ৪: ৯৭-৯৯)।

রসুলের সা. ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম সর্বপ্রথম যে কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন তা হচ্ছে তারা রসুল বিহীন উম্মতের রাষ্ট্রনায়ক মনোনীত করেছিলেন, এমনকি তারা রসুলকে সা. দাফন করার পূর্বেই তা সম্পন্ন করেছিলেন। তারা অতিদ্রুত আবু বকরের রা. হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তাদের যাবতীয় দায়িত্ব তার ওপর সোপর্দ করেন। পরবর্তী কয়েক যুগে এভাবেই চলে আসছে। তাই উল্লেখিত আয়াত ও হাদিসসহ সাহাবা ও তাবেয়ীগণ থেকে শুরু হওয়া এ ঐতিহাসিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে উলামায়ে কেরাম মতামত ব্যক্ত করেছেন যে রাষ্ট্রপতি বা সরকার প্রধান নিযুক্ত করা ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। মুসলমানদের খলিফা তথা রাষ্ট্রপতি বা সরকার প্রধানই হচ্ছেন ইসলামি রাষ্ট্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

সমসাময়িক যুগে সেক্যুলার মতবাদের আগ্রাসন শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানেরা তাদের ইতিহাসে কখনো ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার সাথে পরিচিত ছিল না। এ থেকেই রসুল সা. তাঁর উম্মাহকে সাবধান করেছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নির্দেশ দিয়েছেন। মুয়াজ রা. হতে বর্ণিত হাদিস: "সাবধান! ইসলামের চাকা ঘূর্ণায়মান, তোমরাও ইসলামের সাথে ঘুরতে থাকবে, সাবধান! অচিরেই কুরআন ও ক্ষমতা আলাদা হয়ে পড়বে, অর্থাৎ ধর্ম থেকে রাষ্ট্র অচিরেই পৃথক হয়ে যাবে, তোমরা আল্লাহ্র কিতাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না। সাবধান অচিরেই

---

[৬] ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে সকল সংগঠন চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের সাথে একাত্মতা গোপন করা বর্তমান সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করার বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। সাধ্যমতো এ কাজ আঞ্জাম দিতে সচেষ্ট থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।

তোমাদের ওপর এমন শাসক চেপে বসবে যারা নিজেদের জন্য এমন ফয়সালা করবে যা তোমাদের জন্য করবে না, তোমরা যদি তাদের আনুগত্য না কর তারা তোমাদের হত্যা করবে, আর যদি আনুগত্য করো তবে তোমাদের পথভ্রষ্ট করবে"। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন: আমরা তখন কি করব ইয়া রসুলুল্লাহ? তিনি বললেন: "তোমরা তা করবে যা করেছেন ঈসা ইবনে মরিয়মের আ. অনুসারীগণ, করাত দিয়ে তাদেরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং শূলে চড়ানো হয়েছে (এরপরও তারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরে আসেনি)। আল্লাহর নাফরমানী করে বেঁচে থাকার চেয়ে তাঁর আনুগত্যের পথে মারা যাওয়া করা অনেক শ্রেয়"[৭]।

ইসলামের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট থেকে দলিল-প্রমাণ

ইসলাম একটি ব্যাপক ও সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা যা জীবনের প্রতিটি দিককে ঘিরে আছে। মানব জীবনের কোন দিক বা বিভাগ এর সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত সমাধান থেকে বাদ পড়েনি। রাষ্ট্র পরিচালনার মতো মানব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ এ দিকটি ইসলামের সমাধান থেকে বাদ পড়বে তা কল্পনাতীত। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সুউচ্চভাবে এটাই দাবি করে যে রাষ্ট্র পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি ইসলাম ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিকদের মন-মস্তিষ্কের উপর ছেড়ে দিতে পারে না। যে তারা তাদের খেয়ালখুশি মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করবে; বরং এক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামি জীবনব্যবস্থার সুন্দর ও যৌক্তিক সমাধান।

তেমনিভাবে এ জীবনব্যবস্থা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও দায়িত্বশীলতাকে স্বাগত জানায় এবং বিশৃঙ্খলা, দায়িত্বহীনতা ইত্যাদিকে অপছন্দ করে। তাই আমরা দেখি রাসুল সা. আমাদেরকে নামাজের মুহূর্তে সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ হতে এবং আমাদের মধ্যে বিজ্ঞজনকেই ইমামতির দায়িত্ব পালনে নির্দেশ করেছেন, এমনকি সফরে থাকাকালীন আমাদের একজনকে দলপতির দায়িত্ব পালন করতে নির্দেশ করেছেন।

---

[৭] ইমাম বুসীরি 'ইত্তেহাফ' গ্রন্থে বলেন : ইছহাক ইবনে রাহাওয়াই তার মুসনাদ গ্রন্থে সুয়াইদ ইবনে আব্দুল আজীজ থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেন। তিনি দুর্বল, এবং আহমদ ইবনে মুনী' নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণনা। দেখুন : ইবনে হাজার প্রণীত আল মাতালিব আল আলিয়া, তাহকীক : শাইখ হাবীবুর রহমান আল আ'জমী, ধর্মমন্ত্রনালয় কুয়েত থেকে প্রকাশিত, ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নম্বর - ৪৪০৮।

ইমাম তাবরানীও এ হাদিস বর্ণনা করেন। সেখানে ইয়াজীদ ইবনে মারছাদ রয়েছেন, তিনি হযরত মুয়াজ থেকে শ্রবণ করেননি, ইবনে হিব্বানসহ অনেকেই তাকে নির্ভরশীল বলেছেন, আবার অনেকেই তাকে দুর্বল বলেছেন, এছাড়া অন্যান্য সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। দেখুন হাইছামী রচিত মাজমায়ুয যাওয়ায়িদ - (৫/২৩৮)।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. "আস সিয়াসাহ আশ শরয়ীয়াহ" গ্রন্থে বলেন: একথা জানা আবশ্যক যে মানব সমাজ তথা রাষ্ট্র পরিচালনা করা ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকীয় দায়িত্বের মধ্যে একটি দায়িত্ব; বরং দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টির সত্যিকার অস্তিত্ব এর ওপর নির্ভরশীল। সমাজবদ্ধ জীবনযাপন ব্যতীত মানুষ তার সকল প্রয়োজনীয় কাজের সমাধান করতে সম্ভব হয় না। তাই যেখানেই সমাজ, যেখানে মানুষের মিলন সেখানেই নেতা বা দলপতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই রসুল সা. বলেছেন: "তোমাদের তিনজন যখন সফরে বের হয়, তখন যেন একজনকে দলপতি নির্বাচন করে নেয়া হয়"। (ইমাম আবু দাউদ আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেন")।[৮] ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, রসুল সা. বলেন: "তিনজনের জন্য কোথাও ভ্রমণে বের হওয়া জায়েজ হবে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের একজনকে দলনেতা মনোনীত করে নেয়"। সফরের মতো সাময়িক ও ছোট দলের জন্যও দলপতি মনোনয়নকে আবশ্যক করার মাধ্যমে রসুল সা. মূলতঃ গুরুত্বপূর্ণ ও সকল প্রকারের জনসমষ্টির জন্য দলপতি মনোনয়নের আবশ্যকতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

অপরদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'সৎ কাজের প্রতি আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করাকে আবশ্যক করেছেন', আর শক্তি এবং নেতৃত্ব ব্যতীত এই আদেশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এমনিভাবে জিহাদ, ইনসাফ কায়েম, হজ, জুমআ ও ঈদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন, মজলুমের সহযোগিতা, শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন ইত্যাদি কর্মসূচিগুলো শক্তি এবং নেতৃত্ব ব্যতীত আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয় না। তাইতো বলা হয় "রাজা-বাদশাহগণ জমিনে আল্লাহর ছায়াতুল্য"। তাই ফুজাইল ইবনে আয়াজ, আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ পূর্বসুরীগণ বলতেন: "আমাদের যদি দোয়া কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা থাকত তাহলে আমরা রাজা-বাদশাহদের জন্য দোয়া করতাম"[৯], কারণ তাদের কল্যাণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা অনেক মানুষের কল্যাণ সাধন করেন।

মানবতার জন্য খোদার পক্ষ থেকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রেরিত ইসলামের প্রকৃতি এটাই দাবি করে যে ইসলামই মানব সমাজের পরিচালনা করবে, দিকনির্দেশনা দিবে। ব্যক্তি ও সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান মোতাবেক নিয়ন্ত্রণ করবে। তাই ইসলামের ব্যাপারে এ ধারণা করা অমূলক হবে যে এটি শুধু ওয়াজ নসীহত,

---

[৮] ইমাম তাবরানী আব্দুল্লাহ থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন, হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। দেখুন মাজমায়ুয যাওয়ায়েদ (৫/২৪৯)।

[৯] দেখুন : ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া থেকে আসসিয়াসাহ আশ শরিয়াহ (২৮/৩৯০, ৩৯১)।

খুতবা ও বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এটাও ধারণা করা যায় না যে ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান শুধুমাত্র ব্যক্তির বিবেকের প্রতিই হবে, অতঃপর যখন ব্যক্তি বিবেক অসুস্থ বা মৃত্যুবরণ করবে সাথে সাথে ইসলামের বিধি-বিধানগুলোও অসুস্থ ও অকার্যকর হয়ে পড়বে। ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান রা. বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা রাজা-বাদশাহদের মাধ্যমে এমন সকল কাজ থেকে বারণ করেন যা কুরআনের মাধ্যমে করেন না"।

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছে যাদেরকে কিতাব ও ন্যায়ের মানদণ্ড সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়, আবার কতিপয় এমনও রয়েছে শুধুমাত্র শাস্তির ভয় এবং বাহুবলই যাদেরকে অসৎ পথ থেকে টেনে আনতে সক্ষম হয়। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: "অবশ্যই আমি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনাসহ রসূলদের প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কুরআন ও ন্যায়ের মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছি যা মানুষকে ইনসাফের সাথে সঠিক পথে পরিচালনা করবে, এবং আমি লৌহ অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে কঠিন শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার" (আল হাদিস/২৫)। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: যে ব্যক্তি কুরআনের পথ থেকে বিচ্যুত হবে লৌহের মাধ্যমে তাকে সোজা করে দেয়া হবে। আর এজন্যই দ্বীনের মূল অবলম্বন হচ্ছে কুরআন এবং তরবারী[১০]।

ইমাম গাজালী র. বলেন: "দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের কৃষিক্ষেত। পার্থিব জগত ব্যতীত দ্বীনের পরিপূর্ণতা সাধন হয় না। ধর্ম এবং রাষ্ট্র সহোদর ভাইতুল্য। ধর্ম হচ্ছে মূল ভিত্তি, সরকার প্রধান হচ্ছে এর রক্ষক। যার কোনো মূল ভিত্তি নেই তার ধ্বংস অনিবার্য এবং যার কোনো রক্ষক নেই তার বিনষ্ট অনিবার্য। আর সরকার প্রধান ব্যতীত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের হেফাজত অসম্ভব"।[১১]

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতার পক্ষে যদি কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট দলিল নাও থাকত, রসুল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের বাস্তবিক জীবনের ইতিহাসে যদি এর প্রয়োগ নাও পাওয়া যেত, তবুও ইসলামি জীবন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও এর প্রকৃতিই স্বয়ং দাবি করে যে ইসলামের জন্য নিজস্ব একটি ভূ-খণ্ড তথা রাষ্ট্র আবশ্যক যা ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা, বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতি, চারিত্রিক মূল্যবোধ, শিক্ষা ও আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদির সমন্বয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে।

ইসলামের জন্য সকল যুগে এমন একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্রের কোনো বিকল্প নেই, বিশেষ করে বর্তমান যুগে এর প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। বর্তমান যুগে যেখানে

---

[১০] মাজমুয়ুল ফাতওয়া ২৮/২৬৪।

[১১] ইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন ১/৭১, কিতাবুল ইলম।

'আদর্শিক রাষ্ট্রের' আবির্ভাব হয়েছে এবং তা এমন একটি রাষ্ট্র যা নিজস্ব একটি আদর্শ ও চিন্তা-চেতনার লালন করে থাকে; আবার যার মূল ভিত্তি এ চিন্তা-চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার শিক্ষা-সংস্কৃতি, আইন-আদালত, অর্থনীতি-সমাজনীতি, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রসহ প্রতিটি বিভাগ এ আদর্শ ও চিন্তা-চেতনার আলোকেই গঠিত হয়ে থাকে–এসব বৈশিষ্ট আমরা সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোতে দেখে থাকি। একালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল নব-আবিষ্কার রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত। যার ফলে রাষ্ট্রের পক্ষে সমাজের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভবপর হয়ে উঠছে, যার দৃষ্টান্ত অতীতে ছিল না; বরং বর্তমানে রাষ্ট্র তার অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাজের গতিপথ, যাবতীয় মূল্যবোধ পরিপূর্ণভাবে পাল্টে দিতে সক্ষম হচ্ছে যদি না এর বিপরীতে শক্ত কোনো প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

ইসলামি আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে ইসলামি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্রকে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর রয়েছে আরো অনেক বড় দায়িত্ব। রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে ইসলামের নিয়ম-নীতি ও আদর্শের আলোকে শিক্ষিত করে তোলা ইসলামি আদর্শের প্রশিক্ষণ ও লালনের উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত করা, ইসলামি আকীদা-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়ম-নীতিকে বাস্তবে রূপদান করা যার মাধ্যমে প্রত্যেক সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে, প্রভৃতিও ইসলামি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দায়িত্বের আওতাধীন।

মনীষী ইবনে খালদুন খেলাফতের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে: "খেলাফত হচ্ছে শরিয়াহ নির্দেশিত পন্থায় মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করা; কারণ শরিয়াহ দুনিয়ার যাবতীয় আঞ্জামকে আখিরাতের কল্যাণে লাভের কর্মসূচি হিসেবেই গণ্য করে থাকে। তাই মূলত দুনিয়া পরিচালনার মাধ্যমে দ্বীনকে হেফাজত করার নামই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করা।[১২]

মুমিনরা যখন শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবে, অথবা অন্য ভাষায়, যখন তারা কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে তখন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলে দিচ্ছেন এভাবে: "মুমিনতো তারাই যাদেরকে দুনিয়াতে যদি শাসন ক্ষমতা দেওয়া হয় তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে" (সুরা হাজ, ২২: ৪১)।

---

[১২] মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন ২/৫১৮।

পারস্য সেনাপতি রুস্তম রাবী ইবনে আমেরের বক্তব্য মতে ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো: "আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে এক আল্লাহর গোলামির দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে এর প্রশস্ততার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর জুলুম-অত্যাচার থেকে ইসলামের আদল-ইনসাফের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য"।

এসত্ত্বেও ইসলামি আদর্শ ও চিন্তা-চেতনার আলোকে প্রতিষ্ঠিত এ রাষ্ট্র কোনো আঞ্চলিক ও নির্দিষ্ট জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ রাষ্ট্র সার্বজনীন রাষ্ট্র যা সকল যুগের সকল জাতির জন্যই নিবেদিত। আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানবতাকে ইসলামের হেদায়েত ও কল্যাণের দিকে আহবানের দায়িত্ব মুসলিম জাতির উপরই সোপর্দ করেছেন, সমগ্র জাতির ওপর সাক্ষ্য দানের সম্মানে তাদেরকেই ভূষিত করেছেন এবং সমগ্র জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা তাদের জন্যই বরাদ্দ করেছেন। ইসলামের পতাকা বহনকারী এ মুসলিম জাতিকে শুধুমাত্র তাদের নিজের জন্যই সৃষ্টি করা হয়নি; বরং সমগ্র জাতি তথা মানব জাতির কল্যাণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন: "এমনিভাবেই আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষ্য দান করতে পারো" (সুরা বাকারা, ২: ১৪৩)।

তাইতো আমরা দেখি হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যুদ্ধ বিরতির প্রথম সুযোগেই মহানবি হজরত মুহাম্মদ সা. বিভিন্ন দেশ ও জাতির রাষ্ট্র প্রধানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে এবং তাওহীদের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহবান জানিয়ে চিঠি প্রেরণ করেন। তিনি তাদের এবং তাদের প্রজাতন্ত্রের অপরাধের বোঝা তাদের কাঁধেই সোপর্দ করেন যদি তারা ইসলামের কাফেলায় শামিল না হয়। তিনিতাঁর চিঠির ইতি টানতেন এ আয়াতের মাধ্যমে: "হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক মহাসত্যের দিকে এগিয়ে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান, যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করবে না, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করবে না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে একে অপরকে তোমরা প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবে না। যদি তোমরা এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করো তাহলে জেনে নাও এবং সাক্ষী থাক নিশ্চয় আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী এবং মুসলমান" (সুরা আলে ইমরান, ৩: ৬৪)।

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগে ইসলামি দাওয়াতের জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়টি প্রয়োজন তা হচ্ছে ইসলামের জন্য এমন একটি ভূ-খণ্ড বা এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করা যা ইসলামি

আকীদা-বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি, এবাদত-বন্দেগী, চাল-চলন, আচার-অনুষ্ঠান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলামের সার্বজনীন নিয়ম-নীতিই এ রাষ্ট্রের পার্থিব ও পরকালীনসহ জীবনের যাবতীয় বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং জুলুম-অত্যাচারসহ যাবতীয় পাপাচার ও শিরক-কুফর থেকে হিজরত করে যারা এ রাষ্ট্রের স্মরণাপন্ন হবে তাদের সবার জন্য এর দরজা সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে।

এ ধরনের কাঙ্খিত রাষ্ট্র শুধুমাত্র ইসলামের জন্যই নয়; বরং পুরো মানবতার জন্যই এর প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য। কারণ এরফলে মানবতাকে দ্বীন-দুনিয়া, বস্তু-আত্মা এবং আত্মা সভ্যতার উৎকর্ষ ও চারিত্রিক উন্নতি ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী জীবন্ত মডেল উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে। এ ধরনের ইসলামি রাষ্ট্র হচ্ছে বৃহৎ ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ যার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে কুরআনের পতাকাতলে এবং ইসলামি খেলাফতের ছায়াতলে সমবেত করা সম্ভব। কিন্তু ইসলাম বিরোধী শক্তি এধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ বন্ধ করার জন্য সর্বাত্মক অপচেষ্টায় লিপ্ত।

ইউরোপীয়রা মার্কসীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়েছে, কমিউনিজম লিবারেল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে; কিন্তু এদের কেউ ইসলামি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে কিছুতেই রাজি নয়।

বিশ্বের যে কোন স্থানে যখনই কেউ ইসলামি পুনর্জাগরণের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সফল হয় অথবা যখনই কোথাও ইসলামি আন্দোলন সফলভাবে অবস্থান করে নিতে সক্ষম হয় এবং তা একটি রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় ঠিক তখনই স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক খোদাদ্রোহী শক্তি এ সম্ভাবনা অঙ্কুরেই নিঃশেষ করে দেওয়ার যাবতীয় চক্রান্তে মেতে ওঠে। শুরু করে অর্থনৈতিক বয়কট, হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং নির্বাসনসহ বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রের নীলনকশার বাস্তবায়ন। একটি আঘাতের ক্ষত শুকাতে না শুকাতে আরেকটি আঘাত নিয়ে আসে, যাতে করে সম্ভাবনাময় এ ইসলামি রাষ্ট্রটি নিজেদের চাহিদা, স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের চিন্তা বাদ দিয়ে ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-দুর্দশা ও আঘাতের ক্ষত দূর করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

যদি আমাদের একটি রাষ্ট্র হতো

উস্তাদ হাসানুল বান্না বলেন:

যদি আমাদের একটি ইসলামি রাষ্ট্র যা সত্যিকার ইসলামের ও সঠিক ইমানের প্রতিনিধিত্ব করবে মুক্ত স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও তা বাস্তবায়নের অধিকারী হবে, তার কাছে যে মূল্যবান জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং ইসলামি শাসন ব্যবস্থার মডেল রয়েছে

তার গুরুত্ব সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং এ কথা বিশ্বাস করবে যে এর অনুসরণেই রয়েছে পুরো জাতির হেদায়েত ও কল্যাণ ... তাহলে আমরা এর কাছে ইসলামের আদর্শেই উজ্জীবিত হয়ে পুরো বিশ্বকে সহযোগিতা করতে, অন্য সব রাষ্ট্রকে ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করার সুযোগ দান করতে, বিভিন্ন ধরনের সভা-সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, আলোচনা, টক শো, বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের অবাধ যাতায়াতসহ দাওয়াত ও মিশনের নানা প্রকারের উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে সকল রাষ্ট্রকে কাছে টেনে নিয়ে ইসলামকে যথাযথ জানতে ও বুঝতে সহযোগিতা করার বিষয়ে জোর দাবি জানাতাম। এর মাধ্যমে আমাদের এ ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকার আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ বিভিন্নভাবে বিশ্বের সব রাষ্ট্র ও সরকারের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতো এবং মুসলিম জাতির মধ্যে হারানো সেই জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে গোটা মানব জাতিকে মানব গোষ্ঠীকে নতুন এক বিশ্ব উপহার দিতে সক্ষম হতো।

অবাক হই যখন দেখি কমিউনিজমের নামে রাষ্ট্র গঠিত হয়, সে রাষ্ট্রের জন্য আবার টাকা খরচ করা হয়, মানুষকে এর দিকে আহবান করা হয় এবং ঘটা করে এর জয়গান গাওয়া হয়। অবাক হই যখন দেখি ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের জয়গান গাওয়া হয়, এদেরকে পবিত্রজ্ঞান করা হয়, এদের জন্য জীবন উৎসর্গ করা হয় এবং এর অনুসরণ করে সম্মান বোধ করা হয়। এছাড়া আমরা আরো আশ্চর্য হই যখন দেখি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ, যার জন্য মানুষ তার ধন-সম্পদ, মেধা, শ্রম, কলমসহ যাবতীয় কিছুই ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে না এবং যার উত্থান-পতনের সাথে নিজের জীবনের উত্থান-পতনকে জুড়ে দেয়।

অথচ আমরা এমন কোন ইসলামি রাষ্ট্র বা সরকার খুঁজে পাই না যে ইসলামি দাওয়াত ও এর মিশনকে তার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত মনে করে। এমন কোনো রাষ্ট্রের সন্ধান পাই না যে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার ওপর আরোপিত অপবাদ ও মিথ্যাচারের জবাব দিয়ে এর যাবতীয় সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখপূর্বক একে মানবতার সকল সমস্যার সমাধানকারী একক বিশ্ব ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করার অব্যর্থ প্রয়াস চালায়। অথচ ইসলাম এ ধরনের দাওয়াতকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সহ সব কিছুর ওপর আবশ্যক করেছে। আল কুরআন ঘোষণা দিচ্ছে: "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতে হবে যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে, আর তারাই হচ্ছে সফলকাম" (সুরা আলে ইমরান, ৩: ১০৪)।

> কিন্তু আফসোস আমাদের শাসকগোষ্ঠীর জন্য! কোথায় এসবের অবস্থান! এদের সবাই পাশ্চাত্যের কোলে বেড়ে ওঠা সন্তান, তাদের

চিন্তাধারায় উজ্জীবিত এবং তাদেরই আদর্শে লালিত। সম্ভবত এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এরা পাশ্চাত্যের মডেল ও চিন্তাধারাকে পেছনে ফেলে নিজস্ব চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে দেশ পরিচালনার কথা কল্পনাতেও স্থান দিতে পারে না, কার্যে পরিণত করার কথাতো অনেক পরে।

আমার মিসরের অনেক শাসকের কাছে আমাদের উল্লেখিত আকাঙ্খার কথা ব্যক্ত করেছি। স্বভাবতই এর ফলাফল শুণ্যই হবে। মুসলিম জাতির সদস্য হয়েও যারা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে অবাঞ্ছিত হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের কাছে কিভাবে আশা করা যায় যে, তারা মহান ইসলামের দাওয়াত অপরের কাছে পেশ করবে। শূণ্য কলসি তো কাউকে কিছু দিতে পারে না!

সম্মানিত ভাইয়েরা! এটি তাদের মিশন নয়। অতীত সাক্ষী যে তারা এ কাজ বাস্তবায়নে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এটি হচ্ছে জাতির নতুন প্রজন্মের মিশন। তাই তোমরা তাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াতকে আরো মজবুত ও সুন্দর করো, নতুন প্রজন্ম গড়তে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। জাতির এ কাণ্ডারীদেরকে বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-গবেষণা ও কার্যক্ষেত্রে দৈহিক ও মানসিকভাবে মুক্ত ও স্বাধীন হতে শিক্ষা দাও। কুরআনের মহত্ব ও ইসলামের সুমহান সৌন্দর্য তাদের অন্তরে গেঁথে দাও এবং মুহাম্মদের সা.-এর সেনাবাহিনীতে এদেরকে ভর্তি করে নাও। অচিরেই তোমরা দেখবে এদের মধ্যে থেকেই এমন মুসলিম শাসক বেরিয়ে আসবে যে নিজেই নিজের সাথে জিহাদ করতে পারবে এবং অপরকেও সুখী করতে পারবে।[১৩]

ইসলাম ও রাজনীতি

সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি ও তার এজেন্টরা সর্বদা যে চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট তা হচ্ছে: রাজনীতির সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে ইসলাম পরিচিত নয়। এর বিপরীতে অনেক সমাজ সংস্কারক, ইসলামের দিকে মানুষকে আহবানকারী, যাদের অগ্রভাগে ছিলেন উস্তাদ হাসানুল বান্না মুসলমানদেরকে ইসলামি জীবন ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। অন্য ভাষায়: তেরশ' শতাব্দীকাল ধরে অর্থাৎ

---

[১৩] শহীদ ইমাম হাসানুল বান্না (র.) রচিত রচনা সমগ্র, পৃষ্ঠা: ১৯৬, ১৯৭।

ঔপনিবেশিক শক্তির প্রবেশ ও মুসলিম দেশ সমূহে স্নায়ু যুদ্ধের প্রবেশের পূর্বে ইসলামের যে রূপ ছিল তাদের কাছে তা পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল। তা হচ্ছে: ইসলামি জীবন ব্যবস্থা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি বিভাগকে ঘিরে আছে, এমনকি জন্মের পূর্বের ও মৃত্যুর পরের জীবনও ইসলামের বিধি-বিধান থেকে বাদ পড়েনি। জন্মের পূর্বে ভ্রুণ অবস্থায় এবং মৃত্যুর পরও ইসলামি জীবনব্যবস্থা মানুষের প্রাপ্ত মান-মর্যাদা ও অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। এ ছাড়া মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্য রয়েছে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা। ইসলাম স্নানাগারের বিধান থেকে শুরু করে শাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট সমাধান দিয়েছে।

মুসলিম সংস্কারকদের এ প্রচেষ্টার অর্জিত সুফল সুস্পষ্ট। এর ফলে পৃথিবীর আনাচে- কানাচে মুসলমানদের এক বিশাল সংখ্যা দেখা যায় যারা ইসলামি জীবনব্যবস্থার ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতার পরিপূর্ণ ধারণা লালন করে থাকে এবং ইসলামকে আকীদা-বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতি এবং ধর্ম ও সমন্বয় সাধনকারী এক জীবন বিধান বলে বিশ্বাস করে। এ সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে অনেকেই যারা স্নায়ুযুদ্ধের শিকার ছিল এবং ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছে অর্থাৎ যারা ইসলামি জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে ভুল ধারণা লালন করত তাদের অনেককেই সে ধারণা থেকে কিছুটা সচেতন হতে দেখা যায়। এ ছাড়া মুসলিম সংস্কারকদের এ প্রচেষ্টার ফলে স্থানে স্থানে রাজনৈতিক ও স্নায়ু জগতে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সূচনা হয় যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী শক্তিকে ভাবিয়ে তোলে। তাদেরকে দেখা যায় শত চেষ্টা এবং বিপুল পরিমানে অর্থ ব্যয় করে একের পর এক সভা সেমিনার গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদির আয়োজন করে এ ধরনের পুনর্জাগরণের কারণ অনুসন্ধান করতে এবং এর সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা ও গবেষণা করতে।

তাই দেখা যায় পাশ্চাত্যের এজেন্ট ও পদলেহীদের ইসলামের পুনর্জাগরণের এ সূর্যকে আলোকে ছড়ানোর আগেই নিভিয়ে দেওয়ার সর্বাত্মক আয়োজনে মেতে উঠতে। ইতিহাসের চাকাকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে উপনিবেশের যুগে ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশেই তারা চিৎকার দিয়ে বলে উঠে: ধর্মে রাজনীতি বলতে কিছু নেই, এমনিভাবে রাজনৈতিতে ধর্ম বলতে কিছু নেই। তারা আমাদেরকে এমন সময়ের দিকে ফিরিয়ে নিতে চায় যা থেকে আমরা অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে নিস্কৃতি লাভ করেছি। এমনকি পাশ্চাত্যের এ সব পা চাটা গোলামদের দেখা যায় ইসলামকে এমন নামে নামকরণ করতে যার সাথে উপনিবেশপূর্ব দীর্ঘকাল থেকে মুসলমানরা

পরিচিত ছিল না। যুগ যুগ ধরে ফকীহ, উসূলবিদ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরসহ সর্বস্তরের উলামা মাশায়েশগণ ইসলামের যে পরিচয় বর্ণনা করেছেন, গোসলখানার বিধান থেকে শুরু করে জিহাদ ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য অনেক বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন, ইসলামকে যেমনই আকীদা বিশ্বাসের ধর্ম হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন তেমনই পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবেও পরিচয় দিয়েছেন, কুরআন সুন্নাহর বর্ণিত ইসলামের এ পরিপূর্ণ রূপকে পাশ্চাত্যের অন্ধ গোলামরা এখন 'রাজনৈতিক ইসলাম' (?) নামে নামকরণ করার ব্যর্থ প্রয়াসে সচেষ্ট।[১৪] ইসলামকে এ নামে নামকরণ করার মাধ্যমে তার মূলত ইসলামের এ রূপকে মানুষের কাছে ঘৃণিত ও নিন্দিত করে তুলতে চায়, যেহেতু রাজনীতিতে নীতিবোধের অভাবের কারণে এর মাধ্যমে বিভিন্ন নোংরামি ও হয়রানির শিকার হওয়ার কারণে আমাদের দেশের মানুষের কাছে রাজনীতি ঘৃণিত ও নিন্দিত।

কিন্তু আমাদের কি করার আছে যদি আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামে এরূপ রাজনীতি থাকে; যদি মুহাম্মদ রসুলূল্লাহ সা. আনিত ইসলাম মানুষ ও জীবনকে আল্লাহ এবং কায়সারের (শাসক) মাঝে ভাগ বাটোয়ারা করতে রাজি না হয়; বরং সর্বস্তরে সুউচ্চ কণ্ঠে এ ঘোষণা নিয়ে আসে যে কায়সার, কিসরা, ফেরাউনসহ দুনিয়ার সকল রাজা-বাদশাহ এক আল্লাহর গোলাম ও তাঁর বান্দা।

দুর্ভাগ্য হলো যে, এ সব নিরীহ জনগোষ্ঠী আমাদেরকে আল্লাহর কিতাব, রসুলের সা. সুন্নাত, পূর্বপুরুষদের সুপ্রতিষ্ঠিত পথ ও আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে ইসলামের নুতন এক রূপ উপহার দিতে চায় যা সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারের নেতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করবে।

তারা চায় আধ্যাত্মিক বা পৌরহিত্যভিত্তিক ইসলাম, যা জীবিতদের ওপর নয় শুধু মৃতের রূহের মাগফেরাত কামনায় কুরআন তেলাওয়াত, তা দিয়ে ঘরের দেয়াল সাজানো এবং কুরআন তেলাওয়াত করে বিভিন্ন সভা-সমিতি উদ্বোধন করা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে; অতঃপর রাষ্ট্র পরিচালনার ভার রাষ্ট্রনায়কের ওপর ছেড়ে দেয় যাতে সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও নিজের খেয়াল খুশি মোতাবেক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা পরিচালনা করাতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে কুরআন হাদিস বর্ণিত ইসলাম যা মুসলিম জাতির সকল সদস্যের কাছে পরিচিত তা হচ্ছে: ইসলাম মানব জীবনের সকল সমাধান দিতে সক্ষম এক পরিপূর্ণ

---

[১৪] এ বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে "রাজনৈতিক ইসলাম" শিরোনামে এ অপবাদের জবাব দেওয়া হয়েছে।

জীবনবিধান, যেখানে কারো কোন অংশীদারিত্বের সুযোগ নেই। এটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক, আদর্শিক, সামাজিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ জীবনের সকল বিভাগের সমন্বয়কারী পরিপূর্ণ এক জীবনব্যবস্থা। উল্লেখিত প্রতিটি বিভাগেই রয়েছে ইসলামের মহান এক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মানব জীবনের এ প্রতিটি দিকের জন্য রয়েছে ইসলামের স্বতন্ত্র বিধি-বিধান ও দিক-নির্দেশনা...

ধর্মের সাথে রাজনীতির সম্পর্কের ব্যাপারে ইমাম হাসান আল-বান্না বলেন: অধিকাংশ ব্যক্তিকে দেখা যায় তারা যখনই ইসলাম ও রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন তখন দু'টিকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে স্ব স্ব স্থানে রেখে আলোচনা করেন। তাদের দৃষ্টিতে এ দু'টি কখনো এক ও অভিন্ন হতে পারে না। এ জন্য বিভিন্ন সংস্থার নাম দেওয়া হয় অরাজনৈতিক ইসলামিক সংস্থা। আরো বলা হয় এখানে ধর্মীয় আলোচনা হয়, রাজনৈতিক আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন ইসলামি সংস্থার রেজুলেশন ও সংবিধানে উল্লেখ করা হয়: "রাজনৈতিক বিষয়ে উল্লেখিত সংস্থার কোনো হস্তক্ষেপ নেই"। উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গির বিশুদ্ধতা অথবা ভুলের পর্যালোচনার পূর্বে এখানে দু'টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই-

প্রথমত: উল্লেখ্য যে দলীয় এবং রাজনীতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কখনো এ দু'টি বিষয় এক ও অভিন্ন হয়, আবার কখনো পৃথক রূপ ধারণ করে। কখনো একজন ব্যক্তি কোনো গ্রুপ বা দলের সাথে সম্পর্ক রাখা ছাড়া সার্বিক অর্থে রাজনীতিবিদ হতে পারেন। আবার কখনো কোনো ব্যক্তি রাজনীতির প্রাথমিক জ্ঞান রাখা ছাড়াও কোনো একটি দলের সক্রিয় সদস্য হতে পারেন। কখনো এ দু'টি বিষয় এক ও অভিন্ন হতে পারে। যেমন একই সাথে কখনো কোনো ব্যক্তি রাজনীতিবিদ ও দলীয়লোক হতে পারে অথবা এর বিপরীতে কখনো কোনো ব্যক্তি কোনো দলীয়লোক হওয়ার সাথে সাথে রাজনীতিবিদও হতে পারে। আমি যখন এখানে রাজনীতি নিয়ে কথা বলব তখন আমি এর দ্বারা সাধারণ রাজনীতিকেই উদ্দেশ্য করবো, অর্থাৎ কোনো দলীয় ব্যতীত সাধারণ অর্থে রাজনীতি বলতে যা বুঝায় তথা দেশের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ের আলোচনা ইত্যাদি অর্থে রাজনীতিকে এখানে উল্লেখ করবো।

দ্বিতীয়ত: অমুসলিমরা যেহেতু ইসলামের এসব বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ, অথবা ইসলামের ব্যাপক ও সার্বজনীন রূপ, মুসলমানদের অন্তরে এর প্রতি অগাধ আস্থা-বিশ্বাস, আবেগ-অনুরাগ এবং এর পথে জান-মাল কুরবানি করার মুসলমানদের মানসিকতা ইত্যাদি যখন অমুসলিমরা অনুধাবন করতে পারল, তখন তারা

ইসলামকে সরাসরি আঘাত করে মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি; বরং তারা কৌশলে ইসলামকে আঘাত করতে সচেষ্ট হয়ে উঠছে। ইসলামকে এর ব্যাপক ও গতিশীল আকৃতি থেকে বের করে একটি সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে তারা সচেষ্ট। তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হলো যদি ইসলামকে তার গতিশীল ও জীবন্ত রূপ থেকে বের করে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা, লৌকিকতা ও বাহ্যিকতার খোলসে পরিণত করা যায়; তাহলে তা মুসলমানদের জীবন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব সৃষ্টি না করে জীবনী শক্তিহীন একটি ধর্ম তথা আচার-অনুষ্ঠান হিসেবে বেঁচে থাকবে। তাই তারা মুসলমানদের বুঝাতে শুরু করল ইসলাম এক বস্তু এবং সমাজ অপর বস্তু, ইসলাম ও আইন ভিন্ন দু'টি জগত, ইসলামের সাথে অর্থনীতির কোনো সম্পর্ক নেই, ইসলাম এক বস্তু এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি এর বিপরীত বস্তু এবং সর্বোপরি ইসলাম অবশ্যই রাজনীতি থেকে দূরবর্তী সম্পূর্ণ এক ভিন্ন বস্তু।

সম্মানিত ভাইয়েরা খোদার শপথ করে আমাকে বলুন: যদি ইসলাম সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ দূরে ভিন্ন এক বস্তু হয়, তাহলে ইসলাম কি? ইসলাম কি আবেগ-অনুভূতিশূন্য কয়েক রাকআত নামাজ, গতানুগতিক কিছু প্রার্থনা, কতিপয় আচার-অনুষ্ঠান! এ জন্যই কি হে ভাইয়েরা মানব জীবনের সব সমস্যার যথাযথ, বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ মৌলিক সমাধান সম্বলিত আল কুরআন নাজিল হয়েছে? "সকল বর্ণনা সম্বলিত আল কুরআন এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ স্বরূপ" (সুরা নাহল, ১৬: ৮৯)।

ইসলামের দুশমনেরা মুসলমানদেরকে ইসলামের নামে এ সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করে ফেলতে চায়। অতঃপর তারা মুসলমানদের সাথে হাসি-তামাশা করে বলে বেড়ায়: আমরা তোমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, ধর্মের ব্যাপারে আমরা তোমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি। আর দেশের সাংবিধানিক ধর্ম ইসলামতো আছেই!

সম্মানিত ভাইয়েরা! আমি সুস্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, ইসলামকে তার দুশমনেরা যে এক সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায় ইসলাম তার বিপরীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিষয়। ইসলাম আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন-বিধান, রাষ্ট্র ও নাগরিকত্ব, উদারতা ও কঠোরতা, বস্তু ও চরিত্র, সভ্যতা ও আইন ইত্যাদির সমন্বয়ে পরিপূর্ণ এক জীবন ব্যবস্থার নাম। একজন মুসলমানের কাছে ইসলামের দাবি হচ্ছে সে তার জাতির সব বিষয়ে সক্রিয় অংশীদারের ভূমিকা পালন করবে। "আর যে মুসলমান হয়েও তার জাতির সমস্যাবলী গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে না সে সত্যিকারভাবে সে জাতি অর্থাৎ মুসলমানদের দলভুক্ত নয়"।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের সম্মানিত পূর্ব-পুরুষগণ ইসলামের এর চেয়ে ভিন্ন কোনো অর্থ গ্রহণ করেননি। ইসলাম দিয়েই তারা শাসন করেছেন, এর জন্যই তারা জিহাদ করেছেন এবং ইসলামের মূলভিত্তির ওপরই তারা লেনদেন করেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনের পাশাপাশি পার্থিব জীবনের সকল বাস্তবিক কাজকর্ম ও লেনদেন তারা ইসলামের সীমানায় থেকেই সমাপ্ত করেছেন। তাইতো ইসলামের প্রথম খলিফা বলতে পেরেছেন: "উটের একটি রশিও যদি আমার থেকে হারিয়ে যায় আমি আল্লাহর কিতাবে তার হুকুম খুঁজে পাই" ।[১৫]

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ড. জিয়াউদ্দিন রাইস তার 'ইসলামের রাজনৈতিক তত্ব' (Political Theory of Islam) শীর্ষক গ্রন্থে বলেন :[১৬] "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রসুলুল্লাহ সা. তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মদিনায় যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেউ যদি এটিকে তার কার্যপ্রণালীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করে আধুনিক রাজনীতির সাথে তুলনা করে তাহলে সার্বিক অর্থে একে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলা যেতে পারে। একই সাথে কেউ যদি এটিকে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও এর আধ্যাত্মিক ভিত্তি যার উপর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ দৃষ্টিতে বিবেচনা করে তাহলে একে ধর্মীয় কার্যকলাপ বললে তাতেও কোনো বিধি-নিষেধ থাকতে পারে না।

সুতরাং কোনো শাসন ব্যবস্থা একই সাথে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় গুণেই গুণান্বিত হতে পারে। এ জন্য যে প্রকৃতই ইসলাম অত্যন্ত ব্যাপক ও সার্বজনীন যা বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতকে একীভূত করতে পারে এবং যার বিধি-বিধান মানুষের পার্থিব ও পরকালীন উভয় জগতের কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। বরং ইসলামের প্রকৃতিই এ দু'টির সমন্বয়ে গঠিত, এখানে একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার এই প্রকৃতি ও বাস্তবতা প্রমাণের জন্য বেশি কষ্ট স্বীকার করে দলিল-প্রমাণাদি খোঁজার প্রয়োজন নেই; বরং ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য এবং এটি ইতিহাসের অনিবার্য এক বাস্তবতাও বটে। যুগ যুগ ধরে মুসলমানরা এ আকীদা-বিশ্বাসই পোষণ করে আসছে, এটি আজকের দিনের আবিষ্কৃত কোনো নতুন বিষয় নয়। ইসলামের আবহাওয়া থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও প্রাচ্যবিদদের অধিকাংশই এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। অথচ এরূপও মুসলমান পরিচয় বহনকারী একটি দল যারা নিজেদেরকে প্রগতিবাদী ও সংস্কারক বলে পরিচয় দেয় তারা এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে বেড়ায়! তাদের দাবি অনুযায়ী ইসলাম শুধুমাত্র ধর্মীয় ওয়াজ

---

[১৫] ইখওয়ানুল মুসলিমিন ছাত্রদের সম্মেলনে পেশকৃত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

[১৬] পৃষ্ঠা : ২৭-২৯।

নসীহতের মধ্যেই সীমবদ্ধ।[১৭] তারা এর মাধ্যমে ইসলামকে কতিপয় আকীদা-বিশ্বাস ও আল্লাহর সাথে বান্দার আধ্যাত্মিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায়। তাদের ভাষ্যানুযায়ী ইসলামের সাথে ঐ সকল বিষয় যেগুলোকে আমরা বৈষয়িক ও পার্থিব বিষয় হিসেবে বিবেচনা করি যেমন: ধন-সম্পদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, এর আগে রয়েছে রাজনৈতিক বিষয়াদি, এ সবের সাথে ইসলাম তথা ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের উল্লেখযোগ্য শ্লোগান হচ্ছে : 'ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়'।

এ সব লোকের বক্তব্যের প্রতিউত্তরে ইসলামি বুদ্ধিজীবী ও ব্যক্তিত্বদের কথা উল্লেখ করলে কোনো লাভ হবে না, এদের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে সঠিক বুঝ লাভ করতে তারা রাজি হবে না। এ ছাড়াও আমরা এখানে ইতিহাসের বস্তুবতা আলোচনা করতে চাই না, হয়তবা এ সকল প্রগতিবাদী (!) তাও মেনে নিতে রাজি হবেন না। আমরা এখানে প্রাচ্যবিদ বুদ্ধিজীবীদের কতিপয় বক্তব্য তুলে ধরতে চাই যেখানে তারা ইসলামের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কারণ এ সকল প্রগতিবাদী এ দাবি করতে পারবেন না যে তারা বর্তমান যুগের বিষয়ে তাদের চেয়েও বেশি খবর রাখেন, কিংবা এও দাবি করতে পারবেন না যে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহের কলাকৌশল তাদের চেয়েও বেশি রপ্ত করতে পেরেছেন। তাদের কতিপয় বক্তব্য নিম্নরূপ:

১. ড.ভি ফিটজেরাল্ড (V. Fitzgerald) বলেন:[১৮] "ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, বরং এটি একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিও বটে। যদিও সমসাময়িক যুগের কতিপয় মুসলিম যারা নিজেদের প্রগতিবাদী বলে পরিচয় দিতে অভ্যস্ত উভয়ের মাঝে সীমারেখা জড়িত, একটিকে অপরটির থেকে পৃথক করার কোনো সুযোগ নেই"।

---

[১৭] এ জাতীয় দাবির অগ্রভাগে ছিলেন মানসূরা বিভাগের সাবেক কাজী এবং সাবেক ধর্মমন্ত্রী অধ্যাপক আলী আবদুর রাজ্জাক। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত তার "আল ইসলাম ও উসূলুলহুক্ম" নামক গ্রন্থে তার মতামত প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত প্রতিউত্তরের পাশাপাশি সামনের দিকে আমরা ও মতামতের বিস্তারিত পর্যালোচনা পূর্বক এর জবাব দিব ইনশাআল্লাহ। এর জন্য বিশেষ করে দেখুন : আমাদের এ বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় যা "কতিপয় প্রগতিবাদীর দাবির জবাব" শিরোনামে ড. রাইসের পর্যালোচনাসহ আলোচনা করা হচ্ছে।

[১৮] Mushammedan la-ch, l.

২. অধ্যাপক সি.এ ন্যালিয়ন (C.A. Nallion) বলেন: [১৯] "মুহাম্মদ সা. একই সময়ে একটি ধর্ম ও একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা জীবনের প্রতিটি দিককে বেষ্টন করে আছে"।

৩. ড. শ্যাচট (Schacht) বলেন: [২০] "ইসলাম শুধুমাত্র ধর্ম সর্বস্ব নয়; বরং এটি ধর্ম থেকেও অতিরিক্ত কিছু: এটি শাসন ব্যবস্থা ও রাজনেতিক চিন্তাধারারও প্রতিনিধিত্ব করে। সংক্ষেপে এটি পরিপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা যা ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে"।

৪. অধ্যাপক আর. স্ট্রথম্যান (R. Strothmann) বলেন:[২১] "ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির সমষ্টি; কারণ এর প্রতিষ্ঠাতা একজন নবি ছিলেন, সাথে সাথে একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন"।

৫. অধ্যাপক ডি.বি. ম্যাকডোনাল্ড (D.B. Machdonald) বলেন: [২২] "এখানে (মদীনাতে) সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ইসলামি আইনের মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়"।

৬. স্যার টি. আরনল্ড (Sir. T. Arnold) বলেন:[২৩] "ইসলামের নবি একই সময় ধর্ম প্রধান ও রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন"।

৭. অধ্যাপক জেব বলেন:[২৪] "তখনি স্পষ্ট হলো যে ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের নাম নয়; বরং এটি একটি স্বাতন্ত্র সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দাবি রাখে। ইসলামে রয়েছে স্বতন্ত্র শাসন, পদ্ধতি, এর রয়েছে নিজস্ব আইন কানুন ও বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা"।

যারা পশ্চিমাদের বক্তব্য ব্যতীত সন্তুষ্ট হয় না উল্লিখিত মতামতগুলো সকল অহং বোধকে নির্বাক করে দেবে।

---

[১৯] Cited by sir T. Amold in his book : The Caliphate. p. ১৯৮।

[২০] Encyclopedia of Sociall Science. Vol. VIII, p. ৩৩৩.

[২১] The Encyclopedia of Islam, iv. p. 350.

[২২] Tion-Development of Muslim Thelogy – Jurisprudence and constitual theory. (New York 1903) p. 67.

[২৩] The Caliphate. Oxford 1924, p. 30.

[২৪] Muhammedanism. 1949, p. 3.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি রাষ্ট্রের অবকাঠামো

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলাম যেমনিভাবে সৎ ব্যক্তি, সুন্দর পরিবার ও সুশীল সমাজ গড়তে চেষ্টা করে তেমনিভাবে উপযুক্ত ও সুন্দর রাষ্ট্র গঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও ইসলামে লক্ষ্যণীয়।

ইসলামপূর্ব যুগে বা ইসলাম আগমনের পরে মানুষ রাষ্ট্রের যে নমুনাচিত্রের সাথে পরিচিতি লাভ করেছে ইসলামি রাষ্ট্র অনুরূপ কোন রাষ্ট্র নয়। ইসলামি রাষ্ট্র তার লক্ষ্য-উর্দ্দেশ্য, নিয়ম-নীতি, উপায়-উপকরণ ও বৈশিষ্ট্যের বিচার অন্যান্য সকল রাষ্ট্র থেকে আলাদা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি রাষ্ট্র।

নাগরিক ও দেওয়ানী রাষ্ট্র যার ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম

ইসলামি রাষ্ট্র কোনো ধর্মীয় কিংবা স্বৈরাচারী রাষ্ট্র নয় যা মানুষের কাঁধে জগদ্দল পাথরের মতো বসে এবং খোদায়ী অধিকারের নামে মানুষের কণ্ঠ ও বিবেককে স্তব্ধ করে দেয়।

এটি এমন কোনো পুরোহিত বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের রাষ্ট্র নয় যারা মনে করেন যে, তারাই পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হয় তাঁর ইচ্ছে মোতাবেক কাজ করে এবং তাদের ফয়সালাই আসমানী ফয়সালা। তারা যা মীমাংসা ও সমাধান দেন তাই আসমান থেকে আগত সমাধান এবং তারা যা বিশ্বাস করে তাই আসমানী আকীদা-বিশ্বাস।

প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্র একটি বেসামরিক ও নাগরিক রাষ্ট্র যা ইসলামের মৌলিক নিয়ম-নীতি অনুযায়ী পরিচালিত এবং যা আনুগত্যের শপথ ও পরামর্শ সভার ওপর প্রতিষ্ঠিত। জাতির যোগ্য, বিশ্বস্ত, নীতিবান ও জ্ঞানী-গুণী বুদ্ধিজীবীরাই এর পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হবে। যে রাষ্ট্র পরিচালনার উল্লেখযোগ্য গুণাবলী হারিয়ে ফেলবে সে এর পরিচালনার দায়িত্ব থেকে স্বাভাবিকভাবে অব্যাহতি পাবে।

সঠিক অর্থে ও যথাযথ প্রয়োগে ইসলামে ধর্মীয় পুরোহিত শ্রেণী বলতে কোন পরিভাষার অস্তিত্ব নেই, অন্যান্য ধর্মীয় সমাজে যার বহুল প্রচলন রয়েছে। প্রতিটি মুসলমানই একজন ধর্মীয় ব্যক্তি। তবে অন্যান্য সমাজের দার্শনিক, চিকিৎসক, আইনবিদ ইত্যাদি বুদ্ধিজীবী মহলের মতো এখানে বিশেষজ্ঞ আলেম-উলামা এবং ইসলামি গবেষক ও চিন্তাবিগণ রয়েছেন।

রাষ্ট্রের সাথে এ সকল আলেম-উলামাদের সম্পর্ক হচ্ছে যে তারা সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে যা ইসলাম তাদের ওপর অত্যাবশ্যকীয় করেছে। এটি

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক যে তারা সরকারকে প্রয়োজনীয় পরমর্শ দেবে, আর আলেম-উলামা ও বুদ্ধিজীবী মহলের জন্য অত্যাবশ্যক, যাতে রাষ্ট্র বা সরকার ইসলামের সঠিক পথের চলতে, সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে এবং হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়। এমনিভাবে এ সব আলেম-উলামা ও বুদ্ধিজীবী মহলের ওপর দায়িত্ব যে তারা সুকৌশল এবং সৎ উপদেশের মাধ্যমে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে এবং এ কাজে তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। পাশাপাশি ইসলামি সরকারেরও দায়িত্ব তাদের উল্লিখিত কাজে তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।

রাষ্ট্রের এ সব আলেম-উলামা ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে একটি সাংবিধানিক সুপ্রিম কাউন্সিল গঠন করা উচিত যারা শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন আইন-কানুন পর্যালোচনা করবে যাতে ইসলামের মৌলিক নিয়ম-নীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন পাস না হয়। অন্যথায় শাসনযন্ত্রও কুরআনের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হতে শুরু করবে, যা থেকে রসুল সা. সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন।

এভাবে কুরআন ও শাসন ব্যবস্থা সহঅবস্থান করতে সক্ষম হবে এবং বিগত সময়ের মতো দু'টির মাঝে দুরত্ব সৃষ্টি হওয়ার কোনো সুযোগ সৃষ্টি হবে না যেখানে আলেম-উলামারা এক ময়দানে এবং শাসকগোষ্ঠী অপর ময়দানে অবস্থান করত এবং কবি-সাহিত্যিক ও চাটুকারের দল ছাড়া অন্য কেউ শাসক গোষ্ঠীর কাছে ভিড়তে পারত না। বরং ইসলামের মৌলিক বিধান হচ্ছে মুজতাহিদ পর্যায়ের গবেষক আলেমদের মধ্যে থেকেই রাষ্ট্রপ্রধান হবেন। যেমন ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনসহ তাদের পথ বেয়ে আসা পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধানগণ। তাদের সবাই মুজতাহিদ পর্যায়ের ফকীহ ও গবেষক আলেমদের সারিতেই ছিলেন। তাইতো ইসলামি আইনবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারপতিদেরকে অবশ্যই ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। ইজতিহাদের যোগ্যতা ব্যতীত কাউকে সরকার প্রধান ও বিচারপতি মনোনীত করাকে ইসলামি আইনবিদগণ অনুমোদন করেননি। তবে প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে যেখানে সর্বোচ্চ শর্তাদির ব্যাপারে বিবেচনা করে বাস্তবতা মেনে নিতে হয় সে ক্ষেত্রে ইসলামি আইনবিদগণ ইজতিহাদের শর্ত পাওয়া না গেলেও উপস্থিতিদের মধ্যে সার্বিক বিবেচনায় যোগ্যতম ব্যক্তিকে মনোনীত করাকে অনুমোদন করেছেন।

ইসলামি রাষ্ট্র যেমন অতীত ইতিহাসের ধর্মীয় পুরোহিত রাষ্ট্রতুল্য নয়, তেমনই এটি সেক্যুলার রাষ্ট্রও নয়। চাই সেক্যুলারিজম কমিউনিজম রাষ্ট্রের আকৃতি ধারণ করে আসুক যেখানে ধর্মকে পুরোপুরি অস্বীকার করে এর সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করা হয় এবং যাকে জাতির জন্য 'আফিম-তুল্য ও কুসংস্কারের মিলনমেলা' বলে গণ্য

করা হয়। অথবা চাই তা (সেক্যুলারিজম) পাশ্চাত্য ব্লকের রাষ্ট্রের আকৃতি ধারণ করে আসুক যারা নিজেদেরকে মুক্ত বিশ্ব বলে নামকরণ করেছে, যেখানে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে এবং যেখানে সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চারিত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদি ধর্মের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা হয়েছে। এটি এমন বিশ্ব যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় না বটে; কিন্তু জগত-জীবন পরিচালনায় তাঁর প্রদত্ত বিধি-বিধানের কোনো স্থান এবং এর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করা হয় না (দেখুন : মুহাম্মদ আসাদ রচিত "ইসলাম এট দ্যা ক্রস রোড" শীর্ষকগ্রন্থ)।

ইসলামি রাষ্ট্র হচ্ছে নাগরিক ও বেসামরিক রাষ্ট্র যা আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং খোদায়ী আদেশ-নিষেধই তার জমিনে বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট থাকে। এ মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সক্ষমতা ও সহযোগিতা পাওয়ার উপযুক্ততা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং এসব ছাড়া এ রাষ্ট্রের অবশিষ্ট থাকা যুক্তিহীন হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "যে আল্লাহকে সহযোগিতা করে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সহযোগিতা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান। (তারাই আল্লাহকে সহযোগিতা করতে পারে) যাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দেওয়ার পর নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধান করে থাকে" (সূরা হজ, ২২: ৪১)।

বিশ্বজনীন রাষ্ট্র

ইসলামি রাষ্ট্র আন্তঃমহাদেশীয় কোনো রাষ্ট্র নয়, নয় কোন বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। ভৌগলিক কোনো সীমানার ওপর ভিত্তি করে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি উন্মুক্ত রাষ্ট্র, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এর মূলনীতির সাথে একাত্মতা পোষণ করে এই রাষ্ট্রে বাস করতে আগ্রহী সবার জন্য এটি উন্মুক্ত। এটি একটি বিশ্বজনীন রাষ্ট্র। এটি এমন আদর্শিক রাষ্ট্র যেখানে দেশ, জাতি, ভাষা ও বর্ণের সকল পার্থক্য গৌণ হয়ে যায় এবং যেখানকার অধিবাসীরা এক আল্লাহ, এক রসুল ও অভিন্ন এক আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। একই ক্বিবলা ও এক জাতীয় বিধি-বিধান, একই শরিয়াহ ও অভিন্ন আচার-আচরণ তাদেরকে একই কাতারে শামিল করে। এভাবেই তারা পরিণত হয় একই জাতিতে, যা তাওহীদ তথা একত্ববাদের একক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজনীন এ রাষ্ট্রটির শুরু হবে কোনো মহাদেশের নির্দিষ্ট এমন কোনো ভূখণ্ড থেকে যেখানকার জনগণ ইসলামকেই তাদের জীবন বিধান হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয়, পৃথিবীতে ইসলামি জীবন বিধানের বাস্তবিক নমুনা প্রতিষ্ঠা

করতে সচেষ্ট হয়, এ পথে আগত সকল বাধা-বিপত্তি, জেল-জুলুম, বয়কট-অবরোধ ইত্যাদির মোকাবেলা করতে প্রস্তুত থাকে এবং চরম বিপদের মোকাবেলায় আত্মপ্রত্যয়ী ও ধৈর্যশীলের পরিচয় দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। এ জাতীয় ভূখণ্ডের নমুনা যখনই একাধিক হবে তখনি সবগুলোকে একীভূত করে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে।

এভাবেই কাঙ্ক্ষিত ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে, যা প্রতিষ্ঠা করা এবং এর পথে যাবতীয় বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করা ইসলাম তার জাতি তথা মুসলমানদের ওপর ফরজ করেছে। কোনো মহাদেশের কোনো ভূখণ্ডে ইসলামি অনুশাসন বাস্তবায়ন করার নাম খিলাফত নয়; বরং পুরো মুসলিম উম্মাহকে ইসলামি অনুশাসনের আওতায় নিয়ে আসার নাম হচ্ছে খিলাফত। তিনটি মূলনীতির ওপর ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় :

এক : বিভিন্ন অঞ্চল, দেশ, মহাদেশ মিলে একটি ইসলামি ভূখণ্ড।

দুই : আইন প্রণয়নের অভিন্ন একটি উৎস। আর তা হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ।

তিন : একক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যিনি হবেন মুসলমানদের খলিফা তথা আমিরুল মুমিনিন এবং যিনি ইসলামি অনুশাসনের মাধ্যমে মুসলমানদের এ ভূ-খণ্ড পরিচালনা করবেন।

এর অর্থ এই নয় যে ইসলাম তার ভূখণ্ডে অমুসলিমদেরকে কোনো স্থান দিতে চায় না; বরং ইসলাম তাদেরকে স্বাগত জানায়, তাদের জান-মালের হেফাজতের গ্যারান্টি দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এ রাষ্ট্রের নাগরিক ও সিভিল আইন মেনে চলে। কিন্তু তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আচার-অনুষ্ঠান পালনে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনো বাধ্যবাধকতা ব্যতীত প্রত্যেকেই স্বীয় ধর্ম অনুযায়ী স্ব স্ব কাজ সমাধা করতে পারবে।

সাংবিধানিক আইনানুগ রাষ্ট্র

ইসলামি রাষ্ট্র নির্দিষ্ট আইন ও সংবিধানের মাধ্যমে পরিচালিত একটি আইনানুগ রাষ্ট্র। কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত মৌলিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের আলোকে রচিত এ সংবিধান যা মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ও এবাদত-বন্দেগি, যাবতীয় লেনদেন ও আন্তর্জাতিকসহ যাবতীয় সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে আছে।

কুরআন হাদিসের আলোকে রচিত এ সংবিধানের অনুসরণ ইসলামি রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। এ সংবিধান মেনে চলা বা না চলার বিষয়ে কোনো স্বাধীনতা নেই; বরং কোনো রাষ্ট্র ইসলামি হওয়ার দাবি হচ্ছে যে সে কুরআন হাদিসের আলোকে রচিত

সংবিধান মেনে চলবে। "অতএব হে মুহাম্মদ, তুমি আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা করো এবং তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না। সাবধান হয়ে যাও, এরা যেন তোমাকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করে সেই হেদায়াত থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত করতে না পারে, যা আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাজিল করেছেন। যদি এরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ এদের কোনো কোনো গোনাহর কারণে এদেরকে বিপদে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। আর যথার্থই এদের অধিকাংশ ফাসেক। (যদি এরা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাহলে কি এরা আবার জাহেলিয়াতের ফয়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী, তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর চাইতে ভালো ফয়সালাকারী আর কেউ নেই (আল মায়েদা, ৫: ৪৯-৫০)।

আর যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই কাফের ... আর যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম ... আর যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই ফাসেক (সুরা মায়েদা, ৫: ৪৪, ৪৫, ৪৭)।

এ সব আয়াত যদিও আহলে কিতাবদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছিল কিন্তু এগুলো ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যা আহলে কিতাব এবং মুসলিম সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। কুরআন শরিফের ব্যাপারে যে বিষয়টি সবার কাছে সুস্পষ্ট তা হলো: যে সংশ্লিষ্ট শব্দ বা ঘটনা ধর্তব্য হয় না; বরং ব্যাপক ও সার্বজনীন অর্থেই তা থেকে গ্রহণ করা হয়।

এখানে এ কথাতো অকল্পনীয় যে আল্লাহ তায়ালা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের থেকে যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না তাদেরকে কাফের কিংবা জালেম অথবা ফাসেক হিসেবে আখ্যায়িত করবেন এবং মুসলমানদেরকে তার থেকে মুক্তি দিবেন। আল্লাহর ইনসাফের সামনে সবাই সমান। হজরত মুহাম্মদের সা. ওপর যা নাজিল করা হয়েছে তা মুসা আ. ও ঈসার আ. ওপর নাজিলকৃত বিষয় থেকে ভিন্ন কিছু নয়! সব কিছু একই নির্ঝরণী থেকে উৎসরিত।

কুরআন হাদিসের আলোকে রচিত উল্লেখিত সংবিধান মেনে চলার প্রতি ইসলামি রাষ্ট্রের এ বাধ্যবাধকতা ইসলামি শরিয়তের পক্ষ থেকে আরোপিত। সচ্ছল ও অসচ্ছল এবং ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সর্বাবস্থায় জনগণের থেকে আনুগত্য ও সহযোগিতা পাওয়া ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য ইসলাম প্রদত্ত অধিকার। কিন্তু যদি ইসলামি রাষ্ট্র ইসলাম প্রদত্ত সংবিধান ও বিধি-বিধানের পথ থেকে ছিটকে পড়ে তাহলে জনগণ

থেকে আনুগত্য ও সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। ইসলামি বিধান মোতাবেক মানুষের আনুগত্য একমাত্র সৎ ও ন্যায় কাজেই হতে হবে, অপরাধ ও গুনাহর কাজে মানুষের আনুগত্য করা যাবে না। মহানবি স. বলেন: "মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে পছন্দ ও অপছন্দ সর্বাবস্থায় তার ওপরস্থের আনুগত্য করা যতক্ষণ না কোন গুনাহ বা অপরাধজনিত কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। গুনাহ কিংবা অপরাধজনিত কাজে কোনো আনুগত্য নেই"। হযরতর আবু বকর রা. খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রদত্ত ভাষণে বলেন: "তোমরা ততক্ষণ আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্যের ওপর থাকি, আর যদি আমি আল্লাহর নাফরমানী করে থাকি তাহলে তোমাদের ওপর আমার আনুগত্যের কোনো বন্ধন অবশিষ্ট থাকবে না"।

বর্তমান সময়ের অনেক আধুনিক রাষ্ট্রকে সাংবিধানিক ও আইনানুগ বলে উৎফুল্লবোধ করতে দেখা যায়। ইসলামি রাষ্ট্র ইসলামের আইন-কানুন ও বিধি-বিধান পালনে দায়বদ্ধ, ইসলাম প্রদত্ত সীমারেখা অতিক্রম করার কোনো সুযোগ এর নেই। ইসলামের বিধি-বিধানই হচ্ছে এর সংবিধান যার অনুসরণ এর সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার আওতাভুক্ত। যার মাধ্যমেই এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জনগণের গ্রহণযোগ্যতা লাভের উপযুক্ততা লাভ করতে সক্ষম হয়।

এ সংবিধান ও আইন কানুন ইসলামি রাষ্ট্রের নিজস্ব রচিত কোনো বিষয় নয়; বরং এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত বাধ্যবাধকতা। তাই এ আইন-কানুনকে এড়িয়ে চলা বা রহিত করার ক্ষমতা এর নেই, তবে যদি এটি তার গতি প্রকৃতি ও চলার পথ পরিবর্তন করে এবং ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচয় থেকে বের হয়ে আসতে চায় তাহলে কেবল ইসলাম প্রদত্ত আইন-কানুনকে এড়িয়ে চলতে বা রহিত এবং ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচয় থেকে বের হয়ে আসতে চায়, তাহলে কেবল ইসলাম প্রদত্ত আইন-কানুন এড়িয়ে চলতে বা রহিত করার দুঃসাহস দেখাতে পারে।

ইসলামি রাষ্ট্র যে আকৃতি বা পরিচয় অথবা যে নামেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন মৌলিকভাবে এতে কোনো পার্থক্য নেই। যদিও ঐতিহাসিকভাবে এটি ইমামত এবং খেলাফত এ দু'পরিভাষায় পরিচিত ছিল। আর ইমামত ও খেলাফত এ পরিভাষাদ্বয় অত্যন্ত অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

ইমামতের অর্থ হচ্ছে: লিডারশিপ তথা নেতৃত্ব মানুষ যার আনুগত্য করে, অনুসরণ করে এবং যা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। নামাজের ইমামতি থেকে এটি গৃহীত যেখানে উপস্থিত জনদের সর্বোচ্চ জ্ঞানী ও সর্বোচ্চ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিই ইমামতি করে থাকে যাতে মানুষ তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

হাসান বসরী রহ. ন্যায়পরায়ন ইমামের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন: যিনি আল্লাহ এবং তাঁর বান্দাদের মাঝখানে অবস্থান করেন, আল্লাহর কাছ থেকে শোনেন এবং মানুষের থেকেও শুনে থাকেন, আল্লাহর দিকে দৃষ্টি দেন এবং মানুষকেও দেখে থাকেন এবং আল্লাহর আনুগত্য করার পাশাপাশি মানুষকে পরিচালিত করে থাকেন এবং মানুষের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নর মনোনিত করে পাঠাতেন এবং জনগণকে তাদের মিশন সম্পর্কে অবহিত করতেন। জনগণের উদ্দেশে তিনি বলতেন: "আমি তোমাদের শাস্তি প্রদান কিংবা তোমাদের ধন-সম্পদ আহরণ করার জন্য তাদেরকে প্রেরণ করি নি; বরং শিক্ষাদাতা হিসেবেই তাদেরকে প্রেরণ করেছি"।

খিলাফত অর্থ হচ্ছে: দ্বীনের হেফাজত ও সংরক্ষণ এবং দুনিয়া পরিচালনায় রসুল সা. প্রতিনিধিত্ব করা। আল্লামা তাফতাযানী ও ইবনে খালদুনসহ অনেকেই খিলাফতের পরিচয় এভাবেই দিয়েছেন।

ইমাম কিংবা খলিফা অথবা সরকার প্রধান হচ্ছেন: জনগণের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি, যিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আবার ভুলও করতে পারেন, ভালো করতে পারেন, আবার খারাপও করতে পারেন। যখন তিনি সঠিক ও ভালো করবেন মুসলমানদের উচিত তাকে মনোনয়ন দেওয়া এবং আনুগত্য করা, আবার যখন তিনি ভুল অথবা অনুচিত কিছু করবেন তখন মুসলমানদের দায়িত্ব তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া। ইসলামের প্রথম খলিফা তার প্রথম ভাষণে অনুরূপ কথাই বলেছিলেন।

ইসলামে ইমাম বা খলিফা নিষ্পাপ কিংবা কোনো পবিত্র কেউ নয় যে সে জিজ্ঞাসাবাদ ও জবাবদিহিতার উর্ধ্বে থাকবে। খলিফার পদমর্যাদা নিছক শ্রদ্ধার কিংবা সম্মানিত কোনো পদ নয়; বরং এটি দায়িত্বের বোঝা বহনের পদ। খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ রা. যখন এ পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তার প্রদত্ত ভাষণে বলেন: হে মানব সকল! আমিতো তোমাদেরই একজন, তবে আল্লাহ আমাকে তোমাদের থেকে বেশি বোঝা বহনের দায়িত্ব দিয়েছেন।

অনেক খলিফাকে আমরা দেখেছি মামলার এক পক্ষ হয়ে বিরোধীপক্ষের ন্যায় বিচারকের সামনে দাঁড়াতে; বরং বিচারকদের মধ্যে এমনও দেখা যায় যারা খলিফার বিরুদ্ধে ইহুদি কিংবা খ্রিস্টানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে ফয়সালা দিয়ে ছিলেন। যেমনটি করেছিলেন কাজী শুরাইহ, যে ঘটনা সবারই জানা, তিনি তৎকালীন মুসলমানদের খলিফা হযরত আলীর রা. বিপরীতে একজন খ্রিস্টানের পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালা নিজেকে জবাবদিহিতার উর্ধ্বে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। "তাঁর কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদেরকে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে" (আল আম্বিয়া, ২১: ২৩)। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অবশিষ্ট সবাই তাদের কথা, কাজ, যাবতীয় তৎপরতা ইত্যাদির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এমনকি স্বয়ং রসুলও সা. যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি আসেনি সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়েছেন, পর্যালোচিত হয়েছেন, বিকল্প প্রস্তাবের মুখোমুখি হয়েছেন এবং তাঁর মত ত্যাগ করে সাহাবিদের মত গ্রহণ করেছেন।

রসুল সা. যখন হযরত আবু হুরাইরাকে রা. এ বলে মানুষকে সুসংবাদ দিতে পাঠাচ্ছিলেনঃ যে ব্যক্তি 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই' এ কথার স্বীকৃতি দেয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হযরত উমর রা. আশংকা করেছিলেন যে, মানুষ এ কথা জানার পর হয়তবা যাবতীয় ইবাদাত-বন্দেগী পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র এই আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করাকে যথেষ্ট মনে করতে পারে। তাই তিনি বললেনঃ ইয়া রসুলুল্লাহ সা. তাদেরকে ইবাদাত-বন্দেগীর ওপর ছেড়ে দিন। রসুল সা. আবু হুরাইরাকে রা. বললেন : ঠিক আছে তাদেরকে ইবাদত-বন্দেগীর ওপর ছেড়ে দাও। এভাবেই তিনি (রসুল সা.) নিজের মত পরিত্যাগ করে হযরত উমরের রা. মত গ্রহণ করলেন।

খন্দক যুদ্ধকালীন একটি ঘটনা সবার কাছে পরিচিত। রসুল সা. হযরত সা'দ ইবনে মায়ায রা. এবং সা'দ ইবনে ওবাদাকে রা. যখন একটি বিষয় প্রস্তাব দেয়ার পর তারা এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিল তখনি তিনি তাঁর প্রস্তাব তুলে নিয়েছিলেন।

বদরের যুদ্ধে রসুল সা. কর্তৃক হুবাব ইবনে মুনযিরের রা. মতামত গ্রহণ করা ইতিহাসের একটি পরিচিত ঘটনা। যখন হুবাব জানতে পারলেন রসুলের সা. প্রথম অবস্থান ওহিভিত্তিক নয়; বরং যুদ্ধকৌশল হিসেবে, তখনি তিনি যা সঠিক মনে করলেন তার দিকে রসুলের সা. দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, আর রসুল সা. বাস্তবায়ন করলেন।

ইসলামে শাসক মূলত জাতির প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত। উপরন্তু তাদের সেবক বটে! প্রতিনিধি কিংবা সেবক নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতির সদস্যরা শাসকের ওপর কর্তৃত্বারোপ করতে পারবে।

বিশিষ্ট ফকীহ তাবেয়ী আবু মুসলিম খাওয়ালানী র. মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ানের রা. দরবারের প্রবেশ করে বললেনঃ হে জাতির সেবক! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত

হোক। তখন উপবিষ্ট তার সভাসদরা বলল, বলুন: হে আমীর! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি পুনরায় বললেন: হে জাতির সেবক! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তখন তারা তাদের পূর্বোক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করল। তিনি ফের তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর মুয়াবিয়া রা. বললেন: তোমরা থামো! আবু মুসলিমকে বলতে দাও, তার কথা সম্পর্কে সে অধিক জ্ঞাত।

কবি আবুল আ'লা (আল-মাআররী) তাঁর যুগের শাসকগোষ্ঠীর ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর কবিতায় এজাতীয় কথাই পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেন: বেঁচে থাকাটাই বড় কষ্টকর হয়ে পড়ছে! কত জাতি দেখেছি যাদের শাসকগোষ্ঠী প্রজাদের কল্যাণ চিন্তা করে না; বরং তাদের ওপর জুলুম করে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত মেতে ওঠে এবং জাতির স্বার্থ ভুলে গিয়ে নিজের স্বার্থ অর্জনে মেতে ওঠে, অথচ এরাই হচ্ছে জাতির সেবক।

রাজতন্ত্র নয়; পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র

ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের মতো পারিবারিক কোনো উত্তরাধিকার বহন করে না।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও ধী-শক্তি এবং সচ্চরিত্র ইত্যাদি কখনো উত্তরাধিকারীর ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্জিত হয় না। অনেক ভালো ও সৎ পিতার বংশে কুসন্তানের অস্তিত্ব দেখা যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইব্রাহীম ও ইসহাক আ. সম্পর্কে বলেন: "তাদের বংশধরের মধ্যে সু-সন্তান ও কু-সন্তান উভয়ই রয়েছে" (সুরা সাফফাত, ৩৭: ১৩)।

আল্লাহ তায়ালা যখন ইব্রাহীমকে আ. বললেন: "নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের নেতা বানাব"। ইব্রাহীম আ. বললেন: "আমার বংশধর থেকে কেউকি তা পাবে?" আল্লাহ বললেন: "আমার এ আমানত জালিমদের কেউ পাবে না" (সুরা বাকারা, ২: ১২৪)।

গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতির ওপর ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে এটি পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুলিপি। জনগণই তাদের শাসক মনোনীত করবে এবং তাদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও শাসক হিসেবে তাদের ওপর কাউকে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না–পশ্চিমা গণতন্ত্রের এ মূলনীতির সাথে ইসলামি রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে ঐক্যমত্য পোষণ করে থাকে।

এমনিভাবে মজলিশে শুরা ও রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের সামনে সরকার প্রধানের জবাবদিহিতা থাকবে, এমনকি সরকার প্রধানকে প্রয়োজনে বরখাস্ত করার অধিকার

তাদের থাকবে যদি সে তাদের দেখানো পথ অবলম্বন না করে; গণতন্ত্রের এ মূলনীতির সাথে ইসলাম ঐকমত্য পোষণ করে থাকে।

এর সাথে অতিরিক্ত ইসলামের বিধান হচ্ছে যে, ইসলাম রাষ্ট্রের নারী পুরুষ নির্বিশেষ ওপর প্রয়োজনে তাদের শাসককে পরামর্শ দেয়া এবং তাকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা আবশ্যক করেছে। কারণ মুমিনদের পারস্পরিক অধিকারের দাবি হচ্ছে তারা একে অপরের কল্যাণ কামনায় তাকে পরামর্শ, আদেশ-নিষেধ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না, তার মান-মর্যাদা যত বড়ই হোক না কেন। আল কুরআনে বলা হয়েছে: "মুমিনরা একে অপরের বন্ধু, পরস্পরের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে" (সুরা তাওবা, ৯: ৭১)।

পশ্চিমা গণতন্ত্রের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সেখানে এমন কোনো নিয়ম-নীতি ও মূল্যবোধ নেই যা এটিকে পরিচালিত ও পরিশীলিত করতে সক্ষম হয়। এতে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার নামে যে কেউ ইচ্ছে করলে যাবতীয় মূল্যবোধের কবর দিতে, নানাবিধ অপরাধের স্বীকৃতি দিতে এবং বৈধ কাজের অবৈধতা ও অবৈধ কাজের বৈধতা দিতে সক্ষম হয়। এমনকি বৃটিশ পার্লামেন্ট সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, প্রতিষ্ঠানটি ইচ্ছে করলে পুরুষকে নারী ও নারীকে পুরুষ পরিণত করা ছাড়া অবশিষ্ট যে কোনো কাজ করতে সক্ষম!

তাইতো আমরা দেখি মদ্যপানের মাধ্যমে বৈষয়িক, শারীরিক ও মানসিকসহ যাবতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন গণতন্ত্রে এর বৈধতা প্রদান করতে। এমনকি কখনো কখনো পশ্চিমা গণতন্ত্র পুরুষের সাথে পুরুষের এবং নারীর সাথে নারীর বিবাহের বৈধতা প্রদান করে থাকে!

পশ্চিমা গণতন্ত্র বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা, জনগণের মতামত যাচাই প্রভৃতি কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে যে কোনো কিছুর বৈধতা প্রদান করে থাকে। তাইতো জনৈক আরব শাসক বলেছিলেন: গণতন্ত্রের রয়েছে অনেক বিষদাঁত ও হিংস্র থাবা এটি কখনো একনায়কত্ব রূপে ভয়ংকর আকৃতি ধারণ করতে পারে!

পশ্চিমা গণতন্ত্রের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দিলেও এ কথাটি বলা যায় যে, এটি সর্বদা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির স্বার্থ সংরক্ষণেই ব্যবহৃত হয়। তাই আশ্চর্যের কিছু নেই যে, যখন দেখা যায় পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে সুদ, মজুদদারী ইত্যাদিরও বৈধতা প্রদান করা হয় যাতে সমাজের প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর শ্রেণির স্বার্থ আদায় ও সংরক্ষণ সক্ষম হয়; যদিও এতে সমাজের বিপুল সংখ্যক জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

গণতন্ত্রে ধরে নেওয়া হয় যে এটি হচ্ছে জনগণ পরিচালিত, জনগণের জন্য এবং জনগণেরই শাসন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এখানে এমন অনেকে জনগণের

প্রতিনিধির রূপ ধারণ করে আসে যারা প্রকৃতপক্ষে জনস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক ও তাদের বাহিনী তথা ক্ষমতাধর সোসাইটির স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এটা এ জন্য যে, জাল ভোটের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধি মনোনীত হওয়ার কথা বাদ দিলেও মূলত এখানে প্রার্থী মনোনয়ন এবং ভোট উভয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো শর্তাবলী অথবা চারিত্রিক কোনো মাপকাঠির বাধ্যবাধকতা নেই।

যে শুরা তথা পরামর্শ সভার ওপর ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। পরামর্শ সভার বিবিধ সীমারেখা রয়েছে যা অতিক্রম করার কোন সুযোগ নেই। ইসলাম বর্ণিত ধর্মবিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগি, চারিত্রিক মাপকাঠিসহ বিভিন্ন অকাট্য বিধি-বিধান যেগুলো মূলত ইসলামি সমাজ ও এর জীবন চলার পথের মৌলিক উপাদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরামর্শের কোনো সুযোগ নেই। সরকার, পার্লামেন্ট ও আইনসভার পক্ষে এর কোনো কিছুকে রদবদল কিংবা রহিত করার কোনো অধিকার নেই। কারণ আল্লাহ তায়ালা যা কিছু আদেশ করেছেন তাকে রহিত করা এবং যা কিছু থেকে বারণ করেছেন তাকে বাস্তবায়ন করার অধিকার কোনো আদম সন্তানের নেই।

ভোটার ইসলামের দৃষ্টিতে সাক্ষীতুল্য। ন্যায়-ইনসাফ, সচ্চরিত্রসহ একজন সাক্ষীর যে সব যোগ্যতা ও গুণাবলী থাকা আবশ্যক একজন ভোটারেরও তা থাকা আবশ্যক। "তোমাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরাই শুধু সাক্ষ্য দিবে" (সুরা তালাক, ৬৫: ২)। "যাদের ব্যাপারে তোমাদের আস্থা রয়েছে তাদের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে" (সুরা আল বাকারা, ২: ২৮২)।

এমনিভাবে যখনি ভোট প্রার্থনা করা হয় তখন ভোটের আকৃতিতে সাক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং ভোট না দিয়ে সাক্ষ্য গোপন করা বৈধ হবে না। "যে ব্যক্তি তা গোপন করবে সে গুনাহগার হবে" (সুরা বাকারা, ২: ২৮৩)। "সাক্ষীদের যখন সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হয় তখন তারা যেন বেঁকে না বসে" (সুরা বাকারা, ২: ২৮২)।

আর প্রার্থীকে অবশ্যই "সংরক্ষণকারী ও জ্ঞানী"[১] অথবা "শক্তিশালী ও আমানতদার"[২] হতে হবে। অন্যথায় এ স্থান ছেড়ে দিতে হবে। এ মূলনীতিকে

---

[১] এখানে কুরআনের ঐ আয়াতের ইঙ্গিত করা হয়েছে যেখানে ইউসুফ আ. মিসরের শাসককে বলেছিলেন: "দেশের ধন-সম্পদের দায়িত্ব আমার উপর সোপর্দ করুন, নিশ্চয় আমি সংরক্ষণকারী ও এ বিষয়ে জ্ঞানও রাখি" (সুরা ইউসুফ ১২: ৫৫)।

অবহেলার পরিণামে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। মহনবি সা. বলেন: 'যখন আমানত বিনষ্ট করা হয় তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো; জিজ্ঞেস করা হলো- কিভাবে এর বিনষ্ট করা হয় ইয়া রসুলুল্লাহ? তিনি বললেন: অযোগ্য ও অদক্ষ ব্যক্তির হাতে যখন কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো' (বুখারি)।

ড. শাওয়ীর মূল্যবান বক্তব্য

কায়রো থেকে প্রকাশিত "আল ওয়াফদ" পত্রিকার ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ সংখ্যায় ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করে খালেদ মুহাম্মদ খালেদের জিজ্ঞাসার জবাবে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ওপর ইসলামি রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিয়ে ড. তাওফীক শাওয়ীর লিখিত প্রবন্ধ থেকে এখানে কিছু উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। ড. শাওয়ী বলেন:

"গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ওপর ইসলামি রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্বের দু'টি দিক রয়েছে: প্রথমত: আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলনীতি আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলতে হবে যে, ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে হাজার বছরের অধিক সময় ধরে এগিয়ে আছে। দ্বিতীয়ত: এ ক্ষেত্রে ইসলাম যে মূলনীতি দিতে সক্ষম হয়েছে আধুনিক কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছতে এখনো সক্ষম হয়নি এবং আরো হাজার বছর অপেক্ষা করার পরও এ পর্যায়ে পৌঁছার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই"।

যে সব মূলনীতির মাধ্যমে ইসলাম সাংবিধানিক ও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি তা নিম্নে আলোচিত হলো:

১. 'শরিয়াহ তথা ইসলামি আইনের শ্রেষ্ঠত্ব' এ মূলনীতি 'মানব জাতির রচিত সাধারণ আইনের নেতৃত্ব' শীর্ষক মূলনীতি থেকে উত্তম। গণতান্ত্রিক এ মূলনীতিতে রাষ্ট্রের একমাত্র নীতি নির্ধারক হিসেবে আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের জন্য কোনো সীমারেখা টেনে দেয়া হয়নি, এবং এক্ষেত্রে তাদের জন্য কোনো শর্তাদি বা কোন কার্যপরিধি নির্ণয় করে দেয়া হয়নি;

---

[২] এ আয়াতটি মুসার আ. ঘটনা সংশ্লিষ্ট আয়াত যেখানে শুয়াইবের (আ.) কন্যা বলেছিলেন: "আব্বাজান! একে কাজে নিয়োগ করুন, কাজের জন্য এমন ব্যক্তিই উত্তম হতে পারে যে শক্তিশালী ও আমানতদার" (সূরা আল কাসাস: ২৬)। এখানে শক্তির অর্থ হচ্ছে যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং আমানত যা দ্বারা খোদাভীতি ও সচেতনতা প্রকাশিত হয়। এরা একটি অপরটির পরিপূরক।

তা পার্লামেন্ট (প্রত্যক্ষ ও স্বচ্ছভাবে বা কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচিত) হোক বা সরকার প্রধান, অথবা সামরিক, বেসামরিক যে কোনো কাউন্সিল যারা আইন প্রণয়নের অধিকার রাখে তাদের যে কারো তত্ত্বাবধানের পরিচালিত হোক না কেন। কিন্তু ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষসহ রাষ্ট্রের সকল বিভাগের ওপর শরিয়াহ তথা ইসলামি আইনের পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব বহাল থাকবে। শরিয়তের কোনো বিধানকে পরিবর্তন বা রহিত করার অধিকার আইন প্রণয়নকারী সংস্থার কার্যপরিধির আওতাধীন নয়।

এভাবে ইসলাম একমাত্র প্রথম রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ (প্রকৃত হোক বা কারচুপির মাধ্যমে হোক) শাসকবর্গের কার্যসীমার পরিধি নির্ণয় করে দেয়া হচ্ছে। বর্তমান সময়ের সংবিধান বিশেষজ্ঞ আইনবিদদের নিকট এটাই এখন আলোচ্য বিষয়: তারা 'ল অব নেচার' নামে কতিপয় সার্বজনীন ও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রণয়নের চেষ্টায় রত এবং তারা আশা পোষণ করে যে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নকারী সংস্থার অবশ্যই এ সব মূলনীতি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থাকবে। এর মধ্যে মানবাধিকারের মূলনীতি উল্লেখযোগ্য; কিন্তু তারা এখনো এ সব মূলনীতিকে যারা অন্যায়ের পথ ধরে ক্ষমতায় আরোহণ করে এবং স্বেচ্ছাচারিতার পথ বেছে নেয়, তাদের কর্তৃক পরিবর্তন বা রহিতকরণ ক্ষমতা থেকে রক্ষা করার কোনো পথ খুঁজে পায়নি। তাই আইনবিদ ও দার্শনিকদের প্রদত্ত এ সব বড় বড় মূলনীতি এখনো আইন প্রণয়নকারী সংস্থা অথবা শাসকগোষ্ঠীর জন্য কার্যত কোনো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি, তা স্বৈরশাসন, একনায়কত্ব বা সামরিক বেসামারিক ইত্যাদি যে কোনো পর্যায়ের হোক না কেন ।

অথচ ইসলাম হাজার বছর বা ততোধিক পূর্বে এ বিষয়ে অকাট্য ফয়সালা দিতে সক্ষম হয়েছে। ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আল কুরআনকে রাষ্ট্রের একমাত্র সংবিধান হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং কুরআন বর্ণিত মৌলিক বিধি-বিধানকে পবিত্রতা, স্থায়িত্ব ও অমরত্ব দান করেছে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস যারা হেফাজত করে এবং শরিয়তের আসমানী নির্ঝরণীগুলো যার কার্যপরিধি নির্ণয় করে থাকে। এছাড়া ইসলামের রয়েছে আরো অনেক বাস্তবিকদিক যা বিস্তারিত আলোচনার এখানে অবকাশ নেই।

২. 'উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব' এ মূলনীতি আধুনিক গণতন্ত্রের 'জনগণের শ্রেষ্টত্ব' শীর্ষক মূলনীতি থেকে উত্তম। কেননা মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনাধীন অনেক জাতিগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে আছে। জনগণের নেতৃত্ব

দ্বারা যদি অঞ্চলভিত্তিক কোনো জাতির নেতৃত্ব, যা কোনো রাষ্ট্রের শাসনাধীন এবং যে কোনো সরকার ইচ্ছে করলে তাকে স্বীকৃতি দিতে বা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে অথবা তারা আশা-আকাঙ্ক্ষার গলা টিপে ধরতে এবং তার পরিচয় বহন করে যা ইচ্ছে তা করতে পারে ইত্যাদি বুঝানো হয়; তাহলে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব, ইসলামি শরিয়তে যার 'আল ইজমা' তথা একক ও অভিন্ন সিদ্ধান্তে আসার অধিকার রয়েছে এবং বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল, মহাদেশ ও ভূখণ্ডে মুসলিম যা লালন করে থাকে ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। 'আল ইজমা' তথা ঐকমত্য পোষণ, যা এ বিশাল জাতি অথবা তার প্রতিনিধিতুল্য গবেষক, মুজতাহিদ ও আলেম-উলামাদের সমন্বয়ে হয়ে থাকে এবং যা এককভাবে ইসলামি জীবন বিধানের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠী যাদের সমন্বয়ে এ উম্মাহ গঠিত তাদের অথবা যারা (ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অথবা ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায়ভাবে হোক) এ সব জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করে তাদের সবার উচিত উম্মতের এ ইজমা তথা ঐকমত্যকে সম্মান করা। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর জাতীয় নেতৃত্ব বাস্তব রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়।

মুসলিম উম্মাহর এ বৈশিষ্ট ও গুণাবলীসহ 'ইজমা' তথা ঐকমত্য পোষণ করার মাধ্যমে তা এককভাবে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এটি এককভাবে আইন প্রণয়নের নেতৃত্বের দাবিদার কোনো পার্লামেন্ট যা এ উম্মাহর কোন একটি জাতির প্রতিনিধিত্ব করে ইত্যাদির পক্ষে দাবি করা বৈধ হবে না। যদি এ উম্মাহর কোনো জাতিগোষ্ঠীর জন্য কোনো প্রকারের নেতৃত্বের সুযোগ দেয়া হয়, তবে তা হবে সীমিত এবং তা সার্বজনীন সর্বোচ্চ নেতৃত্ব তথা পুরো উম্মাহর ঐকমতের ভিত্তিতে হবে।

৩. ইসলামে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের পৃথকীকরণের যে মূলনীতি রয়েছে তা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কর্তৃক স্বীকৃত সাংবিধানিক ধারার ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা সরকার প্রধান ও পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে আইন বিভাগ, কার্যনির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের সব বিভাগের সদস্য পৃথকীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

রাষ্ট্র এবং তার সব রাজনৈতিক বিভাগ থেকে আইন প্রণয়নের স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা যা ইসলাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত, আধুনিক ও প্রাচীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এর সমপর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। ইসলামি রাষ্ট্রই বিশ্বে একমাত্র রাষ্ট্র যার জন্য

'আইন-কানুন জনগণের বা রাষ্ট্রের ইচ্ছার প্রতিফলন' এ ধরনের দাবি করা বৈধ নয়; কিন্তু সাধারণ আইনের আধুনিক ও প্রাচীন সকল গ্রন্থে এ ধরনের দাবি করা হয়। ইসলামের ইতিহাসের ন্যায়পরায়ণ হোক বা স্বৈরাচার হোক কোন শাসক খুঁজে পাওয়া যাবে না যে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় নতুন কোনো মৌলিক আইন[৩] প্রণয়ন করেছে : কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠী নিজের ইচ্ছে মোতাবেক শুধু আইন নয়; বরং সংবিধানও পরিবর্তনের দাবি করার ক্ষমতা রাখে (ড. শাওয়ীর কথা এখানে সমাপ্ত)।

গণতন্ত্র সাংবিধানিক গ্যারান্টি, মনিটরিং সেল, বিভিন্ন বিভাগের আলাদাকরণ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বহুদলীয় রাজনীতি, শাসকগোষ্ঠীর মোকাবিলায় গণসচেতনতা ইত্যাদি যে সব কিছু উপহার দিয়েছে তা আমরা অস্বীকার করি না, যার মাধ্যমে স্বৈরাচারের মূলোৎপাটন, মজলুমের সহযোগিতা এবং পার্লামেন্ট, বিভিন্ন ধরনের মনিটরিং সেল ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ এ জাতীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক স্বাধীনতার ভিত মজবুত করা সম্ভব হয়।

"সাদ্দ আয্ যারায়ি" অর্থাৎ সম্ভাব্য বিভিন্ন খারাপ কাজের দ্বার বন্ধ করা এবং 'যা ছাড়া কোনো আবশ্যকীয় কাজ সম্পন্ন হয় না তা করাও আবশ্যক' ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় এ সব মৌলিক ধারায় আলোকিত গণতন্ত্রের বিভিন্ন ইতিবাচক দিক গ্রহণ করে লাভবান হওয়া প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। গণতন্ত্রের যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে শুরার ভিতকে মজবুত করা যায় এবং জালেম ও স্বৈরাচারী শাসকের মোকাবিলা করা যায়; বরং যার ফলে স্বৈরাচার জন্ম নেওয়ার কোনো সুযোগই থাকে না এগুলো গ্রহণ করা প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যক।

কর আদায় নয়; বরং; হেদায়াত ও কল্যাণকর রাষ্ট্র

ইসলামি রাষ্ট্র (যেমনটি আল্লামা আবুল হাসান নদভী র. বলেন) কর সংগ্রহকারী কোনো রাষ্ট্র নয়; বরং এটি হেদায়াত তথা কল্যাণকর রাষ্ট্র। অর্থাৎ এর মূল মিশন হচ্ছে বিশ্বজনীন ইসলামের দাওয়াত প্রচার করা এবং শাশ্বত ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়া। ইসলাম তো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বমানবতার জন্য রহমত স্বরূপ।

---

[৩] এখানে আইন দ্বারা জীবন পরিচালনার সার্বজনীন ও মৌলিক নতুন আইন বুঝানো হয়েছে যা প্রণয়ন করার অধিকার মানুষের নেই। শরীয়তের মূলনীতি এবং ইসলামি ফিক্হ থেকে গবেষণালব্ধ আংশিক বা যৌগিক কোনো আইন এখানে উদ্দেশ্য নয়। এ ধরনের গবেষণা হয়েছে এবং হবে, এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই যদি তা শরীয়তের কোনো টেক্সট বা কোন মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

আল্লাহর বান্দাদের কাছ তাঁর এ রহমত পৌছাতে কার্পণ্য করা কখনো বৈধ হতে পারে না।

মহানবি সা. চিঠি ও দূত প্রেরণের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের কর্ণকুহরে ইসলামের বাণী পৌছানোর ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তারা আল্লাহর দরবারে ইসলামের দাওয়াত না পাওয়ার অজুহাত নিয়ে দাঁড়াতে না পারে। বর্তমান সময়ে যেখানে রাষ্ট্র সব কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে থাকে এবং যেখানে দাওয়াতের বিভিন্ন উপায়-উপকরণ খুবই সহজলভ্য যার এক দশমাংশও ইতঃপূর্বে কল্পনাও করা যেত না, এই অবস্থায় রাষ্ট্রের উচিত যাবতীয় বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিশ্ব মানবতার কর্ণকুহরে ইসলামের সুমহান বাণী পৌছিয়ে দেয়া, যারা মূলত ইসলামের কোনো কিছুই জানতে পারেনি, অথবা জানতে পারলে তাও যৎসামান্য। অথবা যা কিছু জানতে পেরেছে তাও বিকৃত এবং বানোয়াট যা লাভের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর, যেখানে ইসলামের সত্যিকার বাণী নয় এমন কিছুকে ইসলামের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং বানোয়াট যা লাভের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর, যেখানে ইসলামের সত্যিকার বাণী নয় এমন কিছুকে ইসলামের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থান করে মিথ্যাকে সত্যের আকারে এবং সত্যকে মিথ্যার আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত না পৌছালে ঐ সকল লাখ লাখ বনী আদমের জন্য আল্লাহর দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

ইসলামি রাষ্ট্রের মিশন হচ্ছে মানুষকে সত্যিকারঅর্থে আল্লাহর পথের সন্ধান দেয়া, ইসলামের পথের যাবতীয় বাধা-বিপত্তি দূর করে তাকে কন্টকমুক্ত করা এবং মানুষের কাছে সময় ও যুগোপযোগী করে ইসলামের বাণী ও শিক্ষা পেশ করা যাতে তারা সহজেই বুঝতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: 'আমি প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের ভাষাভাষী রসুল প্রেরণ করেছি যাতে সে সুস্পষ্টভাবে তাদের কাছ দাওয়াত পৌছাতে সক্ষম হয়' (সুরা ইবরাহীম, ১৪: ০৪)। পঞ্চদশ শতকের মানুষের কাছে দাওয়াত পৌছানোর ভাষা নিশ্চয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতক থেকে ভিন্ন হবে। আমাদের অবশ্যই এ পার্থক্য বুঝতে হবে এবং মানুষের সামনে তাদের পরিচিত ভাষা আলোচনা করতে হবে এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদের অপছন্দনীয় ভাষা ও যাবতীয় অপরিচিত বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতে হবে যাতে তারা তাদের অজান্তেই আল্লাহ ও তাঁর রসুল সা.কে অস্বীকার করতে বাধ্য হয়ে না পড়ে।

মিশরস্থ ওমর ইবনে আবদুল আজীয নিযুক্ত গভর্নর একদা তাঁর কাছে অত্যধিক হারে মানুষের ইসলাম গ্রহণের অভিযোগ করেছিল। যার ফলে তাদের থেকে ট্যাক্স

রহিত হয়ে যায় এবং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা না থাকায় রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ক্ষতি হচ্ছিল। গভর্নরের ইচ্ছে ছিল মুসলমান হওয়ার পরও রাষ্ট্রীয় কোষাগারের স্বার্থে তাদের ওপর ট্যাক্স আদায়ের বাধ্যবাধকতা বহাল থাকবে। তখন ওমর ইবনে আব্দুল আজীযের প্রত্যুত্তর কি ছিল? তিনি সংক্ষিপ্ত ও অর্থবহ একটি বাক্যে এর উত্তর দিয়েছিলেন যা ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য মাইলফলক হয়ে আছে। মহান খলিফা বলেছিলেন: "আল্লাহ তোমাদের এ চিন্তাধারা থেকে মুসলিম জাতিকে হেফাজত করুন! নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদকে সা. কর আদায়কারী হিসেবে নয়; বরং সৎ পথ প্রদর্শনকারী ও কল্যাণকামী হিসেবেই প্রেরণ করেছিলেন!"

এটাই হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রের মূল বার্তা: ট্যাক্স নয়-হেদায়াত। কখনো দেখা যায় যে কোনো উপায়ে প্রজাদের পকেট থেকে ধন-সম্পদ সংগ্রহ করাই যেন রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছে দেয়া। একজন মানুষকে ইসলামের সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া, আসমান জমিনের মধ্যকার সব কিছু থেকে উত্তম।

অসহায় ও দুর্বলের আশ্রয়স্থল ইসলামি রাষ্ট্র

সবলের স্বার্থ নয়; বরং দুর্বলের অধিকার সংরক্ষণই ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। তাই ইসলামি রাষ্ট্র সম্পদশালীদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করে গরিব দুস্থদের মাঝে তা বিতরণ করে থাকে। এমনিভাবে রাষ্ট্রের অন্যান্য রাজস্ব থেকেও এতিম, অনাথ ও সম্বলহারা মুসাফিরের জন্য ইসলামি রাষ্ট্রে সহযোগিতার অংশ নির্ধারিত থাকে, 'যাতে ধন-সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকটি হাতে সীমাবদ্ধ না হয়ে পড়ে' (সুরা হাশর, ৫৯: ৭)।

ইসলামের প্রথম খলিফা তার ভাষণে বলেন: 'জেনে রেখো! তোমাদের মধ্যে সবল ব্যক্তি আমার কাছে দুর্বল যতক্ষণ না তার থেকে অপরের অধিকার আদায় করতে পারি, এবং তোমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে সবল যতক্ষণ না তার প্রাপ্ত অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারি'।

ইসলামি রাষ্ট্র অসহায় মজলুমদের রাষ্ট্র। শক্তিশালী ও বলবানদের বিষাক্ত থাবায় যারা আক্রান্ত ও জালেমদের পায়ের তলায় যারা পিষ্ঠ এবং তাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার দাপটের সামনে যারা অসহায়ভাবে জীবনাপাত করছে, এ সকল মজলুমকে জুলুম-অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ দেয়ার জন্যই ইসলামি রাষ্ট্র এদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত। 'তোমাদের কি হয়েছে' কেন

তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করছ না; অথচ মজলুম অসহায় নারী পুরুষেরা চিৎকার দিয়ে বলছেঃ হে প্রভু! আমাদেরকে এ অত্যাচারী জনপদ থেকে বের করে নাও, আমাদের জন্য তোমাদের পক্ষ থেকে একজন বন্ধু ও একজন সাহায্যকারী তৈরি করে দাও" (সূরা নিসা, ৪: ৭৫)।

ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে দুর্বলের অধিকার আদায়ে এতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সবলের অত্যাচার থেকে তাদের পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে। অথচ ইসলামে তাদের থেকে এ ধরনের কোনো দাবি উত্থাপিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা হয়নি; বরং তাদের কল্পনায়ও ছিল না যে অপরের কাছে তাদের কিছু প্রাপ্য রয়েছে। বংশানুক্রমে এসব অসহায় মজলুম জুলুম-অত্যাচারের শিকার হওয়াকে নিজেদের ভাগ্যলিপি বলে মেনে নিয়েছিল; এমনকি সমাজ জীবনে এটা স্বাভাবিক নিয়ম বলে ধরে নেয়া হয়েছিল যে দুর্বল চিরকালই সবলের দ্বারা অত্যাচরিত হবে। অতঃপর ইসলাম মানুষকে ন্যায়-ইনসাফ শিক্ষা দিল, যার মূলনীতি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, রসূলদের শিক্ষায় যা স্থান পেয়েছে এবং যার ওপর আসমান জমিনের ভিত প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম প্রদত্ত এ ন্যায় -ইনসাফের দাবি হচ্ছে দুর্বলের অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো যাতে তারা তাদের সামাজিক, আর্থিকসহ যাবতীয় অধিকার ফিরে পায়।

দাসত্বের মতো অভিশপ্ত প্রথা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য ইসলাম পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। দাসমুক্তিকে ইসলাম যাকাতের সম্পদ ব্যয়ের একটি খাত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে যার যথার্থ বাস্তবায়ন দাসমুক্তির জন্য যথেষ্ট।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজীযের শাসনামলে আফ্রিকার গভর্নর খবর পাঠালেন যে যাকাত দেওয়ার জন্য গরিব মিসকিন পাওয়া যাচ্ছে না। জবাবে দ্বিতীয় ওমর বললেন: দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দাও!

ধনীদের সম্পদে ইসলাম গরিবের প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটি ধনীদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ নয় যে তারা ইচ্ছে করলে দেবে অন্যথায় দেবে না; বরং ইসলাম তাকে দ্বীনের মূল স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। ধনীরা স্বেচ্ছায় দিতে না চাইলে তাদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও জাকাত নেয়া হবে; বরং এ ক্ষেত্রে তারা সুসংগঠিত হয়ে জোটবদ্ধ হলে তাদের সাথে জিহাদ করা হবে যেমনটি করেছিলেন প্রথম খলিফা আবু বকর রা.। এ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ইতিহাসের পাতায় সগৌরবে বিদ্যমান: "আল্লাহর শপথ! তারা যদি উটের রশি পরিমাণ সামান্য সম্পদও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রসুলের সা. যুগে পরিশোধ করত, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হব"।

জাকাত শুধু তাৎক্ষণিকভাবে কিছু টাকা বা কয়েক লোকমা খাবার দিয়ে সহযোগিতার নাম নয়; দরিদ্র ও অভাবী পরিবারের পরিপূর্ণ ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাই জাকাতের মূল লক্ষ্য, যাতে দরিদ্র ব্যক্তি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ তার মৌলিক প্রয়োজনসমূহ মোটামুটিভাবে যোগাড় করতে সক্ষম হয়। ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর সহযোগী ফকীহদের মতামত হচ্ছে একজন গরিবকে যাকাতের সম্পদের মাধ্যমে এমন ব্যবস্থা করে দিতে হবে যা দিয়ে সে মোটামুটিভাবে তার জীবনকাল অতিবাহিত করতে সক্ষম হয় এবং দ্বিতীয়বার যাকাত নেওয়ার মুখাপেক্ষী না হয়। আমার রচিত "ইসলামে যাকাতের বিধান" এবং "দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম" গ্রন্থদ্বয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এমনিভাবে অকস্মাৎ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি যেমন ঋণগ্রস্থ ও সহায়-সম্বলহীন মুসাফিরের সমস্যাও ইসলামের সুন্দর বিধান থেকে বাদ পড়েনি। এছাড়া ইসলাম পিতৃহারা এতিম অনাথদের লালন পালনের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। সুন্দর তত্ত্বাবধানে, অপমান-লাঞ্ছনা ও জুলুম-অত্যাচার থেকে তাদের ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণ এবং তাদের যদি ধন-সম্পদ থাকা অপব্যবহার ও জবর দখল থেকে তো হেফাজত করার জন্য ইসলাম জোর তাকিদ দিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে: "সর্বোত্তম ব্যবহার ছাড়া এতিমদের ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ করো না যতক্ষণ না তারা প্রাপ্ত বয়সে পৌছে" (সুরা আনআম, ৬: ১৫২; সুরা ইস্‌রা, ১৭: ৩৪)। যদি এতিমের সম্পদ ব্যবহারের দু'টি উপায় থাকে এবং তারমধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত উত্তম হয় তাহলে এ উত্তম পথেই তার সম্পদ বিনিয়োগ করতে হবে।

অসহায় দুর্বলের অধিকার এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে তা সংরক্ষণের বিষয়ে সাথে মানুষ ইতঃপূর্বে পরিচিত ছিল না। মহানবির সা. মুখনিঃসৃত বাণীতে যা যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

এমনিভাবে সমাজের যে কোনো স্তরের অসহায় দারিদ্রপীড়িত দুর্বল মানুষই ইসলামের সুন্দর তত্ত্বাবধান ও সুবিবেচনার অন্তর্ভুক্ত। সহায় সম্বলহীন অভাবগ্রস্থ মানুষ, স্বাধীনতাহারা দাস-দাসি; স্বদেশহারা মুসাফির, অভিভাবকহীন এতিম শিশু, স্বামীহারা নারী, বয়সের ভারে ক্লান্ত-শ্রান্ত বৃদ্ধসহ সব স্তরের অসহায় দুর্বলের জন্য রয়েছে ইসলামের সুনিপুণ তত্ত্বাবধান। হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর পথ থেকে যখন সমাজ ও জাতির দুর্বল লোকদের প্রতি গুরুত্বহীনতা প্রকাশ পাচ্ছিল তখন রসুল সা. তাঁকে বললেন: "তোমাদের মধ্যস্থ দুর্বল অসহায়দের সুবাদেই তো তোমরা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাহায্য সহযোগিতা ও রিজিকপ্রাপ্ত হয়ে থাকো"।[৪]

---

[৪] বুখারি।

উপর্যুক্ত হাদিস বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যাচ্ছে যে সমাজের অসহায় অনাথ জনগোষ্ঠী হচ্ছে আল্লাহর নিকটতম বান্দা এবং এদের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাতির সকল জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা ও রিজিক দিয়ে থাকেন। আমি মনে করি এ অর্থের পাশাপাশি উল্লেখিত হাদিসে অন্য একটি নিষ্ঠুর বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যার ব্যাপারে অধিকাংশেই মানুষ উদাসীন। তা হচ্ছে: এ অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত শোষিত জনগোষ্ঠীই মূলত সমাজের উৎপাদনের মূলকাঠি। সমাজের পরিশ্রমী ও উৎপাদক শ্রেণির মূল কাঠামো এদের দিয়েই গঠিত। যুদ্ধ জয়ের হোতা মূলতঃ এরাই, কারণ সেনাবাহিনীর লড়াকু জওয়ানদের বাহিনী এদের নিয়েই গঠিত হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল সা. বলেছেন "ঐ জাতির মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না যে জাতি এখনো জুলুম অত্যাচার ছাড়া দুর্বলের প্রাপ্ত অধিকার দিতে শেখেনি"।[৫]

হযরত মুয়াবিয়া রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল সা. বলেন : "আল্লাহ ঐ জাতির মধ্যে কোনো কল্যাণ রাখতে পারেন না যেখানে ইনসাফের সাথে বিচারকার্য সমাধা করা হয় না বরং যেখানে জুলুম অত্যাচারের শিকার হওয়া ছাড়া দুর্বল সবলের কাছ থেকে তাদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয় না"।[৬]

রাবীয়া ইবনে ইয়াজীদ থেকে বর্ণিত, হযরত মুয়াবিয়া রা. মুসলিম ইবনে মুখাল্লাদের কাছে এ মর্মে লেখেন যে তিনি যেন আব্দুল্লাহ ইবনে ইবনুল আ'স রা.-কে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি রসুল সা.-কে বলতে শুনেছেন কি-না "ঐ জাতির মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না যেখানে দুর্বল জুলুম অত্যাচারের শিকার হওয়া ছাড়া সবলের থেকে তাদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয় না"? যদি তিনি হ্যাঁ বলেন তা ডাকযোগে পাঠিয়ে দিও। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করে ইতিবাচক জবাব পেলেন এবং তা ডাকযোগে মিসর ও সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। হযরত মুয়াবিয়া রা. ডাকবাহক থেকে তা জেনে নেওয়ার পর বললেন, আমিও রসুল সা. থেকে এমনটি শুনেছি; কিন্তু আমি আরো নিশ্চিত হতে এটি করলাম।[৭]

---

[৫] আবু ইয়া'লা বিশস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এ হাদিস বর্ণনা করেন, কাবুস ইবনে মুহারেক তার পিতা থেকে এ ধরনের হাদিস বর্ণনা করেন, ইমাম তাবারানী কাবীরও আওসাতে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সনদে এ হাদিস বর্ণনা করেন। মাজমায়ুব যাওয়ায়েদ (৪/১৯৭)।

[৬] তাবরানী, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। মাজমায়ূয যাওয়ায়েদ (৫/২০৯)।

[৭] তাবরানী, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। মাজমায়ূয যাওয়ায়েদ (৫/২০৯)।

এ জাতীয় আরো বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে, যেখানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে রসুল সা. একাধিকবার এ ধরনের কথা বলেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মদিনায় আগমন করার পর রসুল সা. এক আনসারীর গৃহে ইবনে মাসউদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। তখন তার সঙ্গী-সাথীরা বলল: ইয়া রসুলুল্লাহ! তাকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিন! রসুল সা. বললেন: "তাহলে আল্লাহ আমাকে কেন প্রেরণ করেছেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ঐ জাতির প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন না যেখানকার জনগোষ্ঠী দুর্বলকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে প্রস্তুত নয়!"[৮]

হযরত বারীদা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত জা'ফর রা. আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর রসুল সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন: সেখানকার কোন বিষয়টি তোমার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে? তিনি বললেন: আমি দেখলাম একদা এক মহিলা মাথায় খাবারের ঝুড়ি বহন করে পথ চলছিল, পথিমধ্যে এক ঘোড়সওয়ার ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দেয়! অতঃপর মহিলা খাবারগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল: আফসোস তোমার জন্য! যখন মহান রাব্বুল আলামীন তার সিংহাসনে বসে বিচারকার্য সমাধান করবেন তখন জালেম থেকে মজলুমদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করে নিবেন!! রসুল সা. এ ঘটনা শুনে ঐ মহিলার কথার সমর্থনে বললেন: "আল্লাহ ঐ জাতির প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতির দুর্বল জনগোষ্ঠী জুলুম অত্যাচারের শিকার হওয়ার ব্যতীত সবল থেকে তাদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে"।[৯]

আবদুল্লাহ ইবনে আবি সুফিয়ান রা. বর্ণনা করেন, একদা এক ইহুদি ব্যক্তি রসুল সা.-এর কাছে এসে কঠোর ভাষায় তার প্রাপ্য খেজুর ফেরত চাওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম তাকে শাসাতে চাইলে রসুল সা. তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন: "আল্লাহ ঐ জাতির প্রতি রহমত করেন না যতক্ষণ না তাদের মধ্যস্থ দুর্বল জনগোষ্ঠী কোনো জুলুম অত্যাচারের শিকার হওয়া ছাড়াই তাদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়"। অতঃপর তিনি খাওলা বিনতে হাকীম থেকে খেজুর নিয়ে তাকে তার পাওনা

---

[৮] তাবরানী কাবীর এবং আওসাতে বর্ণনা করেছেন, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। মাজমায়ুয যাওয়ায়েদ (৪/১৯৭)।

[৯] বাজ্জার ও তাবরানী তার আওসাতে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসের সনদে "আতা ইবনে সায়িব" রয়েছে, তিনি নির্ভরযোগ্য কিন্তু স্মৃতিশক্তির স্বল্পতার আক্রান্ত, অন্য সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। মাজামায়ুয যাওয়ায়েদ : (৫/২০৮)।

পরিশোধ করলেন এবং বললেনঃ "আল্লাহর ওফাদার বান্দাহরা এমনই করে থাকেন।[১০]

এভাবেই ইসলাম সবলের মোকাবেলায় সব সময়ই দুর্বলের পক্ষে অবস্থান নিয়ে থাকে।

দরিদ্র অভাবী জনগোষ্ঠীর সাথে অবস্থান করে যতক্ষণ না সম্পদশালী থেকে তার অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়, যদিও এ ক্ষেত্রে ধনীদের সাথে সংঘর্ষে নামতে বাধ্য হয়, যা ইতঃপূর্বে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

মালিক পক্ষ থেকে তার শ্রমিকের পারিশ্রমিক পরিশোধ করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছেঃ "ঘাম শুকানোর পূর্বেই শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক আদায় করে দাও"।[১১] যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিক থেকে কাজ আদায় করার পরে তার পারিশ্রমিক দেয় না ইসলাম তাকে ঐ তিনজনের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেছে যাদের বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন মামলা দায়ের করবেন।[১২]

এমনিভাবে ইসলাম সমাজের অসহায় অবহেলিত ঐ ব্যক্তির পাশে দাঁড়ায় যার কোনো সহায়-সম্পদ নেই, নেই কোন বংশ পরিচিতি ও গোত্রীয় মান-মর্যাদা, যার কোন অনুরোধ গৃহীত হয় না, বিয়ের প্রস্তাব দিলে কেউ সাড়া দেয় না এবং কারো দ্বারে যে ঠাঁই পায় না। সমাজের অন্যান্য বিত্তশালী গণ্যমান্য, বংশীয় গৌরবে গৌরবান্বিত ও খ্যাতিমান ব্যক্তির ওপর এ অসহায় অবহেলিত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে গিয়ে রসুল সা. বলেনঃ "দুনিয়ার সব সম্পদের তুলনায় এরূপ ব্যক্তি উত্তম"।[১৩] আরো স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে রসুল সা. বলেনঃ "অনেক আলুথালু, ধুলোমলিন ও অবহেলিত ব্যক্তি রয়েছে যারা কোনো বিষয়ে শপথ করলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন"।[১৪] ইতঃপূর্বে আরো কতিপয় হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : "আল্লাহ তায়ালা ঐ জাতির প্রতি রহমত করেন না

---

[১০] তাবরানী তার কবীর গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সনদে এ হাদিস বর্ণনা করেন। মাজমায়ুয যাওয়ায়েদ (৪/১৪০)।

[১১] ইবনে মাজাত হযরত ওমর থেকে, আবদুর রাজ্জাক আবুহুরাইরা থেকে এবং তাবরানী তার আওসাত গ্রন্থে জাবের থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন।

[১২] বুখারি। হাদিসে কুদসী।

[১৩] বুখারি, সাহল ইবনে সা'দ বর্ণিত হাদিস।

[১৪] মুসলিম।

যতক্ষণ না তাদের দুর্বল জনগোষ্ঠী কোন প্রকার জুলুম নির্যাতনের শিকার হওয়া ছাড়াই সবলের কাছ থেকে তাদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়"।

এভাবে ইসলাম মহিলাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে যতক্ষণ না তারা পুরুষ থেকে তাদের অধিকার আদায় করতে এবং যাবতীয় জুলুম অত্যাচার থেকে নিজেদের হেফাজত করতে সক্ষম হয়, যদিও সে পুরুষ তার পিতা বা স্বামী ও জীবনসঙ্গী হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আল কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা মোটেই হালাল নয়। আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছো তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাত করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে তারা যদি কোনো সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয় (তাহলে অবশ্যি তোমারা তাদেরকে শাসন করার অধিকারী হবে), তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে একটা জিনিস তোমরা পছন্দ করো না, কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে অন্যান্য অনেক কল্যাণ রেখেছেন। আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী আনার সংকল্প করেই থাকো, তাহলে তোমরা তাকে অনেক সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিয়ো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট জুলুম করে তা ফিরিয়ে নেবে? আর তোমরা তা নেবেই বা কেমন করে যখন তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করেছো এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে (সুরা নিসা, ৪: ১৯-২১)।

এমনিভাবে ইসলাম ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে শিশুসন্তানের পক্ষ অবলম্বন করে থাকে যতক্ষণ না তারা তাদের পিতা-মাতাদের থেকে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সহযোগিতাসহ যাবতীয় স্নেহ-ভালোবাসা আদায় করতে সক্ষম হয়। সাথে সাথে ইসলাম জাহেলী যুগের অধিবাসীদেরকে কঠিন ভাষায় তিরষ্কার ও নিন্দা করেছে যারা সম্ভাব্য দারিদ্রের আশংকায় তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়নি, বিশেষ করে কন্যা সন্তানদের যাদের ভাগ্যে তাদের একান্ত আপনজন তথা পিতাদের থেকে তাদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া ছাড়া আর কোনো কিছু পাওনা ছিল না। "সেদিন (কেয়ামতের দিন) নবজাতকদের ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছিল? (সুরা তাকওয়ীর, : ৮, ৯)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন: "যে পিতা তার সন্তানের দুধ পানের সময়-কাল পূর্ণ করতে চায় সে ক্ষেত্রে মায়েরা পুরো দু'বছর নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাবে। এ অবস্থায় সন্তানদের পিতাকে প্রচলিত পদ্ধতিতে মায়েদের খোরাক পোশাক দিতে হবে (সুরা বাকারা, ২: ২৩৩)।

এমনিভাবে ইসলাম পিতা মাতাদের পার্শেও অবস্থান করেছে, বিশেষ করে যখন বার্ধক্য উপনীত হয় এবং যখন বেশি করে তারা শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে দেখাশোনা ও আদর-যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। জীবনের এ সময়ে তাদের স্পর্শকাতর আবেদন-অনুভুতির যথাযথ মূল্যায়ন করতে ইসলাম শিক্ষা দিয়ে থাকে যাতে এমন কোন কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে না পড়ে যার ফলে তাদের আবেগ - অনুভূতিতে আঘাত লাগে।

তাদের মানসিক অবস্থা ও আবেগ-অনুভুতির প্রতি গুরুত্ব দেয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তোমার রব ফয়সালা করে দিয়েছেন- তোমরা অন্য কারোর ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো; পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো-যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনো একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে 'উহ্' পর্যন্তও বলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না এবং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোয়া করতে থাকো এই বলে: হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া ও মায়া-মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন" (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ২৩, ২৪)।

তাদের প্রতি আর্থিক সহযোগিতার নির্দেশ দিতে গিয়ে রসুল সা. বলেন: "তুমি তোমার সহায়-সম্পত্তি সবই তোমার পিতার মালিকানাধীন"।[১৫]

এমনিভাবে ইসলাম সাধারণ জনগণের সকল ভোক্তাশ্রেণির লাইনে দাঁড়িয়ে মজুতদার ব্যবসায়ী এবং যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজার নিয়ে খেলা করে থাকে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চারভাবে অবস্থান নিয়ে থাকে। রসুল সা. বলেন: "অপরাধী ও গুনাহগার ব্যতীত কেউ মজুতদারী করে না।[১৬] আর উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ফেরাউন হামানের মতো জালেম অত্যাচারী শাসকদেরকে কুরআন একই ভাষায় অপরাধী ও গুনাহগার ঘোষণা করেছে যে ভাষায় রসুল সা. মজুতদার ব্যক্তিকে অপরাধী ও গুনাহগার বলে আখ্যায়িত করেছেন। "নিশ্চয় ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যসামন্ত সবাই গুনাহাগার ও অপরাধী" (সুরা কাসাস, ২৮: ৮)।

ইসলামি আইনবিদগণ মতামত দিয়েছেন যে সাধারণ জনগণের ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে তাদেরকে সার্বিক ক্ষতি থেকে বাঁচানোর তাগিদে প্রয়োজনে পণ্য-দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর আবশ্যক হয়ে পড়ে।

---

[১৫] ইমাম আহমদ বর্ণিত হাদিস। আল্লামা শাকের এ হাদিসকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

[১৬] মুসলিম বর্ণিত হাদিস।

এমনিভাবে ইসলামি সমাজে বসবাসরত অমুসলিমদের পাশেও ইসলাম অবস্থান নিয়ে থাকে যাতে করে তারা মুসলিমদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্ত অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করে নিতে পারে। ধর্মের ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে তাদের ওপর জুলুম অত্যাচার চালানো এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই; বরং ইসলামি আইনবিদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে মুসলিম সমাজে বসবাসরত ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিমদের ওপর জুলুম অত্যাচার মুসলিমের ওপর জুলুম অত্যাচার থেকেও মারাত্মক ও কঠিন অপরাধ।[১৭]

এমনিভাবে যারা নিজেদের হেফাজত করতে এবং নিজেদের অধিকারের দাবি তুলতে সক্ষম নয় তারাও ইসলামের সুন্দর বিধান ও এর সুদৃষ্টির বাইরে নয়। তাইতো ইসলাম পথে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকেও অবহেলা করেনি; বরং তার জন্যও ইসলামি আইনে পৃথক একটি অধ্যায় রয়েছে যেখানে তাদের সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি যদি তা অবৈধ সন্তানও হয় তাও ইসলাম তাকে অবহেলা করেনি; একের অপরাধে অপরকে শাস্তি প্রদান করা ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

বরং মাতৃগর্ভস্থ ভ্রুণও ইসলামের দায়-দায়িত্ব বহির্ভূত নয়; যদিও তা অবৈধ সম্পর্কের ফসল হয়। তাইতো ইসলামি আইনে গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করে নবজাতকের দুধ ছড়ানোর সময় পর্যন্ত হত্যাকারী অথবা ব্যভিচারী মহিলার শাস্তি স্থগিত করে রাখা হয়।

এছাড়া অবলা ইসলামের সুবিবেচনার বাইরে নয়। জন্তু-জানোয়ার ও পশু-পাখিদের সাথে সদাচারণ করতে, কাজে খাটানোর ক্ষেত্র তাদের প্রতি সদয় থাকতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। এগুলো যদি কারো মালিকানাধীন থাকে তাহলে তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার-দাবার সরবরাহ করতে, অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে এবং সাধ্যাতীত বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে না দিতে ইসলাম আদেশ করেছে। এ সব অবলা জন্তুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা জাহান্নামে যাওয়ার এবং এদের প্রতি সদয় থাকা আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার কারণ বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছেঃ "এক মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রাখার কারণে জাহান্নামী হয়েছে, সে তাকে পর্যাপ্ত খাবার দিত না এবং পোকামাকড় ধরে খাওয়ার জন্য ছেড়েও দিত না...।[১৮] অপর এক ব্যক্তি অনেক কষ্ট স্বীকার করে একটি কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সাহাবিগণ বিস্ময়বোধ

---

[১৭] দেখুন : আমাদের রচিত বই "মুসলিম সমাজে অমুসলিমদের অবস্থা"।

[১৮] মুত্তাফাকুন আলাইহি, ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিস (আললু'লু' ওয়াল মারজান : ১৬৮৩)।

করলেন যে এ সব জন্তু-জানোয়ারের প্রতি যত্ন নেয়া ও এদের প্রতি সদয় হওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান রয়েছে! রসুল সা. তাদের বললেন: প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর সাথে সদাচারণের বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান রয়েছে।[১৯]

ইসলামি রাষ্ট্রই মূলত উপর্যুক্ত সকল ধরনের দুর্বল অসহায়দের হেফাজত ও দেখাশোনার ব্যাপারে প্রধানত: দায়িত্বশীল। তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের যাবতীয় অধিকার আদায়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা এবং সমাজের সবল ও বিত্তশালী জনগোষ্ঠীর সকল প্রকারের জুলুম থেকে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা ইসলামি রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। মহানবি সা. বলেন: "তোমাদের সবাই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকই নিজ নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হবে, সরকার প্রধান তার জনগণের ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হবে ..."[২০] তিনি (রসুল সা.) আরো বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার অধস্তনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, সে কি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছে, নাকি তাদের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে"।[২১]

রসুল সা. তাঁর জীবনে মদিনায় প্রতিষ্ঠিত তার কাঙ্খিত সেই রাষ্ট্রে এ সব অধিকার যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন। মদিনার সে রাষ্ট্রটি বিশ্ববাসীর জন্য একটি মডেল স্বরূপ, যেখানে অন্নহীন ব্যক্তি অন্ন পেত, সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তি খুঁজে পেত নিরাপদ আশ্রয়। গরিব-মিসকিন থেকে শুরু করে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, অসহায় মুসাফির, এতিম, বিধবা ও দাস-দাসীসহ সকল প্রকারের দুর্বল অসহায় ফিরে পেত তাদের যথাযথ অধিকার; রাষ্ট্রীয় দায়িত্বেই তাদের সুষ্ঠু দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করা হতো।

রসুল সা. বলেন: "আমি প্রত্যেক মুসলমানের কাছে তার নিজের তুলনায় বেশি অগ্রাধিকারী, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করবে তা তার উত্তরাধিকারীদেরই প্রাপ্য; কিন্তু যে ঋণ রেখে অথবা কোনো ধন-সম্পদ ব্যতীত সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন রেখে মারা যাবে আমার ওপরই তাদের দেখাশোনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব, আমিই তাদের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করব"।[২২]

---

[১৯] মুত্তাফাকুন আলাইহি, আবুহুরাইরা বর্ণিত হাদিস (আললু'লু' ওয়াল মারজান : ১৪৪৭)।

[২০] মুত্তাফাকুন আলাইহি, ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিস। (আললু'লু' ওয়াল মারজান : ১৯৯৯)।

[২১] নাসায়ী ও ইবনে হিব্বান হযরত আনাছ রা. থেকে বর্ণনা করেন। আলবানী একে হাসান বলেছেন। সহিহ জামে সগীর : (১৭৭৪)।

[২২] মুসলিম।

মদিনার অভিশপ্ত ইহুদি গোত্র বনু নাজীরকে নির্বাসন দেওয়ার পর রসুল সা.-এর হাতে যখন যুদ্ধলব্ধ অনেক ধন-সম্পদ এলো, তখন তিনি প্রথম সুযোগেই অভাবের তাড়না কিছুটা লাঘব করার লক্ষ্যে এবং ধনী-গরিবের তারতম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে দরিদ্রদেরকে গণীমতের একটি অংশ দান করেন। এখানেই সামাজিক সুবিচার সংক্রান্ত কুরআনের মূলনীতি হচ্ছে: "এ সব জনপদের দখলমুক্ত করে যে জিনিসই আল্লাহ তাঁর রসুলকে সা. ফিরিয়ে দেন তা আল্লাহ, তাঁর রসুল, আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে তা তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত না হতে থাকে" (সুরা হাশর, ৫৯: ৭)।

রসুল সা. তাঁর রাষ্ট্রে এমন কোনো আইন করেননি যার ফলে ধনীরা গরিবের তুলনায় বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে, যেমন ধনী হওয়ার সুবাধে তাদের ওপর দায়িত্বের কোনো বোঝা হালকা করে দেননি, অথবা সামাজিক মর্যাদা বা বংশীয় গৌরবের অজুহাতে তাদের ওপর আরোপিত কোনো শাস্তি লাঘব করে দেননি।

সম্ভ্রান্ত মাখজুমী গোত্রের এক মহিলা চুরি করার অপরাধে ধৃত হওয়ার পর কুরাইশদের মধ্যস্থতায় রসুলের সা.-এর স্নেহধন্য ওসামা ইবনে যায়েদ রা. যখন তাঁর কাছে সুপারিশের বার্তা নিয়ে আসে, তখন রসুল সা. খুব রাগ করেছিলেন এবং তার সে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ বক্তব্য দিয়েছিলেন যেখানে তিনি বংশীয় মর্যাদার কারণে কাউকে কোনো প্রকারের দায়-দায়িত্ব কিংবা কোনো প্রকারের শাস্তি থেকে রেহাই দিতে কঠোরভাবে অস্বীকার করেন এবং এ বলেই তিনি তাঁর বক্তব্যের ইতি টেনেছিলেন: "আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ তনয়া ফাতিমাও যদি চুরির অপরাধে ধৃত হয় তাহলে তার হাত কর্তন করতেও আমি দ্বিধাবোধ করবো না।[২৩]

এখানে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা যায়। ইসলাম সহায়-সম্বলহীন চোরদের শাস্তি মওকুফ করে দেওয়ার জন্য নানাবিধ যুক্তি তালাশ করে, যে হয়ত বা তার অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে চুরি করতে এসেছে। এ অজুহাতে ইসলামি আইনে অভাবী চোরদের শাস্তি লাঘব করে দেওয়া হয়। যেমননিভাবে হযরত রা. হাদিব ইবনে বালতা'য়ার দাসদের হাত কাটা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন যখন তারা চুরির অপরাধে ধৃত হয়েছিল; তিনি তাদের মনিব তথা হাতিবকে সাবধান করে দিয়েছেন যে পুনরায় যদি চুরি করে তাহলে তাদের পরিবর্তে তার হাত কাটা হবে!

---

[২৩] মুত্তাফাকুন আলাইহি, হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদিস।

কুরআনে যায় যে দাসীদের ব্যভিচারের শাস্তি তাদের দুর্বলতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনায় স্বাধীন রমণীদের ব্যভিচারের শাস্তির অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: তারা যদি যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের জন্য স্বাধীন নারীর অর্ধেক শাস্তি নির্ধারিত" (সুরা নিসা, ৪: ২৫)।

খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত আবু বকর রা. তাঁর প্রথম ভাষণে বলেন: সাবধান! তোমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী আমার কাছে সে দুর্বল যতক্ষণ না আমি তার থেকে অপরের অধিকার আদায় করে নিতে পারি, এবং তোমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে সবল যতক্ষণ না আমি তাকে তার প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারি"। তিনিই অসহায় দুর্বলের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন।

হযরত ওমর রা. ছিলেন দুর্বলের ব্যাপারে অত্যন্ত কোমল এবং সবল ও ক্ষমতাবানদের সাথে অত্যন্ত কঠোর; এমনকি উবাই ইবনে কা'বের মান-মর্যাদা ও ক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়ে যারা তার পেছনে চলাফেরা করতো তিনি তাদেরকে ধমক দিলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "এটা অনুসারীদের জন্য গ্লানিকর এবং অনুসরণীয় ব্যক্তির জন্য পরীক্ষা"। দুর্বল, অসহায়, বিধবা ও অনাথদের সাথে হযরত ওমরের রা. সুন্দর ভূমিকা সম্বলিত ঘটনা ইতিহাসের পাতায় ভরপুর হয়ে আছে।

হযরত ওমর রা. একদা এক ইহুদি বৃদ্ধকে মানুষের কাছে ভিক্ষারত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি সাথে সাথে সরকারী ফান্ড তথা বায়তুল মাল থেকে এ বৃদ্ধ এবং এ জাতীয় লোকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমীর-ওমরাহ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ওপর ওমরের রা. কঠোরতা খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। মিসরে নিযুক্ত গভর্ণর আমর ইবনুল আ'সের পুত্র কিবতী প্রহৃত হওয়ার অভিযোগ ওমরের দরবারের আসার পর তিনি কিবতী ব্যক্তিকে গভর্নরের পুত্র থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে যে প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় এখনো সগৌরবে বিদ্যমান। কিবতী ব্যক্তির পক্ষে অবস্থান নিয়ে ওমর রা. তাঁর গভর্নরকে বলেছিলেন : "আর কতদিন পর্যন্ত তোমরা মানুষকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রাখতে চাও, অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন অবস্থায়ই জন্ম দিয়েছেন!"

এমনিভাবে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদসহ অন্যান্য দিগ্বিজয়ী সিপাহসালারদের ব্যাপারে হযরত ওমরের রা. অবস্থান ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। তিনি তাদের মধ্যে কোনো প্রকারের বিলাসিতা, অপচয়সহ ইতিহাসের

আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত জালেম শাসকদের কোনো প্রকারের সাদৃশ্যতা খুঁজে পেলে সাথে সাথে তা সংশোধনের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি তাদের ধন-সম্পদের খোঁজ নিতেন এবং তার অর্ধেকাংশ বায়তুল মালের জন্য নিতেন এ আইনের এ ধারায় যে- কোথা থেকে তুমি এ ধন সম্পদ পেয়েছো? এমনিভাবে ওমর রা. আল্লাহর এ অবলা সৃষ্টি জন্তু-জানোয়ারদের ব্যাপারেও সজাগ ছিলেন। তাদের প্রতি সদয় থাকতেন এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার জন্য তিনি জনগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

তাবাক্বাতে ইবনে সা'দে বর্ণিত হয়েছে: একদা ওমর রা. এক কুলিকে প্রহার করার পর তাকে বললেন: সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা কেন তোমার বাহনের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে?!

একদা ওমর রা. ইট বহন করা অবস্থায় একটি গাধাকে দেখে তার পিঠ থেকে দু'টি ইট নামিয়ে দিলেন। গাধার মালিক এসে তাকে বলল: আমার গাধার সাথে তোমার কি সম্পর্ক হে ওমর? তার ওপর কি তোমার কোনো কর্তৃত্ব রয়েছে? ওমর রা. বললেন: তাহলে কেন আমি খলিফার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি?![২৪] অর্থাৎ জনগণের প্রতি যেমন সরকার প্রধানের দায়িত্ব রয়েছে তেমনিভাবে জন্তু-জানোয়ার এবং পশু-পাখিও তার দায়িত্ব বহির্ভূত নয়!

স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের রাষ্ট্র

ইসলামি রাষ্ট্র শুধু কাগজে-কলমে বা প্রচার-প্রচারণায় নয়; বরং কথায় ও কাজে সত্যিকারের স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের জন্যই রাষ্ট্র।

ইসলামি আইনের বিবেচনায় মানুষের বেঁচে থাকা থেকে শুরু করে ধন-সম্পদ উপার্জনের অধিকার ও রুটি-রোজগারের অধিকারসহ তার ধর্ম, জীবন, বংশ, মান-সম্ভ্রম ও সহায়-সম্পত্তির নিরাপত্তার অধিকার ইত্যাদি মানুষের প্রাপ্য মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর নিরাপত্তা বিধান ও সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত এ জীবন ব্যবস্থার অভ্যুদয়। অন্যায় হস্তক্ষেপের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ইসলাম শরিয়াহ দন্ডবিধি ও কিসাসের ন্যায় কঠিন বিধান ফরজ করেছে।

---

[২৪] দেখুন : আমাদের রচনা "ইসলামি শরীয়তের বৈশিষ্ট্যাবলী" থেকে "নীতি-নৈতিকতা" শীর্ষক পরিচ্ছেদ।

ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রে ও সমাজে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যার ছত্রছায়ায় মানুষ তার জীবনের মৌলিক দু'টি উদ্দেশ্য তথা রুটি রোজগারের লভ্যতা ও জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে পারে, যার ফলে মানুষ একাগ্রচিত্তে তার রবের ইবাদতে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়। "যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্ন দান করেছেন এবং আতংকিত অবস্থায় নিরাপত্তা দান করেছেন" (সুরা কুরাইশ ১০৬: ৪)।

বর্তমানকালে সর্বত্র স্বাধীনতার যে জয়গান গাওয়া হয় এবং পাশ্চাত্যে যা ফরাসি বিপ্লব ও এ জাতীয় আধুনিক বিপ্লবোত্তর অর্জন বলে মনে করা হয়, ইসলাম প্রকৃতিগতভাবেই এক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই; বরং স্বাধীনতার জয়গান গাওয়া ও এর দিকে আহবান করার ক্ষেত্রে ইসলাম এগিয়ে রয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রই স্বাধীনতার চেতনাকে উচ্চকিত করতে এবং থেকে একে বাস্তবে রূপদানে সক্ষম হয়েছিল।

ধর্মীয় স্বাধীনতাকে শাইখ গাজালী রহ. 'ইসলামের আবিষ্কার' বলে উল্লেখ করেছেন, যা অন্য কোনো ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না। ইসলাম অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়, জোরপূর্বক স্বীয় ধর্মে প্রবেশ করানোর যে কোন উপায়কে প্রত্যাখ্যান করে এবং স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে ধর্মগ্রহণকে সত্যিকার ধর্মবিশ্বাস বলে বিবেচনা করে; ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে এমনটি পাওয়া কঠিন। ফেরাউনের ঈমান গ্রহণের স্বাধীন সময় ও সুযোগ শেষ হয়ে গিয়েছিল, যদিও সে পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার মুহূর্তে ঈমান এনেছিল। এমনিভাবে আল্লাহর গজব দেখে এবং তা প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে যে ঈমান গ্রহণ করা হয় তা হচ্ছে মূল্যহীন। "আমার গজব দেখে যারা ঈমান গ্রহণ করে থাকে তা তাদের জন্য কোনো উপকার বয়ে আনবে না" (সুরা গাফির, ৮৫)।

রসুল স.-এর মক্কা ও মদিনার উভয় জীবনে ঈমান আনার জন্য মানুষের ওপর বলপ্রয়োগ করতে কুরআন কারীমে নিষেধ করা হয়েছে। মক্কার জীবনে কুরআনের বাণী হচ্ছে: "আপনি কি ঈমান আনার জন্য মানুষের ওপর বলপ্রয়োগ করবেন?" অর্থাৎ আপনি এরূপ করতে পারেন না (সুরা ইউনুস, ১০: ৯৯)। মদিনার জীবনে কুরআনের বাণী হচ্ছে : "ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই, ভ্রান্ত পথ ও মত থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে" (সুরা বাকারা, ২: ২৫৬)।

ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নি উপাসকসহ সকল ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাদের স্ব স্ব ধর্মানুযায়ী আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী ও যাবতীয় লেনদেনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং তাদের ধর্মানুযায়ী খাবার-পানীয় যেমন- শুকরের মাংস

ইত্যাদি গ্রহণেরও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, যদিও তা ইসলামে হারাম ও অবৈধ। এটিই হচ্ছে ইসলামের উদারতা ও সহনশীলতা, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে এরূপ কোনো নজীর নেই।

বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইসলামে একটি সুরক্ষিত বিষয়। ইসলামে একে শুধু স্বাধীনতার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং ইসলামের দৃষ্টিতে তা আবশ্যকীয় দায়িত্বও বটে! কোনো ব্যক্তির দৃষ্টিতে যখন কোন অন্যায় বা অপছন্দনীয় বিষয় ধরা পড়ে তখন সাধ্যমতো তা প্রতিরোধের চেষ্টা করা শুধু স্বাধীনতা নয়; বরং এটি তার আবশ্যকীয় দায়িত্ব। এই অবস্থায় চুপ থাকা বা প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে আসার ব্যাপারে সে স্বাধীন নয়; বরং তাকে অবশ্যই তা প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সত্য কথনে মৌন থাকা মূলত মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ারই নামান্তর। সত্যের ব্যাপারে নীরব ব্যক্তিকে বাকশক্তিহীন শয়তান বলা হয়েছে! এমনিভাবে যদি কেউ কোনো ভালো ও কল্যাণকর কাজকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখে তখন তা করার জন্য আদেশ-নির্দেশ দিতে এগিয়ে আসা তার ওপর আবশ্যক হয়ে যায়। এটি বাস্তবায়নে তার এগিয়ে আসা বা হাত গুটিয়ে থাকার ব্যাপারে সে স্বাধীন নয়।

এটি ইসলামের অবশ্য পালনীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত যা ইসলামের পরিভাষায় "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ" নামে পরিচিত; এর মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন। "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি তোমাদের বিশ্বাসকে আরো মজবুত করবে"। (সুরা আলে ইমরান, ৩: ১১০)

হাদিসের ভাষায় শুভাকাঙ্খী হয়ে অপরকে নসিহত করা ও অপরের কল্যাণ কামনা করা ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে পরস্পরকে সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেওয়া দুনিয়া আখিরাতের ক্ষতি–থেকে বাঁচার জন্য অত্যাবশ্যক।

চিন্তা-ভাবনা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে একটি সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপরন্তু চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যাবশ্যক। জ্ঞান-অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ।

যেহেতু জ্ঞান অর্জন ও চিন্তা-গবেষণা ইসলামে অবশ্য করণীয়, তাই এটি এখন শুধুমাত্র অধিকার বা স্বাধীনতার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয় যা সংরক্ষণ করা আবশ্যক; বরং তা অবশ্য পালনীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও বটে! এ গুরুদায়িত্ব পালনে

সহযোগিতা করা এবং এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকারীকে নিন্দা করা অথবা প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য।

একমাত্র ইসলামি ও মুসলিম রাষ্ট্রই যুগ যুগ ধরে বিশেষ করে সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের সময় থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-গবেষণা ইত্যাদির সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে।

আমরা দেখি তাফসির, হাদিস, দর্শন, তাসাউফ ইত্যাদি বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতাদর্শের প্রতিষ্ঠান, যেগুলো পারস্পরিক কোনো মতানৈক্য, ঝগড়া-বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া পরস্পরে আলোচনা, সমালোচনা, যুক্তি ও এর প্রতি উত্তর প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্দরভাবে সহাবস্থান করে চলছে।

চারিত্রিক ও আদর্শিক রাষ্ট্র

ইসলামি রাষ্ট্র হচ্ছে নৈতিক ও আদর্শিক রাষ্ট্র যা সঠিক নিয়ম-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে এটি আপোষহীন। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, শত্রু ও মিত্র এবং যুদ্ধাবস্থা ও স্বাভাবিক অবস্থা ইত্যাদি যে কোনো পরিস্থিতিতে এই রাষ্ট্র তার মূলনীতি হারিয়ে ফেলে না। ইসলামি রাষ্ট্র কখনো দু'মুখো নীতি পোষণ করে না এবং দু'ধরনের ভাষায় কথা বলে না। ইসলামি রাষ্ট্রে অন্যায়ের পথ ধরে ন্যায় খুঁজে বেড়ানো এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করে কাঙ্ক্ষিত স্বার্থ হাসিল করা গ্রহণযোগ্য নয়।

এও রাষ্ট্র ন্যায় ও মহৎ লক্ষ্য অর্জনের বিশ্বাসী, পাশাপাশি সৎ ও সঠিক উপায় অবলম্বনেও আপোষহীন।

ইসলামের মহান নবি সা. তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা মহান ও পবিত্র। তিনি অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করেন না"।[২৫] এখানে অপবিত্র বলতে বুঝানো হয়েছে: সুদ-ঘুষ ইত্যাদি হারাম ও অবৈধ উপায়ে আহরিত সম্পদ যা ভালো ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হয়।

ইসলামি রাষ্ট্র হচ্ছে সৎ ও উত্তম চরিত্রের সাক্ষাত প্রতিবিম্ব যা ষোলকলায় পূর্ণ করার মিশন নিয়ে মহানবি সা. প্রেরিত হয়েছিলেন। এটি পুরো মানবতার জন্য উপহার স্বরূপ। আল্লাহর এ জমিনে তাঁর আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে যার একমাত্র মিশন যা সাদা-কালো, আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার জন্য সমান।

---

[২৫] আবু হুরাইরা রা. থেকে মুসলিম বর্ণিত হাদিস, ইমাম নববীর প্রসিদ্ধ চল্লিশ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনে ঘোষণা দিচ্ছে: "হে ইমানদারগণ! ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর সাক্ষী হয়ে যাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্তা অথবা তোমাদের বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে হয়" (সুরা নিসা, ৪: ১৩৫)।

"হে ইমানদারগণ! সত্যের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও। কোনো দল বা জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন এমন উত্তেজিত না করে দেয় যার ফলে তোমরা ইনসাফ থেকে সরে যাও। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করো। এটি আল্লাহভীতির সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে ভয় করো, তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন" (সুরা মায়েদা, ৫: ৮)।

ওহি নাজিলের যুগে দুর্বল মুসলমানদের একটি গোষ্ঠি নিরাপরাধ এক ইহুদিকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করেছিল। তখন এ ইহুদিকে অভিযুক্ত করে এবং যারা নিজেদের ব্যক্তিসত্তা ও যাবতীয় মূলনীতির সাথে খেয়ানত করে নিরাপরাধ মানুষদেরকে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত করে থাকে তাদের বিশ্বাস করার ব্যাপারে নবিকে সা. সাবধান করে দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরা নিসায় কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"হে নবি! আমি সত্য সহকারে এই কিতাব তোমার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সেই অনুযায়ী তুমি লোকদের মধ্যে ফয়সালা করতে পারো। তুমি খেয়ানতকারী ও বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমার আবেদন করো। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়। যারা নিজেদের সাথে খেয়ানত ও প্রতারণা করে তুমি তাদের সমর্থন করো না। আল্লাহ খেয়ানতকারী পাপীকে পছন্দ করেন না" (সুরা নিসা, ৪: ১০৫-১০৭)।

ইসলামি রাষ্ট্র অভিন্ন চরিত্র এবং এক মূলনীতিতে বিশ্বাসী। সব মানুষের জন্যই এই চরিত্র। ক্ষেত্র বিশেষ এবং স্থান কাল পাত্র ভেদে তা এক মূলনীতিতে বিশ্বাসী। সব মানুষের জন্যই এই রাষ্ট্র। ক্ষেত্র বিশেষ এবং স্থান কাল পাত্র ভেদে এটি ভিন্নধর্মী কোনো রূপ ধারণ করে না।

শত্রু-মিত্র সাথে আমানতদারি ও বিশ্বস্ততাই হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যদিও তারা তার খেয়ানত করে বসে। এমনিভাবে সর্বস্তরে সততাই হচ্ছে এর অন্যতম কর্মনীতি, যদিও সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। স্থান কাল পাত্র ভেদে এখানে মূল্যবোধের কোনো পরিবর্তন হয় না, যেমনিভাবে পাপাচার বা অপকর্মেরও কোন পরিবর্তন হয় না।

ইহুদি জাতি যেখানে তাদের স্বজাতির সাথে সুদের লেনদেনকে হারাম ঘোষণা করেছে; কিন্তু ইহুদি নয় এমন সবার সাথে তা বৈধ রেখেছে। ইসলাম এ ধরনের দ্বিমুখী নীতিতে বিশ্বাসী নয়। অমুসলিমের জন্য হারামকৃত কোনো কিছু মুসলমানদের জন্য হালাল, এমনটি ইসলামের মূলনীতির সাথে রীতিমত সাংঘর্ষিক; বরং ইসলামে যা হারাম করা হয়েছে তা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্যই প্রযোজ্য।

চুরি-ডাকাতি, যিনা-ব্যভিচার ও জুলুম-অত্যাচারসহ যাবতীয় অপকর্ম মুসলিম অমুসলিম সবার জন্যই হারাম করা হয়েছে। শুধু তাই নয়; অবলা জন্তু-জানোয়ারের ওপর তা প্রয়োগ করাও হারাম করা হয়েছে। ইহুদি জাতির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে ইসলাম কখনো বলে না যে "নিরক্ষরদের (অ-ইহুদি) ব্যাপারে আমাদের কোন দায়দায়িত্ব নেই" (সুরা আলে ইমরান, ৩: ৭৫)। নিরক্ষর বলতে ইহুদি নয় এমন সব জাতিই এখানে উদ্দেশ্য। তাই ইহুদি নয় এমন সব জাতির মান-সম্ভ্রম, সহায়-সম্পত্তি ইত্যাদি ইহুদিদের জন্য বৈধ ও হালাল! এসব কিছু অন্যায়ভাবে দখল ও ভোগ করার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ দায়মুক্ত এবং এ ক্ষেত্রে তাদের সাত খুন মাফ!

এমনকি কতিপয় ইসলামি আইনবিদের বক্তব্য হচ্ছে, অমুসলিমের ওপর জুলুম-অত্যাচার করা মুসলিমের ওপর জুলুম করার চাইতেও অধিক অপরাধ ও গুনাহ। যেহেতু মুসলিম শাসিত সমাজে অমুসলিমরা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতার অধিকারী ও দুর্বল হয়ে থাকে; আর সবলের ওপর জুলুম করার চেয়ে দুর্বলের ওপর জুলুম করা অত্যাধিক গুনাহ ও অপরাধের কাজ। তাইতো এতিম, অনাথ ও অসহায় লোকজনের ওপর জুলুম করাকে সর্বনিকৃষ্ট অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়।

রসুল সা. হুদাইবিয়্যায় কাফেরদের সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সম্মিলিত ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত শর্তাদির একটি শর্ত ছিল যে, কুরাইশদের কেউ মুহাম্মদের সা. সাথে মিলিত হলে তাকে তাদের কাছে ফেরত দিতে হবে; কিন্তু মুহাম্মদের সা. এর পক্ষে কেউ কুরাইশদের সাথে মিলিত হলে তাকে ফেরত দিতে তারা বাধ্য থাকবে না!

বাহ্যিকভাবে অপমান ও লজ্জাকর এ সন্ধি লেখার কালি পুরোপুরি শুকাতে না শুকাতেই কুরাইশদের কতিপয় যুবক মুসলমান হয়ে মহানবির সা. কাছে এলে চুক্তি মোতাবেক নবিজী তাদেরকে গ্রহণ না করে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে মানবতার ইতিহাসে চুক্তির প্রতি সততা ও একনিষ্ঠতার এক অপূর্ব নজির স্থাপন করেন।

যেখানে কতিপয় রাষ্ট্রকে দেখা যায় স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মানবিক মূল্যবোধসহ যাবতীয় চুক্তির প্রতি একনিষ্ঠ থাকে, কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তারা সেগুলো পেছনে ঠেলে দিয়ে থাকে। ইসলামি রাষ্ট্র এ নীতির সাথে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করে সর্বাবস্থায় মানবিক মূল্যবোধসহ যাবতীয় চুক্তি প্রতিপালনে একনিষ্ঠ থাকে। ইসলামি রাষ্ট্রের সংবিধান আল কুরআনে স্বাভাবিক অবস্থার মত যুদ্ধাবস্থায়ও সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। "যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে করতে আসে তোমারাও তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করো না, অবশ্যই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না" (সুরা বাকারা, ২ঃ ১৯০)। এমনিভাবে শত্রুপক্ষের সাথে খেয়ানত করতে নিষেধ করা হয়েছে যদিও তারা বারংবার তা করতে অভ্যস্ত হয়; প্রয়োজনে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করতে বলা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছেঃ "আর যদি কখনো কোনো জাতির পক্ষ থেকে তোমরা খেয়ানতের আশংকা করো তাহলে তার চুক্তি প্রকাশ্যে তার সামনে ছুঁড়ে দাও, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারীকে পছন্দ করেন না" (সুরা আনফাল, ৮ঃ ৫৮)।

ইসলামি রাষ্ট্র কখনো যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নারী, শিশু ও বয়স্কসহ বেসামরিক জনগণের রক্তপাতকে বৈধ মনে করে না; বরং যোদ্ধা ও লড়াকু শত্রু ছাড়া অন্য কারোর বিরুদ্ধে যুদ্ধই ঘোষণা করে না।

কোনো এক যুদ্ধে মহানবি সা. যখন একজন নিহত মহিলা দেখতে পেলেন, তখন তিনি কঠিনভাবে নারী শিশু হত্যার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।[২৬]

শুধু তাই নয়; বরং যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সামরিক ও লড়াকু সৈনিকদের রক্তপাতও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইসলামি রাষ্ট্র অনুমোদন করে না। শুধুমাত্র প্রয়োজনের নিরিখেই শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়।

এমনিভাবে যুদ্ধের সময় শুত্রুপক্ষের গাছপাল কেটে ফেলা, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা ইত্যাদি বর্তমান সভ্য (?) জগতের মানুষ যেগুলোতে অভ্যস্ত, ইসলামে তা অনুমোদিত নয়। মহানবি সা. এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করেছেন, পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামগণও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

মহানবি সা. যখন কাউকে কোনো সেনাদলের সিপাহসালার হিসেবে প্রেরণ করতেন তখন তাকে একান্তে তার ও তার সঙ্গীদের তাকওয়ার ব্যাপারে নসিহত করতে বলতেনঃ "আল্লাহর নামে তাঁর পথেই যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যারা আল্লাহর সাথে কুফরি

---

[২৬] মুত্তাফাকুন আলাইহি, ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিস। আললু'লু' ওয়াল মারজান/১১৩৮।

করে তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে; তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে- কিন্তু খেয়ানত করবে না; চুক্তিভঙ্গ করবে না, নিহতের অঙ্গহানি করবে না এবং শিশু হত্যা করবে না ইত্যাদি..."[২৭]

এমনিভাবে তাঁরই অনুগামী খোলাফায়ে রাশেদীনও তাদের সেনাপতিদেরকে একই বিষয় অসিয়ত করতেন, তারা যেন যোদ্ধা ও লড়াকু সৈনিক ছাড়া অন্য কারো পিছু ধাওয়া না করে। মুসলিম সেনাবাহিনী যেন নারী, শিশু ও বয়স্ক লোকদের ব্যাপারে কোনো প্রকারের হস্তক্ষেপ না করে। এমনকি গীর্জায় উপাসনায় মশগুল পাদ্রীদেরকেও যাতে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাদের ব্যাপারেও যেন কোনো প্রকারের হস্তক্ষেপ না করা হয়।

এই হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রের কতিপয় মূলনীতি যা বাস্তবায়নে ইসলামি আন্দোলনের কর্মীগণ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এরপরও যারা ইসলামি রাষ্ট্রকে পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত মধ্য যুগের ধর্মীয় পুরোহিত শ্রেণীর রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করার দুঃসাহস দেখিয়ে থাকেন, তারা মূলত মানবতার ইতিহাস, বাস্তবতা ও ইসলামের প্রতিই মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে থাকেন। আর যে মিথ্যা অপবাদের আশ্রয় নেয় তাকে সর্বদা বিফলই হতে হয়, সাফল্যের মুকুট সে কখনো পরতে পারে না।

---

[২৭] মুসলিম, আহমদ ও আসহাবুস সুনান হযরত বারীদা রা. থেকে বর্ণনা করেন। সহিহ জামেয়ুস সাগীর / ১০৭৮।

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামি রাষ্ট্রের প্রকৃতি

ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়... ইসলামি রাষ্ট্র

ইতঃপূর্বে আমরা 'ইসলামি রাষ্ট্রের অবকাঠামো' শিরোনামে উল্লেখ করেছি যে ইসলামি রাষ্ট্র হচ্ছে ইসলামি মূলনীতিতে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসামরিক (সিভিল) রাষ্ট্র। এটি পাশ্চাত্য ইতিহাসের অতি পরিচালিত সেই ধর্মীয় পুরোহিত রাষ্ট্রতুল্য নয়, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্র ও গীর্জার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলে আসছিল, অবশেষে বিপ্লবের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং চতুর্দিক থেকে আওয়াজ উঠতে থাকে: সর্বশেষ পাদ্রির নাড়িভূড়ির সাথে তাদের সর্বশেষ রাজত্বকেও দাফন করে দাও"।

কিন্তু সেক্যুলারিজমের তল্পিবাহক আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রীতিমতো অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে, ইসলামি রাষ্ট্র হচ্ছে ঐ ধর্মীয় পুরোহিত রাষ্ট্র যেখানে খোদায়ী শাসনের নামে এক বিরাট জগদ্দল পাথর জনগণের ওপর চেপে বসবে।

সেক্যুলারিজমের জয়গান গেয়ে ড. ফারাজ ফাউদাহ "ধ্বংস পূর্ব পরিস্থিতি (قبل السقوط)" নামে একটি বই প্রকাশ করেছেন, যেখানে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা এবং ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রীতিমতো আক্রমণ চালানো হয়েছে। এর প্রতিউত্তর হিসেবে সাহিত্যিক বন্ধুবর অধ্যাপক আবদুর মজীদ সুবহ্ (আল্লাহ তার হেফাজত করুন) যা লিখেছেন তাই যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু আমি এখানে সেক্যুলারিজমের সমর্থনে লিখিত লেখকের কিছু কথা উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি:

উল্লেখিত লেখক বলেন: "যারা কালবিলম্ব না করে তাৎক্ষণিকভাবে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের প্রতি আহ্বান করে থাকেন, তারা পাশাপাশি এমন বক্তব্য আওড়িয়ে থাকেন যা বাহ্যিকভাবে খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় এবং যা দিয়ে তারা এ ক্ষেত্রে সকল আলোচক ও সমালোচকের মোকাবেলা করে থাকেন। এটি এমন বক্তব্য যা একটি যৌক্তিক প্রশ্নের আকারে পেশ করা হয়, তা হচ্ছে : ইসলামের শাস্তির বিধান বাস্তবায়নে তোমার এত ভয় কেন? এতো চোর, ডাকাত, ব্যভিচারী, মদ্যপ, ধর্মদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এ জাতীয় অপরাধীদের ওপরই প্রয়োগ করা হবে। বাহ্যিকভাবে এ ধরনের প্রশ্নকে যৌক্তিক ও সন্তোষজনক বলে মনে হবে; কিন্তু এর আড়ালে এমন একটি বাস্তবতা লুকিয়ে রয়েছে, (আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তা প্রকাশে আমাকে তওফীক দেন) তা হচ্ছে: ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন তো এমন কোনো আংশিক বিষয় নয় যা শুধু কিছু দন্ডবিধি

প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত থাকবে। মূলত এটি হচ্ছে কতিপয় চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ, যেগুলোর ব্যাখ্যা দিতে ইসলামি আইনের তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নের সহযোগীরা সর্বদা অনীহা প্রকাশ করে থাকেন, কিংবা এর সুদুরপ্রসারী বাস্তবতার বর্ণনায় তারা ভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকে। ইসলামি আইনের প্রকৃত বাস্তবায়ন মূলত একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রের উত্থানের দাবি রাখে। আর ধর্মীয় রাষ্ট্র অবশ্যই খোদায়ী শাসনের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়ে থাকে ইসলামে যার কোনো স্থান নেই, অথবা একটু আধটুকু থাকলেও তা রসুলের যুগ পর্যন্তই সীমিত। খোদায়ী শাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা ধর্মীয় পুরোহিত শ্রেণী বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ব্যতীত সম্ভব নয়, চাই তা প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক" (লেখকের কথা এখানেই সমাপ্ত)।

ড. ওয়াহিদ রা'ফাত বলেন "ইসলামি আইন কায়েমের আহ্বায়করা মূলত নতুনভাবে পুরোহিত পাদ্রিদের শাসনকে ফিরিয়ে আনতে চায়, কারণ তারাই একমাত্র আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার অধিকারী হবে। এমনিভাবে তারা গীর্জার ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে শাসন ব্যবস্থায় শুধুমাত্র খোদায়ী অধিকার ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদেরই প্রভাব থাকবে। এ ক্ষেত্রে ইরানের বিপ্লব মডেল ও প্রেরণার উৎস।[১]

ড. ফুয়াদ যাকারিয়া আল আহরাম পত্রিকায় (গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা, ১৯৮৫ খ্রি.) লিখিত তার এক প্রবন্ধে এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত তার গ্রন্থ বাস্তবতা ও কল্পনা'র ভূমিকায় তিনি বারংবার ইসলামি আইন বাস্তবায়নের আহ্বানকে ধর্মতাত্ত্বিক ও খোদায়ী শাসন বলে আখ্যায়িত করেছেন,[২] যার মাধ্যমে তিনি পাঠককে এ ধারণা দিতে চেষ্টা করেছে যে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের আহ্বান মূলত ধর্মীয় পুরোহিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারই আহ্বান।

একই ধারাবাহিকতায় ড. লুইস আওদ ১৯৮৩ সালে মিসরের 'মুসাওয়ার' নামক ম্যাগাজিনে লিখিত "সেকুলারিজমের ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামি শাসন ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করে বলেন: যদিও ইসলাম ধর্ম মানবিক দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মৌলিকভাবে পুরোহিত শাসনের এখানে কোনো অস্তিত্ব নেই; এ সত্ত্বেও ঈশ্বর-তন্ত্র তথা পুরোহিত কর্তৃক রাজ্য শাসনের চিন্তাধারা ও প্রশিক্ষণ থেকে

---

[১] "ফিক্র" নামক ম্যাগাজিন, ৮ম সংখ্যা, ডিসেম্বর - ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৭৩, ৭৪। "ধর্মীয় রাজনীতির গোঁড়ামী" শীর্ষক সেমিনার সামান্য পরিবর্তনসহ, যা আল-আহরাম ১৪/১০/১৯৮৬ সংখ্যায় ফাহমী হুয়াইদী লিখিত "খোদায়ী শাসনের মিথ্যাচার" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

[২] আমাদের রচিত "ইসলাম ও সেক্যুলারিজম" শীর্ষক গ্রন্থ এর প্রতিউত্তর দেওয়া হয়েছে।

এটি মুক্ত নয়! 'মুসাওয়ার' এর সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন : মিসরে গণতান্ত্রিক দ্বন্দ্ব সর্বদা প্রাকৃতিক অধিকারের প্রবক্তা ও খোদায়ী অধিকারের আহ্বায়কদের মধ্যেই চলে আসছে। খোদায়ী প্রবক্তাগণ মূলত জনগণকে ক্ষমতার উৎস হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে প্রাকৃতিক অধিকারের অনুশীলন থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়।

অধ্যাপক শিবলী আইসমী তার লিখিত "সেক্যুলারিজম ও ধর্মীয় রাষ্ট্র" শীর্ষক গ্রন্থে এ দু'টি বিষয়কে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। তিনি সেক্যুলারিজম অথবা ধর্মীয় রাষ্ট্র, এ তৃতীয় কোনো বিষয়কে কল্পনায় স্থান দিতে নারাজ। ধর্মীয় রাষ্ট্র বলতে মূলত পুরোহিত রাষ্ট্রকেই বুঝায়, যারা নিজেদের যাবতীয় কাজ-কর্মের সাথে পবিত্রতা, পাপমুক্ত ও নিষ্কলুষতার সম্পর্ক জুড়ে দেয়। যাদের দাবি থাকে আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদিত। তাদের কাজ-কর্মের পর্যালোচনা করা বা ভুল-সঠিক বলার অধিকার কারো নেই। যেহেতু তারা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধির দাবিদার এবং তাঁর মুখপাত্র, তাই তাদের কাজকর্মের পর্যালোচনার মাধ্যমে মূলত আল্লাহর কাজকর্মেরই পর্যালোচনা করা হয়।

ইসলামি রাষ্ট্র হচ্ছে বেসামরিক ও নাগরিক রাষ্ট্র

যারা ইসলামি আইন বাস্তবায়নের আহ্বানকে ধর্মীয় ও পুরোহিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বলে অপবাদ ও অভিযোগ করে থাকে তাদের জ্ঞাতার্থেই আমরা বলতে চাই: তোমরা তাদের ওপর সম্পূর্ণ অন্যায় ও মিথ্যা কথা চাপিয়ে দিচ্ছ এবং তাদের মুখনিঃসৃত নয় এমন একটি বিষয়কে তাদের কথা বলে দাবি করছো। তারা কখনো ধর্মীয় ও পুরোহিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করেনি এবং আদৌ করবে না; বরং তারা সর্বদা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও চেষ্টায় বিভোর।

ইসলামের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্র এবং মধ্য যুগের পাশ্চাত্য খ্রিস্টান সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় পুরোহিত রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন নয়, উভয়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত: এ দু'টি বিষয়ের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় অনেকেই এখানে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। অনেকের ধারণা হচ্ছে যা কিছুই ইসলামি তা অবশ্যই ধর্মীয়। অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে ইসলামের পরিধি ধর্ম হতে অনেক বড় ও ব্যাপক। এমনকি মুসলিম আইনের মূলনীতি প্রণয়নকারী পণ্ডিতগণ ধর্মকে ঐ পাঁচ-ছয়টি মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন যেগুলোর নিরাপত্তা ও হেফাজতের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্যই ইসলামি শরিয়তের আবির্ভাব। আর তা হচ্ছে: জান, মাল, বিবেক, বংশ ও ধর্ম; অনেকেই আরো একটি যুক্ত করেছেন: মান-সম্ভ্রম এর নিরাপত্তা বিধান।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে আশা করি বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। আমরা ইসলামের পরিপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিকে আহ্বান করে থাকি, এ প্রশিক্ষণের মধ্যে অনেকগুলো বিভাগের প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এরমধ্যে একটি হচ্ছে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ, যা শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক, সামরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, তাত্ত্বিক এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ ইত্যাদির পাশাপাশি হয়ে থাকে। সুতরাং ধর্মীয় প্রশিক্ষণ মূলত ইসলামের পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার একটি শাখা বা অংশবিশেষ বৈ কিছু নয়।

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বানকে ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামি রাষ্ট্র হচ্ছে বেসামরিক ও দেওয়ানী রাষ্ট্র যা নির্বাচন, আনুগত্যের শপথ, শুরা বা পরামর্শ সভা, জাতির সামনে শাসকের জবাবদিহিতা, শাসককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা বা পরামর্শ দেওয়া, সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়বদ্ধতা ইত্যাদি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বরং ইসলামি আইন এটি মুসলমানের ওপর 'ফরজে কেফায়া' বলে বিবেচিত এবং যখন অন্যের অক্ষমতা ইত্যাদি কারণে কতিপয় ব্যক্তি বা এককভাবে কারো ওপর এটি নির্ধারিত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের ওপর এটি ফরজে আইন হয়ে যায়।

ইসলামে শাসক স্বাধীন বা স্বেচ্ছাচারী নয়; বরং এখানে রয়েছে শরিয়াহ যা তাকে পরিচালনা করবে, রয়েছে নিয়ম-নীতি ও মূল্যবোধ যা তাকে নির্দেশনা দিবে, আরো রয়েছে কতিপয় বিধি-বিধান যা তাকে দায়বদ্ধ থাকতে সহযোগিতা করবে। এ সব বিধি-বিধান সে বা তার দল বা সঙ্গী-সাথী কেউ রচনা করেনি; বরং শাসকসহ সবার জন্য এ সব বিধি-বিধান রচনা করেছেন 'মানুষের প্রতিপালক, মানুষের বাদশাহ এবং মানুষের প্রকৃত মা'বুদ'। শাসকগোষ্ঠীসহ অন্য কারো অধিকার নেই যে এ সব বিধি-বিধানকে রহিত করবে বা অকেজো করে রাখবে। শাসকগোষ্ঠী থেকে শুরু করে যে কোনো রাজা-বাদশাহ, পার্লামেন্ট, সরকার, বিপ্লবী পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং গণফোরামসহ দুনিয়ার কোনো শক্তির সামান্যতম অধিকার নেই যে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধানকে পরিবর্তন করবে।

শাসকগোষ্ঠী যদি সুস্পষ্টভাবে শরিয়াহ বিরোধী কোনো নির্দেশ দেয় তাহলে মুসলিম নারী-পুরুষ সবার এ নির্দেশ অমান্য করার অধিকার রয়েছে; বরং তা অমান্য করা তাদের ওপর ওয়াজিব। শাসকের অধিকার এবং আল্লাহর অধিকার যদি সাংঘর্ষিক হয় তাহলে আল্লাহর অধিকার নিঃসন্দেহে অগ্রাধিকারযোগ্য। স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির অনুগত করা বৈধ নয়। কুরআন কারীমে নবির সা. কাছের মহিলাদের আনুগত্যের ও তাঁর আদেশ-নির্দেশ অমান্য না করার শপথকে ভালো ও আল্লাহ

তায়ালার সন্তুষ্টিমূলক কাজের শর্তযুক্ত করে বলা হয়েছে: "এবং তারা যেন ভালো ও কল্যাণকর কোনো কাজে আপনার আদেশ অমান্য না করে"।[৩]

নিষ্পাপ-নিষ্কলুষ এবং ঐশী প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সমর্থনপুষ্ট নবির সা. আনুগত্য যদি শর্তযুক্ত হয়ে থাকে তাহলে নবি ছাড়া অন্যদের আনুগত্য সন্দেহাতীতভাবে শর্তযুক্ত হবে। সহিহ্ হাদিসে বলা হয়েছে: "আনুগত্য শুধুমাত্র ভালো ও কল্যাণকর কাজেই হবে"। অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে: মুসলিম ব্যক্তি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সকল অবস্থায় তার উচ্চপদস্থ ব্যক্তির আনুগত্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখার বাইরে না যায়, যদি আল্লাহর নাফরমানিমূলক কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে আনুগত্যের বন্ধন থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে"।[৪]

ইসলামের প্রথম খলিফা তাঁর প্রথম ভাষণে বলেন: "যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্যের আওতায় থাকি সে পর্যন্ত তোমরা আমার আনুগত্য করো, যদি আমি তাঁর আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করি তাহলে আমার আনুগত্যের বন্ধন থেকে তোমরা মুক্ত থাকবে; আর আমি যদি কোনো ভালো ও কল্যাণকর কাজ করে থাকি তাহলে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে এবং যদি কোনো অকল্যাণকর ও খারাপ কাজ করে থাকি তাহলে আমাকে সোজা করে দিবে"।

শাসক বা সরকার প্রধান অথবা খলিফা ইসলামে আল্লাহর প্রতিনিধি নয়; বরং তারা হচ্ছে জনগণের প্রতিনিধি। তারা জনগণেরই মনোনীত, তারাই তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করবে, তার কাজ-কর্মের পর্যালোচনা করবে এবং যদি তাকে অপসারণের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তাকে অপসারণ করবে। হজরত ওমর রা. বলেছেন: "তোমাদের কেউ যদি আমার মধ্যে কোনো প্রকারের বক্রতা দেখতে পাও তাহলে অবশ্যই আমাকে সোজা করে দিবে"।

হজরত সালমান রা. ওমরের রা. কথা শুনতে অস্বীকার করলেন যতক্ষণ না তাকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে, ওমর কিভাবে এ পরিমাণ কাপড় পেলেন যা দিয়ে তার মতো দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তির জামা হতে পারে, অথচ অন্য সাহাবিরা যে পরিমাণ কাপড় পেয়েছে তা তার মতো দীর্ঘদেহী ব্যক্তির জামার জন্য যথেষ্ট হতে পারে না?

মুসলিম জাহানের খলিফা থেকে জবাব তলব করা হলো, তখন তার পুত্র আবদুল্লাহ দাঁড়িয়ে এর ব্যাখ্যা দিলেন এবং বললেন যে অতিরিক্ত কাপড়টুকু তার ভাগের কাপড়, তিনি তার পিতাকে তা দিয়েছেন।

---

[৩] সুরা মুমতাহিনা : ১২।

[৪] মুত্তাফাকুন আলাইহি, ইবনে ওমর বর্ণিত হাদিস।

খুতবা দেওয়া অবস্থায় এক মহিলা ওমরের রা. মতামতের প্রতিউত্তর দিলে অবশেষে তিনি তার মতামত পরিত্যাগ করে মহিলার মতামত গ্রহণ করলেন।

বিশিষ্ট ফকিহ্ প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু মুসলিম খাওয়ালানী খলিফা মুয়াবিয়ার দরবারে প্রবেশ করে বললেন: হে মুসলমানদের সেবক, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! মুয়াবিয়ার চতুর্পাশে উপবিষ্ট সভাসদগণ এতে উত্তেজিত হয়ে উঠলে তিনি তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন: আবু মুসলিমকে তার কথা বলতে দাও, তার কথা সম্পর্কে সে অত্যধিক জ্ঞাত।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ খলিফা হওয়ার পরে বলেন: আমিতো তোমাদেরই একজন, তবে আল্লাহ আমার ওপর তোমাদের চেয়ে বেশি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন।

সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী বলেন: আমি তো আল্লাহর শরিয়তের একজন পুলিশ ও সৈনিক, এর হেফাজত এবং এর বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে আমার দায়িত্ব।

ধর্মীয় পুরোহিত রাষ্ট্রের দাবি ও সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারীদের সন্দেহ

সেক্যুলার মতবাদে বিশ্বাসীরা কিসের ভিত্তিতে ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে খোদায়ী অধিকারের নাম নিয়ে ধর্মীয় পুরোহিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রত বলে অভিযোগ উত্থাপন করছে? এ অভিযোগের ভিত্তি বা কি?

এ ক্ষেত্রে তারা যা কিছু লিখেছে আমি এসব ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে খুঁজে পেলাম যে তারা এক্ষেত্রে মূলত কয়েকটি সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি সততার সাথে সে সকল সন্দেহাবলী এখানে উল্লেখ করার প্রয়াস পাব, অতঃপর এ গুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১. "হাকেমিয়্যাত" তথা শাসন-কর্তৃত্ব দর্শন (Governorship), এর পথিকৃত ছিলেন সমসাময়িক যুগশ্রেষ্ঠ দুই ব্যক্তিত্ব, ইসলামি রেঁনেসার দু'জন ইমাম পাকিস্তানের সাইয়্যেদ আবুল আ'লা ও মিশরের সাইয়্যেদ কুতুব। তাঁদের দর্শনের মূল কথা হচ্ছে : শাসনব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর জন্যই, কোনো মানুষের জন্য নয়। সৃষ্টিগত আল্লাহ তায়ালার রাজ্য, এখানে তিনি ব্যতীত অথবা তাঁর সাথে অন্য কারো শাসনব্যবস্থা পরিচালনার অধিকার নেই। "শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই। তাঁর হুকুম, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারোর বন্দেগি করবে না" (সুরা ইউসুফ, ১২: ৪০)।

২. হজরত উসমানের রা. একটি কথা যা তিনি অবরুদ্ধ অবস্থায় বলেছিলেন। ড. ফাওদাহ তাঁর এ কথাটি নিয়ে তিলকে তাল করে বাহ্যিকভাবে একে

অপ্রতিরোধ্য একটি যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি বলেনঃ "একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে খোদায়ী শাসনের চিন্তাধারার মূলগোড়া শক্তভাবে খলিফা উসমান ইবনে আফ্‌ফানের কথার মধ্যে নিহিত। বিদ্রোহীরা যখন তাকে খিলাফত থেকে পদত্যাগের দাবি জানাল তিনি এমন কথা বললেন যা মূলত পরবর্তীদের কাছে খোদায়ী শাসনের চিন্তাধারার উৎস হিসেবে গৃহীত হয়। তিনি বলেছিলেনঃ "না, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো এমন চাদর খুলে ফেলতে চাই না যা আল্লাহ আমাকে পরিধান করিয়েছেন"। এ কথাটিই মূলত ঘুরে ফিরে ইসলামের সকল রাজনৈতিক চিন্তাধারার সূচনা করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠরা হজরত উসমানের রা. মতামত গ্রহণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা মূলত মানুষকে খেলাফত দিয়ে থাকেন। তাই আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা থেকে খলিফাকে অপসারণের অধিকার প্রজাতন্ত্রের নাগালের বাইরে। এর বিপরীতে সংখ্যালঘু জনশক্তি মনে করেন জনগণই হচ্ছে ক্ষমতার উৎস। তারাই ক্ষমতায় বসাবে আবার তারাই অপসারণ করবে। এ মত পরবর্তীতে "মু'তাযিলা" চিন্তাধারার অনুসারীরা গ্রহণ করে থাকেন। সম্ভবত সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীতে এ চিন্তাধারা পোষণ করার কারণেই তাদেরকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে"।

৩. অপর একটি বক্তব্য যা আব্বাসীর খলিফা আবু জা'ফর মানসূরের বক্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়। উমাইয়া শাসনের পতন শেষে আব্বাসীয়রা খেলাফতের লাগাম হাতে নেওয়ার পর তিনি মক্কার ভূমিতে প্রদত্ত তার এক ভাষণে বলেন: "হে মানব সকল! অবশ্যই আমি আল্লাহর এ ভূমিতে তাঁর শাসক। আল্লাহর প্রদত্ত তাওফিক, যোগ্যতা ও সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমেই আমি তোমাদের পরিচালনা করব। আল্লাহর এ সকল সহায়-সম্পত্তির আমি একজন পাহারাদার। তাঁর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতেই আমি তাতে হস্তক্ষেপ করব। আল্লাহ আমাকে এ সকল কিছুর তালাস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। তোমাদের জীবিকা বন্টনের জন্য তিনি আমাকে খুলে দিতে চাইলে খুলে দিবেন এবং এ জন্য বন্ধ করে দিতে চাইলে বন্ধ করে দিবেন"।

৪. ইরানের সাম্প্রতিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে আসা যাক। যেখানে এখন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরাই শাসনকার্য পরিচালনা করছে, তাদের অগ্রভাগে ছিলেন সেখানকার সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আল খুমাইনী এবং তার পরে তার খলিফা, যা দেখে কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বলা যায় যে সেখানে এখন নিরেট ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা বিরাজমান। এর ওপর অনুমান করা হয় যে, আমাদের দেশে যে কোনো ইসলামি শাসনব্যবস্থা ইরানে প্রচলিত শাসনব্যবস্থারই ফটোকপি হবে।

'হাকেমিয়্যাত' তথা শাসন-কর্তৃত্বের দর্শন এবং ধর্মীয় রাষ্ট্রের সাথে এর সম্পৃক্ততা

এ পর্যায়ে আমরা শাসন-কর্তৃত্ব দর্শনের পর্যালোচনার প্রয়াস পাচ্ছি যার ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে ধর্মীয় পুরোহিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

প্রকৃত বিষয় হচ্ছে শাসন কর্তৃত্ব দর্শনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে অনেকেই ভুলের মধ্যে রয়েছেন এবং তার ব্যাখ্যায় প্রবক্তাগণ বুঝাতে চায়নি এমন কিছু বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমরা এখানে এ প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:

এটি কি খারিজিদের দর্শন?

১. প্রথমত : সাইয়্যেদ আবুল আ'লা কর্তৃক প্রণীত এবং সাইয়্যেদ কুতুব সমর্থিত শাসন-কর্তৃত্বের বিষয়ে যারা মন্তব্য করেছেন তাদের অধিকাংশ একে মূলত খারিজিদের চিন্তাধারা বলে উল্লেখ করেছেন, যারা হজরত আলীর রা. কর্তৃক তাহকিমের তথা মীমাংসাকারী হিসেবে কাউকে মেনে নেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করার ওপর মৌলিকভাবে আপত্তি করেছিল এবং এ ক্ষেত্রে তাদের প্রসিদ্ধ বক্তব্য ছিল: "আল্লাহ ব্যতীত আর কারো মীমাংসা বা শাসন গ্রহণযোগ্য নয়"। হজরত আলী রা. ঐতিহাসিক এক বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের প্রতিউত্তর দিয়েছিলেন যেখানে তিনি বলেছিলেন: "এটি ভালো ও সত্য কথা; কিন্তু এটা মিথ্যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। হ্যাঁ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শাসন গ্রহণযোগ্য নয়; কিন্তু এ সকল লোকেরা বলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ সৎ হোক বা পাপাচারী হোক, মানুষের পরিচালনার জন্য তাদের থেকেই একজন আমির বা নেতা অপরিহার্য!

শাসনব্যবস্থা ও শাসন-কর্তৃত্বের এ সহজ সরল তাৎপর্য এখন ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত। এর প্রবক্তা এখন কেউ নেই; এমনকি স্বয়ং খারিজি সম্প্রদায়ও এবং তাদের থেকে বেরিয়ে আসা ভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যেও এর প্রবক্তা কেউ নেই। তারাও রাষ্ট্র পরিচালনার দাবি করেছিল এবং এ দাবি লড়াই পর্যন্তও এগিয়েছে। এরপর তারা কিছু সময়ের জন্য কতিপয় অঞ্চলে কার্যত তা প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম হয়েছিল।

ইসলামি শরিয়তে শাসন-কর্তৃত্বের অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে: জগত সংসার পরিচালনার যাবতীয় আইন-কানুন আল্লাহ তায়ালারই প্রণীত। তিনি তার সৃষ্টিকুলকে আদেশ-নিষেধ করে থাকেন এবং তিনিই তাদের জন্য হালাল-হারামের বিধান দিয়ে থাকেন। এটি মওদুদী কিংবা সাইয়্যেদ কুতুবের আবিষ্কৃত কোনো বিষয় নয়; বরং এটি

মুসলমানদের কাছে সর্বস্বীকৃত ও সর্বসম্মত একটি বিষয়। তাই হজরত আলী রা. নীতিগতভাবে এ মূলনীতির ওপর আপত্তি করেননি, তিনি এর অন্তরালে খারিজিদের যে দুরভিসন্ধি এবং অসৎ উদ্দেশ্য ছিল সে ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন। তাঁর মূল্যবান সে উক্তি "এটি সত্য কথা; কিন্তু এটি মিথ্যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত'-এর অর্থ হচ্ছেঃ খারিজিদের এ কথা মূলত সঠিক এবং সত্য; কিন্তু তারা যে উদ্দেশ্য তা ব্যবহার করেছেন তা অবাস্তব ও মিথ্যা।

উসূলে ফিক্হ বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে শাসন-কর্তৃত্ব

উসূলে ফিক্হ শাস্ত্রের ভূমিকায় উসূলবিদগণ শরিয়তের 'হুকুম' তথা বিধি-বিধান, 'হাকেম' তথা আইন প্রণেতা ও "মাহকুম আলাইহি" বা শাসিত এবং 'মাহকুম বিহি' তথা সংবিধান ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে 'হাকেমিয়্যাত' তথা শাসন কর্তৃত্বের বিষয়টি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

ইমাম আবু হামিদ গাজালী রা. তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব "আল মুসতাসফা মিন ইলমিল উসুল" গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে 'হুকুম' এর আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ হুকুম হচ্ছে মূলত শরিয়াহ প্রণেতার আদেশ। শরিয়তের আদেশ আসার পূর্বে কোনো হুকুম জারি হতে পারে না। এর সংশ্লিষ্ট হচ্ছে 'হাকেম' যিনি শরিয়াহ প্রণেতা, "মাহকুম আলাইহি" তথা প্রাপ্ত বয়স্ক আল্লাহর বান্দাগণ এবং 'মাহকুম ফিহ' তথা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাজকর্ম ...। এরপর তিনি বলেনঃ "হাকেমের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ হুকুম দেওয়ার অধিকার রাখে না। রসুলও হুকুম দেওয়ার অধিকার রাখেন না। এছাড়া মনিব তার গোলামকে এবং এক মাখলুক অপর মাখলুককে হুকুম দেওয়ার অধিকার রাখেন না। সকল কিছুই আল্লাহর হুকুমের অনুগত; তিনি ছাড়া অন্য কারো হুকুম দেওয়ার কোনো অধিকার নেই"।[৫] এরপর তিনি প্রাপ্তবয়স্ক বান্দাদের হুকুমসহ যিনি আদেশ দেন তথা "আল হাকেম" এর আলোচনার দিকে এগিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ শাসন কর্তৃত্বের উপযুক্ত তিনিই হবেন সৃষ্টিকুলসহ সকল কিছুই যার করতলগত। সাধারণত দাসের ওপর মনিবের হুকুমই কার্যকর হয়ে থাকে। স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেউ আমাদের মনিব হতে পারে না; তাই যাবতীয় আদেশ-নিষেধ একমাত্র স্রষ্টারই আয়ত্তাধীন। কিন্তু মহানবি সা. থেকে শুরু করে সকল রাজা বাদশাহ কোন গোলামের মনিব, পিতা ও স্বামী ইত্যাদির কেউ কোনো বিষয়ে আদেশ-নিষেধ করলে অথবা কোনো বিষয়কে কারো

---

[৫] আল মুছতাসফা : ১/৮, দারুস সাদির, বৈরুত কর্তৃক মুদ্রিত। বোলাক থেকে মুদ্রিত কপির ফটোকপি।

ওপর আবশ্যক করলে তাদের কর্তৃক আবশ্যকতার কারণে তা মেনে চলা কারো ওপর আবশ্যক হয়ে যায় না; বরং আল্লাহ কর্তৃক আবশ্যকীয় হওয়ার কারণে তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অন্যথায় প্রত্যক সৃষ্টিই একে ওপর কেনো বিষয় আবশ্যক করতে সক্ষম হতো। যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে প্রত্যেকেই সমান মর্যাদার অধিকারী, কেউ কারো থেকে উত্তম নয়। তাই কেউ যদি কারো ওপর কোনো কিছু আবশ্যক করে থাকে তাহলে তারও সুযোগ রয়েছে এ আবশ্যকতাকে পুনরায় তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। তাই প্রকৃত আনুগত্য মূলত একমাত্র আল্লাহতায়লার জন্য, আর যাদের আনুগত্য আল্লাহ কর্তৃক ফরজকৃত তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করা হয়"।[৬]

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা ও সাইয়্যেদ কুতুব বর্ণিত 'হাকেমিয়্যাত' তথা শাসন-কর্তৃত্ব দর্শন

২. দ্বিতীয়ত সাইয়্যেদ আবুল আ'লা ও সাইয়্যেদ কুতুব যে 'হাকেমিয়্যাত' এর কথা বলেছেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এর একমাত্র অধিকারী বলে উল্লেখ করেছেন। একথা বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, গভর্নর ও শাসকগোষ্ঠী আল্লাহ কর্তৃকই মনোনীত ও নিযুক্ত হবে এবং তাঁর নামেই তারা শাসনকার্য পরিচালনা করবে। বরং এর দ্বারা মূলত শুধুমাত্র শরিয়াহর শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি হচ্ছে জনগণ, তারাই তাদের শাসক নির্ধরণ করবে, শাসকের কাজকর্মের হিসেব-নিকেশ ও পর্যালোচনা করবে; বরং প্রয়োজনে তারা শাসককে অপসারণ করতে পারবে। এখানে দু'টি বিষয়ের মধ্যস্থ পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় নিজের অজান্তেই মানুষ ধোকা ও প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে ড. আহমদ কামাল আবুল মাজিদও এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

---

[৬] আল মুছতাসফা : ১/৮৩ - দারুস সাদির, বৈরুত কর্তৃক মুদ্রিত। বোলাক থেকে মুদ্রিত কপির ফটোকপি। "ফাওয়াতিহুর রাহমুত" গ্রন্থে বলা হয়েছে; মাসআলা : মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যানুযায়ী হুকুম শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। উলামা মাশায়েখদের আরো অন্যান্য কিতাবেও অনুরূপ বলা হয়েছে। এ আমাদের অভিমত; কিন্তু মু'তাযিলাদের অভিমত হচ্ছে : বিবেক-বুদ্ধিই হচ্ছে মূলত : হুকুমদাতা। কিন্তু ইসলামের দাবিদার কারো পক্ষে এ কথা বলার দুঃসাহস হতে পারে না, তাই তারা বলে থাকে: তাই তারা বলে থাকে: আক্ল তথা বিবেক-বুদ্ধি হচ্ছে কতিপয় খোদায়ী বিধি-বিধানের পরিচালক। এ ব্যাপারে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পাওয়া না গেলেও আক্ল তা বের করতে সক্ষম। আমাদের কতিপয় সিনিয়র মাশায়েখও (মাতুরিদিয়া) এ মত পোষণ করে থাকেন। দেখুন : আল মুছতাসফা, পৃষ্ঠা - ২৫।

যথার্থই, হাকেমিয়্যাত দ্বারা ধর্মীয় পুরোহিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান নয়; বরং উল্টো সাইয়্যেদ আবুল আ'লা ও সাইয়্যেদ কুতুব উভয়ই এ ধরনের চিন্তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাকেমিয়্যাত সম্পর্কে সাইয়্যেদ কুতুবের বক্তব্য

সাইয়্যেদ কুতুব তাঁর "মায়ালিম আত্ তারীক্ব তথা মাইলস্টোন" গ্রন্থে বলেন:

"পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার অর্থ এটা নয় যে, নির্দিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি যারা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বলে পরিচিত তারাই শাসনকার্য পরিচালনা করবে যেমনিভাবে গীর্জার পাদ্রি ও পুরোহিতবর্গ করেছিল। এমনিভাবে এর অর্থ এটাও নয় যে, ঈশ্বরের মুখপাত্র হওয়ার দাবিদার কতিপয় ব্যক্তিই শাসনকার্য পরিচালনা করবে যেমনিভাবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত 'ঈশ্বরতন্ত্র' অথবা "পবিত্র পুরোহিত শাসন" নামে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বরং আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়াহ তথা বিধি-বিধানের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় বিষয়ে শরিয়াহ প্রদত্ত সমাধান মেনে নিয়ে সকল কিছু আল্লাহর কাছেই সোপর্দ করা"।

হাকেমিয়্যাত সম্পর্কে সাইয়্যেদ আবুল আ'লার বক্তব্য

একটি দল সাইয়্যেদ আবুল আ'লার কথার অংশবিশেষ নিয়ে তাঁর বক্তব্যের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করে থাকে এবং এর ওপর ভিত্তি করে এমন ফলাফল ও সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যার সাথে সাইয়্যেদ আবুল আ'লার যাবতীয় চিন্তাধারা, দর্শন ও দাওয়াতের আদৌ কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি শত শত বক্তব্য, লেকচার, আলোচনা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাকারে সুস্পষ্ট ও সবিস্তারে তাঁর চিন্তাধারা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নাহের ব্যাপারেও এমনটি ঘটে থাকে। কোনো আয়াত অথবা হাদিস যদি তার অগ্র-পশ্চাত অথবা সংশ্লিষ্ট সকল কিছু বাদ দিয়ে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থও বিকৃত হতে বাধ্য; তাহলে কুরআন ও হাদিস ব্যতীত কোনো ব্যক্তির বক্তব্য ও কথায় এরূপ করার মাধ্যমে তা বিকৃত হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কোথায়?

পশ্চিমা গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা বলেন: ইসলামের মূলনীতির সাথে এর কোনো মিল নেই। ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিকে গণতন্ত্রের সাথে তুলনা করা সঠিক হবে না; বরং তার চেয়ে একে 'আল্লাহর আইনের' শাসন বলে আখ্যায়িত করলে এর পরিচয় তুলনামূলক স্পষ্ট হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন: "কিন্তু খোদায়ী শাসন বা "ইসলামিক ঈশ্বরতন্ত্র" (Islamic Theo-democracy) ইউরোপীয় ঈশ্বরতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ও

ভিন্ন। ইউরোপের ঈশ্বরতান্ত্রিক রাষ্ট্র মূলত পাদ্রি ও পোপদের বিশেষ একটি গ্রুপের মাধ্যমেই পরিচালিত হতো। নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা আইন-কানুন প্রণয়ন করত[৭] এবং ঈশ্বরের আইন নামকরণের আড়ালে সাধারণ জনগণের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দিত। এ ধরনের শাসনকে 'ঈশ্বরতান্ত্রিক শাসন' নামকরণের চাইতে 'শয়তানের শাসন' আখ্যা দেওয়াই বেশি উপযুক্ত!"

ইসলাম বর্ণিত খোদায়ী শাসনে পোপ-পাদ্রি বা উলামা-মাশায়েখের মতো বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ নেই; বরং সাধারণ মানুষের হাতেই এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাধারণ জনগণই এর দায়ভার গ্রহণ করে এবং কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক এর যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করে থাকে। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে আমি "গণতান্ত্রিক ঈশ্বরতন্ত্র" বা "গণতান্ত্রিক ইসলামি শাসনব্যবস্থা" ইত্যাদি নতুন পরিভাষায় পরিচয় দেওয়া সমীচীন বলে মনে করি। কারণ এখানে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ক্ষমতা ও তাঁর অপরাজেয় বিধি-বিধানের কর্তৃত্বের তত্ত্বাবধানে মুসলমানদের সীমাবদ্ধ গণশাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ঘোষণা করা হয়েছে। মুসলিম জনগণের মতামত ব্যতীত ইসলামি রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয় না এবং তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতাও জনগণের হাতে সংরক্ষিত থাকে। এমনিভাবে রাষ্ট্রের সকল বিষয় যেখানে সুস্পষ্ট শরিয়তের বিধান রয়েছে সেখানে মুসলমানদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোনো অকাট্য ফায়াসালা দেওয়া হয় না।

যখনি কোনো আইনের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন ঘটে অথবা শরিয়তের কোনো মূল ভাষ্য বিশ্লেষণ করার দরকার হয় তখন তা বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা নির্দিষ্ট কোনো পরিবারের ব্যাখ্যার মাধ্যমে গৃহীত হয় না; বরং মুসলিম জনগণের প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যিনি বা যারা ইজতেহাদ তথা শরিয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণার যোগ্যতা রাখেন তিনিই বা তারাই এ ক্ষেত্রে শরিয়তের আইন বা ভাষ্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

এ দৃষ্টিতে ইসলামি শাসনকে গণতান্ত্রিক শাসন হিসেবে গণ্য করা যায়, যা সাইয়্যেদ আবুল আ'লার কথার সারমর্ম হিসেবে বেরিয়ে আসে। অবশ্যই ইসলামি রাষ্ট্রকে

---

[৭] খ্রিস্টান পাদ্রি ও পোপদের কাছে ঈসার আ. কিছু চারিত্রিক উপদেশসমগ্র ব্যতীত অন্য কোনো বিধি-বিধান ছিল না। তাই তারা নিজেদের ইচ্ছা মোতাবেক আইন-কানুন প্রণয়ন করে আল্লাহর নামে তা জনপদে বাস্তবায়নকে করে চলত। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে : "ধ্বংস তাদের জন্য অবধারিত যারা স্বহস্তে শরিয়তের লিখন লিখে তারপর লোকদের বলে এর আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে" (সুরা বাকারা ২: ৭৯)।

ঈশ্বরতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলার ব্যাপারে আমাদের আরো সচেতন ও সংযমী হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু ইতিহাসে আরো অনেক ঈশ্বরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তাই এগুলোর সাথে নামকরণের সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কারণে উভয়ের মাঝে অভিন্নতা খুঁজে বেড়ানোর সমূহ সম্ভাবনা বিরাজমান; যদিও সাইয়্যেদ আবুল আ'লা এধরনের সম্ভাবনাকে সুস্পষ্টভাবে পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছেন।

শাসন-কর্তৃত্ব বলতে সুপ্রিম কমান্ডই উদ্দেশ্য

৩. তৃতীয়ত : আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব হচ্ছে নিরঙ্কুশ ও সুপ্রিম, যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে এবং যেখানে তার স্থলে অন্য কাউকে নিযুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই। কোনো কিছু দিয়ে এ কর্তৃত্বকে শর্তযুক্ত ও সীমিত করা যাবে না। এটি একত্ববাদ ও তাওহিদের একটি নিদর্শনও বটে!

উপর্যুক্ত অর্থে এধারণা নাকচ করে না যে আল্লাহর অনুমতিক্রমে কতিপয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করার সুযোগ মানুষের থাকবে। যে বিষয়টি থেকে এখানে নিষেধ করা হয় তা হচ্ছে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত এককভাবে আইন প্রণয়ন করা, যা কখনো বৈধ হতে পারে না। এটি অনেকটা নিরেট ধর্মীয় আইন-কানুন প্রণয়ন করার মতোও বটে। যেমনঃ ইবাদাতের জগতে নতুন কোনো ইবাদাত নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নেওয়া, অথবা আল্লাহ প্রদত্ত ইবাদতের ওপর নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো স্থান-কাল পাত্রভেদে কম-বেশি বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নেওয়া। এমনিভাবে হালাল-হারামের বিধান দিতে শুরু করা এভাবে যে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তাকে হারাম করা এবং যা হারাম করেছেন তাকে হালাল করে নেওয়া ইত্যাদি ইসলামি শরিয়তে অনুমোদিত নয়। রসুল সা. একে এক প্রকারের প্রভুত্ব বলে উল্লেখ করেছেন এবং তা দিয়ে তিনি আহলে কিতাবদের ব্যাপারে আল্লাহর এ বাণীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, 'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের উলামা ও দরবেশদেরকে নিজেদের রবে পরিণত করেছে'। (সুরা তাওবা, ৯: ৩১)

এমনিভাবে শরিয়তের সুস্পষ্ট কোনো মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন রচনা করা যেমনঃ যাবতীয় অপরাধকর্মের স্বীকৃতি দেওয়া, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের পাপচারের সয়লাবে আইনী অনুমোদন দেয়া, শরিয়াহ কর্তৃক আবশ্যকীয় কোনো বিধানকে অকেজো করে রাখা, প্রয়োজনীয় দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন না করা এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করা ইত্যাদি ইসলামি রাষ্ট্রে বৈধ হতে পারে না।

এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে (শরিয়াহ বর্ণিত মূলনীতির আলোকে) প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করার সুযোগ মুসলমানদের রয়েছে। আর তা হবে ওই সকল বিষয়ে যেখানে শরিয়তের সুস্পষ্ট কোনো বিধান বা ভাষ্য (কুরআন হাদিস) পাওয়া যায় না এবং যেখানে শরিয়াহ নীরব রয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে: 'যে সকল বিষয়ের ব্যাপারে শরিয়াহ নীরব রয়েছে অর্থাৎ সুস্পষ্ট কোনো বিধান দেয়নি তা শরিয়াহ কর্তৃক অনুমোদিত ও ক্ষমার উপযুক্ত'।[৮] মানবজীবনের বিশাল একটি অংশ জুড়ে রয়েছে এ জাতীয় বিধান যেখানে শরিয়াহ নীরব ভূমিকা পালন করেছে, যা মূলত শরিয়াহ কর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত। যেমন: শুরার বিধান, ইসলামি শরিয়াহ এর মূলনীতি ও সাধারণ নিয়ম-নীতি বর্ণনা করে বিস্তারিত খুঁটিনাটি দিকগুলো মানুষের জন্য ছেড়ে দিয়েছে।

সুতরাং মুসলমানরা তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনসহ জীবনের বিশাল এক ময়দানে নিজেদের প্রয়োজনমতো বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম। এ ক্ষেত্রে তাদের শুধুমাত্র ইসলামি শরিয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মৌলিক নিয়ম-নীতির আওতাভুক্ত থাকার বাধ্যবাধকতা থাকবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনসহ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

বর্তমান প্রচলিত জেনারেল আইনের অনেক খুঁটিনাটি নিয়ম-কানুন ইসলামের মৌলিক নিয়ম-নীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের খুঁটিনাটি বিস্তারিত বিধি-বিধানের সাথেও এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ এ ক্ষেত্রেও দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়। যেমন: জল, স্থল ও বিমানপথ ইত্যাদির পরিবহন নীতি, শ্রমিক ও শ্রমনীতি, কৃষি ও স্বাস্থ্যনীতি ইত্যাদি যা ইসলামি রাষ্ট্রনীতির ন্যায় বিশাল এক জগতের অন্তর্ভুক্ত।[৯]

এমনিভাবে সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে শরিয়াহ স্বীকৃত বৈধ বিষয়াবলীও অনেক সময় স্থান-কাল-পাত্রভেদে শর্তযুক্ত বা সীমিত পরিধিভুক্ত করে দেওয়া যায়। যেমন: হজরত ওমর রা. কোনো কোনো দিবসগুলোতে পশু জবাই করতে বারণ করেছিলেন। তদ্রুপভাবে তিনি কতিপয় সাহাবির জন্য অমুসলিম তথা আহলে

---

[৮] হাকেম হজরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণনা করেন এবং বিশুদ্ধ বলেছেন। ইমাম যাহাবীও তারা সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

[৯] দেখুন : আমাদের রচিত : "সর্বযুগের ও সর্বকালের উপযুক্ত ইসলামি জীবনব্যবস্থা" শীর্ষক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি ইসলামি শরিয়তের বাস্তবায়ন, নামে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

কিতাবদের রমণী বিবাহ করা অপছন্দ করেছিলেন যাতে মানুষ তাদেরকে অনুসরণ না করে এবং মুসলিম রমণীদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি না হয়।

উস্তাদ সাইয়্যেদ আবুল আ'লা যিনি 'হাকেমিয়্যাত' এর প্রবক্তা ছিলেন এবং এ ব্যাপারে বেশ গুরুত্বারোপ করেছেন, তিনি মানুষের জন্য ক্বিয়াস, ইসতেহসান, ইজতেহাদ ইত্যাদির সাহায্যে শরিয়তের ভাষ্যের উপযুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে শরিয়তের অকাট্য বিধি-বিধান, প্রতিষ্ঠিত হুকুম-আহকাম ও সুনির্দিষ্ট দন্ডবিধি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়নের অধিকারের বৈধতা ও স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১০]

হজরত উসমানের রা. বক্তব্য

হজরত উসমান রা. একদিনের জন্যও দাবি করেননি যে, তিনি ঈশ্বরতান্ত্রিক শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে: তিনি মুসলমানদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন এ মর্মে যে- তিনি আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নাহ মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনা করবেন এবং তার অগ্রজ দু'খলিফার দেখানো পথই হবে তাঁর চলার পথ।

তাঁর জীবন চরিত্রে অথবা তাঁর কোনো কথায় এমন কিছু পাওয়া যায় না যা থেকে এ দাবি করা যায় যে, তিনি আসমানের দোহাই দিয়ে পৃথিবীতে শাসন করেছেন; বরং তিনি বলেছেন: 'আমার এবং তোমাদের বিষয়াবলী একই উৎস থেকে উৎসারিত'।

যখন বিদ্রোহী ও হঠকারীদের একটি গোষ্ঠি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তার কতিপয় নীতি মেনে নিতে অস্বীকার করে (ইসলামের দুশমনরা যা ফলাও করে প্রচার করেছিল এবং মুসলমানদের একটি দল তাদের প্রতারনার শিকার হয়ে তা বাস্তব বলে গ্রহণ করেছিল), তিনি তাদের বলেননি যে, শাসনকার্যে আমার খোদায়ী অধিকার রয়েছে, তাই আমার আনুগত্য ব্যতীত তোমাদের দ্বিতীয় কোনো পথ নেই; বরং গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত ভাষায় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনপূর্বক তার যাবতীয় কাযকর্মের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন।

তাঁর বক্তব্য ছিল: 'এটি এমন একটি জামা যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে পরিয়েছেন, আমি তা খুলব না বা খুলতে পারি না'। এ ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে: তিনি এ কথা বলেছেন কারণ রসুল সা. আল্লাহ প্রদত্ত ভবিষ্যতবাণীর আলোকে

---

[১০] দেখুন : ইসলামের রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক নিয়ম-নীতি সংক্রান্ড় রচনা সমগ্র। পৃষ্ঠা : ১৭১ এবং তৎপরবর্তী আলোচনা।

অসীয়ত করতে গিয়ে তাকে বলেছিলেন: 'মনে হয় আল্লাহ তোমাকে একটি জামা পরাবেন, কেউ যদি তোমার থেকে তা খুলে ফেলতে চায় তুমি তা খুলবে না' (তিনবার বলেছেন)।[১১] মূলত রসুলের সা. অসীয়ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি এ অবস্থান নিয়েছিলেন।

উপর্যুক্ত অসীয়তের ব্যাপারটি যদি সঠিক না হয় (কেউ কেউ মনে করেন) তাহলে তাঁর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে যে, বিদ্রোহী ও হঠকারীদের হাতের খেলনা হিসেবে খেলাফতকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না, গোপন একটি শক্তি যার কলকাঠি নাড়ছে এবং কতিপয় মানুষের অজান্তেই তাদের আবেগের অপব্যবহার করে চলছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা খেলাফত থেকে তার পদত্যাগ দাবী করেছিল তাদের কেউ নীতি-নির্ধারক ও বুদ্ধিজীবি পর্যায়ের ছিল না; যারা সাধারণত রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্বাধান করার যোগ্যতা রাখে খলিফা ইচ্ছে করলে হয়তো তাদের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব সোপর্দ করে খেলাফত থেকে সরে দাঁড়াতে পারতেন।

ইমাম তাবারী ও ইবনে কাসীর প্রমুখ বলেন: উম্মতে মুহাম্মদীকে পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে এবং মুখ-নির্বোধদের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করে যাবতীয় বিশৃঙ্খলা ও ফেতনা-ফাসাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে হজরত উসমান রা. খেলাফতের জামা খুলে ফেলতে রাজি হননি।[১২]

নিরীহ মাজলুম খলিফা হজরত উসমান ইবনে আফ্ফান রা., তাঁর বাইয়াত সম্পর্কে বলছিলেন, 'তিনি জানতেন যারা তাঁর হাতে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল তারা তাদের শপথ থেকে বেরিয়ে আসেনি। তিনি জানতেন যে, যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার পদত্যাগি দাবি করছে তারা বিদ্রোহী ও হঠকারী সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি মাত্র। তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন যে কিভাবে মুষ্টিমেয় লোকের এ ফেতনা পুরো উম্মতের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে পড়ছে? তাইতো তিনি তাদের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে খেলাফত থেকে সরে দাঁড়াতে অস্বীকার করেন এবং প্রয়োজনে নিজের জীবন কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি পারতেন তাঁর সমর্থকদের সাথে নিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করতে; কিন্তু তিনি তা করতে যাননি।

---

[১১] ইমাম আহমদ ও তিরমিযী বর্ণিত হাদিস এবং একে হাসান বলা হয়েছে। ইবনে মাযাহ হযরত নো'মান ইবনে বশীর হযরত আয়েশা রা: থেকে বর্ণনা করেন। দেখুন : ইবনে কাসীর প্রণীত আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ১৭/১৮০, ১৮১, ২০৮ - মাকতাবাতুল মাআরেফ, বৈরুত থেকে মুদ্রিত।

[১২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ - প্রাগুক্ত।

আনসার-মুহাজিরদের সূর্যসন্তানরা এবং দুঃসাহসিক সাহাবিদের একটি দল তাঁর দরজায় তখন প্রস্তুত ছিল। হজরত হাছান ও হুসাইন এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবিগণ তাঁর পার্শ্বে দাঁড়াতে এবং তাঁকে হেফাজত করতে এগিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন; এসবের কোনো প্রয়োজন নেই এবং তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি কোষমুক্ত করতে নিষেধ করলেন। এরপর তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং কুরআন পড়তে থাকলেন। অবশেষে বিদ্রোহীরা তাঁর গৃহে প্রবেশ করে তাঁকে তাড়াতাড়ি জান্নাতে প্রবেশ করতে সহযোগিতা করল!

এই মহান শহীদ খলিফা উল্লেখিত বক্তব্যের কি এ অর্থ করা যায় যে, তিনি এর মাধ্যমে খোদায়ী অধিকার সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে মানুষের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব ধরে রাখতে চেয়েছিলেন? কোন ব্যক্তি খোদায়ী দাবির দোহাই দিয়ে শাসন ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকবে, অতঃপর সন্তুষ্টি চিত্তে শাহাদাতের নজরানা হিসেবে নিজেকে পেশ করবে, মনুষ্য বিবেকের নিকট এ কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে?![১৩]

ড. ফারজ ফাওদাহ বলেন: হজরত উসমানের এ কথাটিই মূলত ঘুরে ফিরে ইসলামের সকল রাজনৈতিক চিন্তাধারার সূচনা করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ পণ্ডিতরা হজরত উসমানের রা. মতামত গ্রহণ করে এ সিদ্ধান্ত নেন যে, আল্লাহ তায়ালাই মূলত মানুষকে খেলাফত দিয়ে থাকেন। তাই আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা থেকে খলিফাকে অপসারণের অধিকার প্রজাতন্ত্রের নাগালের বাইরে। এর বিপরীতে সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠি মনে করে জনগণই হচ্ছে ক্ষমতার উৎস। তারাই ক্ষতমায় বসাবে আবার তারাই অপাসারণ করবে। এ মত পরবর্তীতে 'মু'তাযিলা' চিন্তাধারার অনুসারীরা গ্রহণ করে। সম্ভবতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীতে এ চিন্তাধারা পোষণ করার কারণেই তাদেরকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাশীল নেতৃত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই একমাত্র একথা বলতে পারে অথবা এর সম্পর্কে ক্রটিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ও আত্মপূজারি ব্যক্তিরাই এমনটি ভাবতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কতিপয় দিক থেকে এ চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যানযোগ্য:

প্রথমত: মুসলিম জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী- আহলে সুন্নাহর মতামত হচ্ছে : 'উম্মতের অধিকার হচ্ছে- জনগণের প্রতিনিধিত্বে তারা তাদের ইমাম

---

[১৩] 'আল আহরাম' পত্রিকায় ফাহমী হুয়াইদী লিখিত 'খোদায়ী শাসনের নামে মিথ্যাচার' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

তথা সরকার প্রধান নিয়োগ করবে, তার যাবতীয় কার্যক্রমের পর্যালোচনা করবে এবং কোনো বক্রতা দেখলে সোজা করে দেবে। শুধু তাই নয় প্রয়োজনে তাকে অপসারণ করবে যদি এমতাবস্থায় এর থেকেও বড় ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। যদি তার থেকে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কোনো কুফরি কাজ পাওয়া যায় তাহলে তার প্রতিরোধ করা উম্মতের ওপর আবশ্যক। এটি সংখ্যালঘুদের মত নয়, যেমনিভাবে লেখক ধারণা করেছেন; বরং উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ চিন্তাবিদ এই মত পোষণ করে থাকে। এমনকি আলী আবদুর রাজ্জাকও তাত্ত্বিকভাবে এ কথার স্বীকৃত দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, মুসলমানদের খেলাফত মূলত তাদের মধ্যকার নীতি-নির্ধারক গোষ্ঠীর মনোনয়ন বা নির্বাচনের ওপরই নির্ভরশীল। যেহেতু নেতৃত্ব হচ্ছে এমন এক বন্ধন যা আদল-ইনসাফের মাপকাঠিতে নির্বাচিত ইমামের জন্য নীতি-নির্ধারক গোষ্ঠী কর্তৃক জনগণ থেকে আনুগত্যের শপথ নেওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়'।[১৪]

দ্বিতীয়ত: লেখক সৃষ্টিজগতের সকল কিছুর অধিপতি হিসেবে আল্লাহর দিকে বান্দার কার্যক্রমকে সম্পর্কযুক্ত করা এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য বান্দার জবাবদিহিতা- এ উভয়ের মাঝে লজ্জাজনক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলছেন। আল কুরআনের ভাষায়: "বলো, তুমি (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্রক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। যাকে চাও মর্যাদা ও ইজ্জত দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত ও হেয় করো"।[১৫] এটা হচ্ছে আহলে সুন্নাহ ও অধিকাংশ মুসলিমের অভিমত। আল্লাহর ইচ্ছায়ই সবকিছু হয়ে থাকে। (অবশ্য মু'তাযিলা সম্প্রদায় এর বিপরীর মত লালন করে থাকে।) আহলে সুন্নাহর মতামত হচ্ছে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর নির্ধারিত ভাগ্য মানুষের জবাবদিহিতাকে রহিত করে না। তাইতো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধান আবশ্যক করা হয়েছে, দণ্ডবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে, পুরস্কার ও শাস্তির বিধান জারি করা হয়েছে এবং জান্নাত-জাহান্নামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[১৪] আলী আবদুর রাজ্জাক রচিত "আল ইসলাম ও উসুলুল হুকম", পৃষ্ঠা : ২৪।

[১৫] সুরা আল ইমরান : ২৬।

মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং তাদের নামকরণের বিষয়ে যে কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক দাবি যার কোনো দলিল-প্রমাণ নেই এবং আধুনিক ও প্রাচীন ঐতিহাসিক থেকে শুরু করে ইবনে হায্‌ম, শাহরাস্তানী, বাগদাদী, "ফজরুল ইসলাম ও দুহাল ইসলাম" গ্রন্থের রচয়িতা আহম্‌দ আমীন প্রমুখ যারা ইসলামের বিভিন্ন মাজহাব, দল ও মতবাদ সম্পর্কে লিখেছেন ও বলেছেন তাদের কেউই লেখকের উল্লিখিত দাবির সাথে একাত্মতা পোষণ করেননি।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে খলিফা মা'মুন, মু'তাসিম ও ওয়াসেক প্রমুখের যুগে মু'তাযিলাদের যখন শাসন ক্ষমতা ও দাপট ছিল, তখন তারা জেল-জুলুম ও অত্যাচার-নিপীড়নের মাধ্যমে বিরোধী শক্তির কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। "খালকুল কুরআন" সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের বাড়াবাড়ির কথা ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায়ে হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও বিশিষ্ট ফকিহ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ওপর জুলুম-অত্যাচারের যে রেকর্ড গড়তে তারা সক্ষম হয়েছে ইতিহাসে তা কখনো ম্লান হওয়ার মতো নয়।

তৃতীয়তঃ হজরত উসমানের রা. বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছিল তারা মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ছিল না, তারা ছিল না নীতি নির্ধারক অথবা চিন্তাশীল কোনো ব্যক্তিত্ব; বরং তারা ছিল ওই সকল ব্যক্তি যাদেরকে ঐতিহাসিকগণ উচ্ছৃঙ্খল ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ও আত্মপূজারি দুশমনদের একটি গ্রুপ এদেরকে তাদের হীন স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে অপব্যবহার করেছে। এরা মূলত ওই সকল লোকদের গুটিস্বরূপ ছিল যারা পরবর্তীতে এ দাবি করেছিল যে, শাসন ক্ষমতা ইসলামের সাধারণ নিয়ম থেকে বিচ্যুত হয়ে বিশেষ এক বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যা তারা ঈশ্বরতান্ত্রিক শাসনকার্য পরিচালনার নিমিত্তে বংশানুক্রমে অর্জন করতে থাকবে।

মানসুরের বক্তব্য

মানসুরের উপর্যুক্ত বক্তব্য উক্ত লেখক "আল ইসলাম ও উসুলুল হুকম" গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন যার পাদটিকায় বলা হয়েছে যে, তা ইবনে আবদে রাব্বিহি আল আনদালুসি রচিত "আল আকদুল ফরীদ ফিল আদব" শীর্ষক গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। ড. আবদুল হামিদ মুতাওয়ালী প্রমুখ বলেছেন যে, আরবি সাহিত্যের একটি

গ্রন্থকে ফিক্‌হী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে?[১৬] তর্কের খাতিরে একে মানসুরের বক্তব্য মেনে নিলেও (যদিও কোনো গবেষণা বা স্টাডির মাধ্যমে এমনটা প্রমাণিত হয়নি) সেটা তার নিজস্ব বক্তব্য বৈ অন্য কিছু নয়! এখান থেকে কোনো বিধি-বিধান বা দিকনির্দেশনা নেওয়ার মতো কিছু নেই। আমরা তো মানসুরের সুন্নাত তথা তার রীতি-নীতি অনুসরণ করতে আদিষ্ট নই, তার কথাতো আল্লাহর দ্বীনের বিধি-বিধান প্রণয়নে দলিল-প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। সুতরাং তার কথা প্রত্যাখ্যাত।

আমরা উপর্যুক্ত কথার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতে পারি না অথবা এর নেতিবাচক ভাবটুকু নিতে পারি না; কারণ প্রকৃত সত্য হচ্ছে তার এ বক্তব্য ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। এর কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে: তিনি (শাসক) পৃথিবীতে আল্লাহর শরিয়তেরই প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে তাঁর বিধি-বিধানই বাস্তবায়ন করবেন। তিনি (শাসক) খোদা হয়ে মানুষের ওপর শাসন করবেন অথবা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তার কাছে খোদায়ী লাইসেন্স রয়েছে, এমনটি ভাবার এখানে কোন সুযোগ নেই।

মানসুরের শাসন কিভাবে ঈশ্বরতান্ত্রিক শাসন হতে পারে, অথচ আমরা দেখি মুসলমানদের অনেকেই তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন, আদেশ-নিষেধ করেছেন; এর জবাবে আমি নিস্পাপ ও যাবতীয় ভুল-ত্রুটি থেকে নিষ্কলুষ, আমার সাথে খোদায়ী লাইসেন্স রয়েছে এ জাতীয় কথা তিনি তাদেরকে কখনো বলেননি?

বরং আমরা দেখি তার বিচারপতিদের মধ্যে এমন বিচারকও ছিল যে তার আদেশ অমান্য করে যা সত্য বলে মনে করেছে তাই ফায়সালা দিয়েছে; অথচ মানসুর উক্ত বিচারকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: মানসুর একদা বসরার ক্বাজী সেওয়ার ইবনে আবদুল্লাহ কাছে লিখিত বার্তা পাঠালেন: 'তোমার দরবারে জনৈক সেনাপতি এবং জনৈক ব্যবসায়ীর মাঝে জমি নিয়ে যে মামলা চলছে তুমি তা সেনাপতির নামে দিয়ে দাও'। তখন সেওয়ার তাঁর কাছে জবাবে লিখলেন: 'আমার কাছে দলিল-প্রমাণ যা এসেছে তা দেখে মনে হচ্ছে উক্ত জমি ব্যবসায়ীর হবে; কোনো দলিল-প্রমাণ ব্যতীত আমি তা তার মালিকানা নিয়ে আসতে পারি না'। মানসুর আবার লিখলেন: 'আল্লাহর শপথ! যিনি

---

[১৬] ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, পৃষ্ঠা : ১৯০, দ্বিতীয় সংস্করণ, মানশাআতুল মায়ারেফ, আলেকজান্দ্রিয়া।

ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তোমাকে অবশ্যই তা সেনাপতিকে দিতে হবে'। সেওয়ার লিখলেন: 'আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ব্যতীত আমি তা ব্যবসায়ীর মালিকানা নিয়ে আসতে পারব না'। মানসুর উক্ত বার্তা পাওয়ার পর বললেন: 'আল্লাহর শপথ! আমিতো আদল-ইনসাফে পৃথিবী পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, অথচ আমার বিচারপতিরা আমাকে ন্যায়-ইনসাফ শেখাতে চায়!'

ইবনে আসাকির তাঁর গ্রন্থে নামীর মাদানী থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: একদা মানসুর মদীনায় এলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইমরান আত্ তালাহী তখন মদীনার বিচারপতি ছিলেন এবং আমি তাঁর কাতেব ছিলাম। উটের মালিকরা মানসুরের বিরুদ্ধে কাজীর দরবারে অভিযোগ নিয়ে এলে তিনি আমাকে পত্র লিখে মানসুরকে ডেকে পাঠাতে এবং বাদীদের প্রতি ইনসাফ করতে নির্দেশ দিলেন। আমি এ কাজ থেকে তার কাছে রুখসত আরজ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর আমি পত্র লিখে সীলমোহর দিয়ে তা শেষ করার পর তিনি বললেন: তুমিই এটি নিয়ে মানসুরের কাছে যাবে। আমি তা নিয়ে রাবী'র কাছে গেলে তিনি তা নিয়ে মানসুরের কাছে বেরিয়ে এসে জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন: আমিরুল মুমেনিন তোমাদের কাছে জানাতে চাচ্ছেন যে, আমাকে কাজির দরবারে ডাকা হয়েছে, তোমাদের কেউ আমার পক্ষ নিয়ে দাঁড়াবে না। অতঃপর তিনি এবং রাবী' কাজির দরবারে আগমন করলেন। কাজি তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ালেন না; বরং চাদরমুড়ি দিয়ে অভ্যাসমতো বসে থাকলেন। অতঃপর কাজি বাদীপক্ষকে আহ্বান করলে তারা তাদের দাবি পেশ করল। অতঃপর কাজি খলিফা মানসুরের বিরুদ্ধে তাদের পক্ষেই রায় দিলেন। বিচারকার্য শেষ হওয়ার পর মানসুর ক্বাজীকে বললেন: আল্লাহ তোমার ন্যায়-ইনসাফ ও ধর্মভীরুতার জন্য তোমাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন! আমি পুরস্কার হিসেবে তোমার জন্য দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা বরাদ্দ দিলাম।

আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনউম আল আফরীকি বলেন: খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আবু জা'ফর মানসুর এবং আমি একসাথে পড়াশোনা করতাম। একদিন সে আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেল এবং আমার জন্য খাবার নিয়ে এল যেখানে গোশ্ত ছিল না। তখন সে দাসীকে বলল: ঘরে মিষ্টি জাতীয় কিছু নেই? দাসী উত্তর দিল- নেই। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল: খেজুর আছে কি-না? দাসী পূর্বের ন্যায় নেতিবাচক উত্তর দিলে সে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল এবং তেলাওয়াত করতে লাগল: "শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে খলিফা করবেন; তারপর তোমরা কেমন কাজ করো তা তিনি দেখবেন" (সূরা আরফ, ৭: ১২৯)। খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর একদা

আমি প্রতিনিধি দলের সাথে তাঁর কাছে আগমন করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'উমাইয়া শাসনের তুলনায় আমার শাসন কেমন মনে হচ্ছে?' আমি বললাম: 'উমাইয়া শাসনে যে সকল জুলুম-অত্যাচারের অস্তিত্ব ছিল না, তোমার শাসনে আমি তো দেখতে পাচ্ছি'। সে বলল: 'আসলে উপযুক্ত সহযোগীর অভাবে আমাদের এ অবস্থা হয়েছে'। আমি বললাম: ওমর ইবনে আবদুল আজীজ বলেছেন: 'বাদশাহী বা রাজত্ব হচ্ছে বাজারের ন্যায়, বাজারের চাহিদা ও ভোক্তা অনুযায়ী মালামাল আমদানি হয়ে থাকে, তেমনিভাবে শাসক যদি ভালো ও সৎ হয়ে থাকে তাহলে তার রাজত্বে ভালো ও সৎ লোকদেরই আসা যাওয়া থাকবে। আর সে যদি পাপাচারী হয়ে থাকে তাহলে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পাপাচারীরাই তার রাজত্বে ভিড় জমাবে। এ শোনার পর তাঁর মাথা নিচু হয়ে গেল'।

একদা সে ভাষণ দিচ্ছিল, এমতাবস্থায় তাঁরই একজন প্রজা তাকে খোদাভীতির নসিহত করলে সে বলল: 'মারহাবা! তুমিতো আমাকে এক মহান কথা স্বরণ করিয়ে দিলে এবং মহাবিপদ থেকে সাবধান করলে! ওই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি তাদেরকে যখন বলা হয়: আল্লাহকে ভয় করো তখন তার আত্মমর্যাদাবোধ তাকে পাপের পথে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়!'

আল্লামা সুয়ুতী র. তার "তারীখল খোলাফা" গ্রন্থে এই সকল ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন।[১৭]

এ জাতীয় খলিফা বা শাসক, যাদেরকে খোতবা দেওয়া অবস্থায়ও চ্যালেঞ্জ করা হয়, তাদের ব্যাপারে কি এ দাবি করা যায় যে, তারা খোদায়ী অধিকারের দোহাই দিয়ে ঈশ্বরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল?

খলিফা মানসুরের নাতি প্রসিদ্ধ আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের জন্য প্রণীত ইমাম আবু ইউসুফের র. "আল খারাজ" গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে এবং এর মধ্যে কুরআন-হাদিস থেকে শুরু করে যে সকল অসিয়ত ও বিধি-বিধান রয়েছে এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে সকলের কাছে সুস্পষ্ট হবে যে আব্বাসীয়রা মূলত তথ্য সন্ত্রাসের শিকার এবং তাদের সম্পর্কে যে অপবাদ ও মিথ্যাচার করা হয় তা থেকে তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ।

মূলত খোদায়ী শাসন ও ঈশ্বরতন্ত্রের দাবি ইসলামি শরিয়তে ও চিন্তাধারায় এবং ইসলামের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন এক জিনিস, ইসলামি অনুভূতিতে এর কোনো

---

[১৭] দেখুন : সুয়ুতী প্রণীত তারীখুল খোলাফা, খলিফা মানসুরের জীবনকাল, পৃষ্ঠা : ২৪১-২৫৩, দারুল ফিক্র - বৈরুত কর্তৃক মুদ্রিত।

স্থান নেই। মুসলমানদের ইতিহাসে কার্যত এ জাতীয় রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইরানী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা

এ জাতীয় লোকেরা যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে হট্টগোলে লিপ্ত (যদিও তা দু'শব্দের অতিরিক্ত হবে না যা বিভিন্ন উপলক্ষে বলা হয়ে থাকে এবং মুসলিম জাতির চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে অনুসন্ধান করে এর থেকে অতিরিক্ত কিছু বের করা সম্ভব হয়নি) তা এড়িয়ে গিয়ে আমরা যদি বর্তমানের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখি তারা তাদের দাবির পক্ষে দলিল-প্রমাণ হিসেবে ইরানের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এবং তাদের ভাষায় সেখানকার 'আয়াত' অথবা 'মালালি'র শাসন ব্যতীত অন্য কিছু খুঁজে পায়নি।

ইনসাফের সাথে কেউ অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারবে যে ইরানের পরিস্থিতিকে এখানে দলিল-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা কতিপয় দিক থেকে সঠিক নয়:

- ইরানের শাসনব্যবস্থা শিয়া মাজহাবের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত বা আহলে সুন্নাহ তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মাজহাবের সাথে রীতিমতো সাংঘর্ষিক।
- শাসনব্যবস্থায়, আকিদা-বিশ্বাসে ও জীবন-জগত পরিচালনার বিধি-বিধানে শিয়া মাজহাবের গতিপথ ইসলামের সাধারণ চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। উভয়ের মাঝে বৈপরীত্যের বিষয়টি সুস্পষ্ট।
- ইমামাতের বিষয়টি তাদের নিকট আকিদা-বিশ্বাস ও মৌলিক বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আহলে সুন্নাতের নিকট তা আকিদা-বিশ্বাস নয়; বরং আমলী বিধি-বিধান ও যৌগিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।
- ইমামতের মূল তাদের কাছে শরিয়াহভিত্তিক এবং আমাদের কাছে এর মূল হচ্ছে মনোনয়ন বা নির্বাচন।
- তাদের দৃষ্টিতে ইমাম নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ: কিন্তু আমাদের কাছে ইমাম মানুষেরই একজন, তার থেকে ভুল-সঠিক উভয়টি সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক। সে যেমন সঠিক কাজ করতে পারে তেমনিভাবে ভুলও করতে পারে।
- তাদের কাছে ইমাম এমন মর্যাদায় পৌছতে সক্ষম হয় সেখানে কোনো নৈকট্যবান ফেরেশতা অথবা আল্লাহর প্রেরিত নবিরাও পৌছাতে সক্ষম হয় না। কিন্তু আমাদের কাছে ইমামের পরিচিতি হচ্ছে যা সিদ্দীকে আকবরের কথায়

ফুটে উঠছে: 'আমাকে তোমাদের শাসনকর্তা বানানো হয়েছে অথচ আমি তোমাদের থেকে কোনো অংশেই উত্তম নই'। এমনিভাবে ওমর ইবনে আবদুল আজীজের কথায়ও ইমামের পরিচিতি এসেছে, তিনি বলেন: 'আমিতো তোমাদেরই একজন; কিন্তু আল্লাহ্ আমার মাথায় তোমাদের থেকে বেশি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন'।

- তাদের দৃষ্টিতে যেমনিভাবে ইমাম নিয়োগ দেওয়া যায় না তেমনিভাবে তাকে অপসারণ করারও কারো অধিকার নেই। কিন্তু আমাদের কাছে জনগণই ইমাম নির্বাচন করে থাকে তেমনিভাবে তারাই ইমামের অপসারণের অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে।

তাদের এ মূলনীতি আকিদা-বিশ্বাস ও শরিয়তের বিধান হিসেবে তাদের নিকট স্বীকৃত ও সমাদৃত। কিন্তু ইরানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর ওপর এ গুণ প্রযোজ্য হবে কি-না, তারা নিষ্পাপ ইমামের সারিতে গণ্য হবে কি-না, অন্যথায় নিষ্পাপ ইমামের এ ব্যাপারটি বিগত বার যুগে দ্বাদশতম ইমাম অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর ইতিহাসের একটি গতিহীন বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে কি-না, যার দ্বারা অনেক পূর্বেই রুদ্ধ হয়ে গেছে?

এ ব্যাপারে ইরানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বক্তব্য কি, তাদের সংবিধান কি বলে আর তাদের বাস্তবতাই বা কোন দিকে ইঙ্গিত করে থাকে? খোমেনী কি ওই সারির ইমাম নয় যাদের ব্যক্তিসত্তা ও কার্যক্রমকে নিষ্কলুষ ও নিষ্পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়?

এ সকল প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও লেখক অধ্যাপক ফাহমী হুয়াইদী, যিনি বেশ কয়েকবার ইরান সফর করেছেন, তাদের বিশেষ ব্যক্তিত্বদের সাথে মিলিত হয়েছেন এবং সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি অধ্যয়ন করেছেন সেক্যুলারিজমদের তল্পিবাহকদের প্রচার-প্রপাগান্ডা ও মিথ্যাচারের জবাবে তিনি উল্লেখিত প্রশ্নাবলীর উত্তর সম্বলিত "ঈশ্বরতান্ত্রিক শাসনের মিথ্যাচার" শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলেন:

তারা (সেক্যুলাররা) সর্বদা ইসলামি রাষ্ট্রের নমুনা হিসেবে আমাদেরকে ইরানের বিপ্লবের অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে বুঝাতে চায় যে, সেখানে যা চলছে তাই হচ্ছে ঈশ্বরতান্ত্রিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত যা কতিপয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাব যে তা দু'দিক থেকে নির্বুদ্ধিতা ও বাড়াবাড়ি মুক্ত নয়:

প্রথমত : শিয়াদের অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলা হচ্ছে, তাদের দৃষ্টিতে ফকিহ্ তথা ইসলামি আইনবিদরাই শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারবে এবং ইরানের শাসন ব্যবস্থা মূলত এ মূলনীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। অথচ মুসলিম বিশ্বের তিন চতুর্থাংশ জনশক্তি হচ্ছে আহলে সুন্নাহ। ইমামাতের বিষয়ে উভয় মাজহাবের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক ব্যবধান রয়েছে। শিয়াদের কাছে এটি আকিদা-বিশ্বাসের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত, এর বিপরীতে আমাদের তথা আহলে সুন্নাহর দৃষ্টিতে এটি মূলনীতি নয়; বরং আংশিক ও পরিপূরক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত : ইরানের বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে তাদের কেউ কখনো খোদা প্রদত্ত বা ঈশ্বরতান্ত্রিক বলে দাবি করেনি। মূলত এ জাতীয় দাবির পক্ষে একটিমাত্র বিষয় ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানকার শাসনকার্য ফিকহ্ তথা ইসলামি ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে পরিচালিত হতে দেখে অনেকে একে ঈশ্বরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলে মনে কওে থাকেন। অথচ ধর্মীয় কারণে নয়; বরং নিরেট রাজনৈতিক কারণেই সেখানে এটি চলছে। আমরা যদি একটু স্মরণ করতে চেষ্টা করি দেখতে পাব, সেখানকার বিপ্লবের নিয়ন্ত্রণ সর্বপ্রথম রাজনীতিবিদ এবং বেসামারিক নাগরিকদের মাঝেই ছিল। ইঞ্জিনিয়ার 'বাযারগান' প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থনীতিবিদ আবুল হাসান বনী সাদ্র প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। এরপর তরুণ নেতৃত্বে মনে করল যে, ফকিহদের হাতে বাস্তবায়ন নয়; শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ন এবং দিক-নির্দেশনার ভার থাকবে। কতিপয় কারণে উভয় গ্রুপের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত মজবুত না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ফকিহ্ তথা ইসলামি ব্যক্তিত্বরা শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করল, তবে তা খোদার প্রতিনিধি বা পুরোহিত সম্প্রদায় হিসেবে নয়; বরং নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হিসেবে তারা এ দায়িত্বভার গ্রহণ করল, যা রাজনীতির সমসাময়িক পরিভাষায় এবং বিপ্লবোত্তর সকল শাসনব্যবস্থায় পরিচিত ও প্রচলিত একটি বিষয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে শিয়াদের ইমামিয়া সম্প্রদায় বাস্তবিকভাবেই তাদের ইমামদেরকে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ মনে করে থাকে; কিন্তু তা হচ্ছে শুধুমাত্র নবির সা. বংশধরদের জন্য, বিশেষ করে ফাতিমা ও হুসাইন রা. এর কথা উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও তারা আরো বার জন ইমামের সন্ধান পেয়েছেন যাদেরকে তারা নিষ্পাপ মনে করে থাকে, যারা সরাসরি শাসনকার্য পরিচালনা করেনি এবং তারা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয়; বরং আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবেই তাদের কাছে সমাদৃত। অতঃপর তাদের শেষজন প্রায় বার শতাব্দী পর্যন্ত আত্মগোপন করেছিলেন। শিয়াদের ধর্ম বিশ্বাসে অনুপস্থিত ইমামের অস্তিত্ব রয়েছে। তাদের অনুপস্থিতকালীন সময়ে যে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে তাকে তারা প্রকৃত ইমামের প্রতিনিধি

হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাদের কাছে তার মর্যাদা রয়েছে; কিন্তু তাকে তারা নিষ্পাপ মনে করে না, যা দ্বাদশতম ইমামের তিরোধানের সাথে সাথে রহিত হয়ে গেছে। ইরানের বর্তমান রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা এ ধারায় চলছে। আয়াত উল্লাহ আলী খামিনীর প্রকৃত উপাধি হচ্ছে "নায়েবুল ইমাম" তথা ইমামের প্রতিনিধি; কিন্তু হয়তোবা বলতে সহজ হওয়ার কারণে অথবা সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে তিনি ইমাম হিসেবেই পরিচিত হয়ে গেছেন। তারা সরকার বিরোধী দলকে আল্লাহর দুশমন হিসেবে গণ্য করে না; বরং তা শাসনব্যবস্থার শত্রু হিসেবে তারা গণ্য করে থাকে। শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক বড় বড় ফকিহ রয়েছেন যারা ফকিহদের মধ্যেই শাসন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকার বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন, যা হচ্ছে খোমেনী শাসনের মূলভিত্তি এবং তারা কাউক 'কাফির' বলা বা কাউকে তার মতামতের কারণে ধর-পাকড় করা ইত্যাদি সমর্থন করেন না। সরকারের মন্ত্রীদেরকে সেখানকার মজলিশে শুরার সামনে কঠিন হিসেবের সম্মুখীন হতে হয়, কোন দিক থেকে কেউ তাদেরকে প্রোটেকশন দিতে পারে না। ১৯৮৪ সালের গ্রীষ্মকালে সেখানকার মজলিশে শুরা একসাথে সাতজন মন্ত্রীকে বহিষ্কার করে এবং তাদের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সনদ ফিরিয়ে নেওয়া হয়। সংবিধান মোতাবেক সেখানকার নায়েবে ইমাম (রাষ্ট্রের পরিচালক) নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে না। এমনিভাবে রাষ্ট্রপ্রধানও গণ লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তাই এখানে এ দাবি করার কোনো সুযোগ নেই যে, ইরানের শাসন ব্যবস্থা মূলত খোদাপ্রদত্ত বা ঈশ্বরতান্ত্রিক শাসন হিসেবেই পরিচালিত হয়ে থাকে।

তাই ইরানের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা তাদের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি, আন্দোলন, জনগণ এবং নেতৃত্ব ইত্যাদির বিচারে একান্তই তাদের জন্য সংরক্ষিত। এর ওপর অন্য কিছুকে অনুমান (কিয়াস) করা যাবে না বলে তাদের ইসলামি আইনবিদগণও মতামত ব্যক্ত করেছেন। এর ওপর ভিত্তি করে আহলে সুন্নাহকে ঘায়েল করার কোনো চেষ্টা করা অথবা একে তাদের বিপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা পুরোটাই অরণ্যে রোদন ব্যতীত অন্য কিছু হবে না। সুতরাং ইরানের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থা মূলত গণতান্ত্রিক।*

আবেদন বিহীন-কতিপয় বিষয়

আমি আমার কতিপয় গ্রন্থে বিশেষ করে "মৌলিকতা ও আধুনিকতার সমন্বয়ে আরবীয় ইসলামি সংস্কৃতি"[১৮] শীর্ষক গ্রন্থ উল্লেখ করেছি যে, কতিপয় বিষয় এমন

* (সম্পাদক)

[১৮] পৃষ্ঠা : ১৬৪-১৭০, ওয়াহবা লাইব্রেরী কর্তৃক মুদ্রিত।

রয়েছে যেগুলো এখন বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণার সুযোগকে নিঃশেষ করে দেয়। তাছাড়া এ জাতীয় বিষয়গুলোতে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে, সত্য এখানে দিবালোকের মতো উজ্জ্বল এবং সকল দৃষ্টিবানের সামনে তা দৃশ্যমান।

এ সকল বিষয়ে পুনরায় কথা বলা এবং এর আবর্তে ঘুরতে থাকা পুরোটাই এখন নিষ্প্রয়োজন ও নিষ্ফল। বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের সময়, চেষ্টা-সাধনাকে চিন্তা-গবেষণা, গভীর অধ্যয়ন ও পারস্পরিক সহযোগিতায় নিয়োজিত হওয়া। সমাধানকৃত বিষয়ে পুনরায় কথা বলা এবং অর্জিত বস্তু আবার অর্জনের চেষ্টা করার মাধ্যমে আমাদের জীবনের মূল্যবান অথচ সংক্ষিপ্ত সময়গুলো ব্যয় করার যৌক্তিকতা কোথায়?

রাষ্ট্র অথবা ধর্মীয় কর্তৃত্বের ইস্যু

যে সকল বিষয়গুলোর আলোচনা এখন বন্ধ হয়ে হওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ইসলাম ও ধর্মীয় রাষ্ট্র, ঈশ্বরতন্ত্র অথবা ধর্মীয় কর্তৃত্ব সংক্রান্ত আলোচনা।

"ইসলাম এবং ধর্মীয় কর্তৃত্ব" শিরোনামে এ লড়াই ইমাম আবদুহু এবং "আল জামেয়া" সাময়িকীর প্রধান ফারহ আনতুনের মাঝে শুরু হয়েছিল। ইমাম আবদুহু রা. এ বিষয়ে সিদ্ধান্তমূলক রায় দিয়েছে, এমনকি তিনি ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও এর ভিত্তি মজবুত করা নয়; বরং এর ধ্বংস সাধন ও পরিবর্তন করাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার গোড়া মজবুত করার ক্ষেত্রে ইসলামের ছয়টি মূলনীতিতে স্থান দিয়েছেন। তারপরও সময়ে সময়ে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য শুনতে পাওয়া যায়, মনে হয় যেন এটি একটি নতুন বিষয়।

উস্তাদ ইমাম আবদুহু দৃঢ়তার সাথে বলেছেন: 'ইসলাম সফলভাবে এ ধরনের কর্তৃত্ব সমূলে বিনাশ করতে ও এর নিদর্শন মুছে দিতে সক্ষম হয়েছে; এমনকি অধিকাংশ মুসলিমের স্মৃতি থেকে এর নাম-ধামও বিলীন হয়ে গেছে। আল্লাহ ও রসুল স. ব্যতীত অন্য কেউ কারো আকিদা-বিশ্বাসের ওপর কর্তৃত্ব খাটাবে, ইসলাম কখনো এমনটির স্বীকৃতি দেয়নি। ইসলামে এমন কোনো সুযোগ নেই যে, ধর্মের নামে কেউ কাউকে বন্দি করে রাখবে বা প্রয়োজনে মুক্তি দিবে; বরং ঈমান একজন মুমিনকে এক আল্লাহ ব্যতীত সে ও তাঁর মাঝে বিদ্যমান যাবতীয় বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্ত করে নেয়। এক মুসলিমের জন্য (ইসলামে তার মর্যাদা যত কমই হোক না কেন) অপর মুসলিমের (ইসলামে তার মর্যাদা যত বড়ই হোক না কেন) সহমর্মিতা, কল্যাণকামিতা ও পরামর্শ দেওয়া ব্যতীত অন্য কোনো অধিকার নেই'।

শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান সম্পর্কে ইমাম আবদুহু বলেন: ইসলাম ধর্ম কোনো ব্যক্তিকে কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে বা ইসলামের বিধি-বিধান জানার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো মর্যাদায় ভূষিত করেনি। এর মাধ্যমে তাকে কোনো উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করা হয় না; বরং সেও অন্যান্য সকল সচেতন ব্যক্তি সমান পর্যায়ভুক্ত। তবে সে তার প্রখর বুদ্ধিমত্তা, গভীর ধী-শক্তি ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা ইত্যাদি কারণে অন্যান্যদের ওপর প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ততা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তদুপরি সে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের সঠিক পথ আঁকড়ে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অনুসরণীয় ও আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। মুসলমানরা তার প্রতিটি কার্যক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখে, সে যদি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বক্র পথ অবলম্বন করে তাহলে তাকে সুপরামর্শ ও সৎ উপদেশ ইত্যাদির মাধ্যমে সোজা করে দেওয়া হয়; অন্যথায় তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া হয়। স্রষ্টার নাফরমানী হয় এমন কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা যায় না। শাসক যদি তার কার্যক্রমে কুরআন-হাদিস অনুসরণ না করে তাহলে তাকে পরিবর্তন করে অন্য একজনের হাতে আনুগত্যের বাইয়াত গ্রহণ করা মুসলমানদের ওপর আবশ্যক। জনগণই তাদের রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত বা নির্বাচিত করে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে তারাই হচ্ছে মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী। আবার তারাই যদি কল্যাণ মনে করে তাহলে তাকে অপসারণ করে অন্য একজনের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে পারে। সর্বোপরি সার্বিকভাবে সে একজন বেসামরিক ও নাগরিক শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান।[১৯]

এমনিভাবে পরবর্তিতে ইমাম আবদুহুর অনুরূপ কথা বলেছেন সে সময়কার মিশরের গ্রান্ড মুফতি, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখ মুহাম্মদ বাখীত আল-মাতি'য়ী। "আল ইসলাম ও উসূলুল হুক্ম" গ্রন্থের প্রতিউত্তর দিতে গিয়ে তিনি এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আরো দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উল্লেখিত গ্রন্থের প্রতিউত্তর দিতে গিয়ে অনুরূপ বক্তব্যই পেশ করেছেন, তারা হলেন তিউনিসিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ তাহের ইবনে আশুর এবং মিশরের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও আল-আজহারের সাবেক রেক্টর মুহাম্মদ আল-খিজির হুসাইন।

এ ছাড়াও পরবর্তীতে বিশাল এক সংখ্যক উলাম-মাশায়েখ, আইনবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারাই শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে কলম ধরেছেন তাদের সকলেই উল্লেখিত বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।[২০]

---

[১৯] দেখুন : ইমাম আবদুল্লাহর রচনা সমগ্র : ৩/২৮৫-২৮৭।

[২০] যারা এর উপর কলম ধরেছেন তাদের রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করুন: উদাহরণ হিসেবে তাদের কতিপয়ের নাম উল্লেখ করছি: মুহাম্মদ ইউসুফ মুছা, মুহাম্মদ সাদিক আরজুন,

এই ধরনের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও সিদ্ধান্তমূলক লেখনী সত্ত্বেও এখনো সময়ে সময়ে পাশ্চাত্যের তাবেদার গোষ্ঠী (ডান-বাম সবাই) এই বিষয়ে তাদের পুরানো চর্বিত চর্বন করতে থাকে।

সর্বশেষ যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, আল আহরামের পাতায় মুদ্রিত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত অধ্যাপক মাহমুদ আমিন আল-আলম লিখিত "রাজনৈতিক ইসলাম ও ক্ষমতা" শীর্ষক প্রবন্ধ। তিনি যা লিখেছেন: "এখানে আমরা মধ্যমপন্থী ইসলাম", "গোঁড়া ইসলাম" ও "সন্ত্রাসী ইসলাম" নামে বিভিন্ন চিন্তাধারায় বিভক্ত কতিপয় দল ও জনগোষ্ঠী দেখতে পাই। উল্লেখ্য যে এ ধরনের ভিন্নতা ও চিন্তার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে কিন্তু সবার অবস্থান এক ও অভিন্ন এবং তা হচ্ছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এদের সকলেই ধর্মীয় কর্তৃত্ব তথা ধর্মীয় পুরোহিত শাসন প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ এবং এটাই হচ্ছে সবার আহ্বানের মূল সুর। এর শুধু শরিয়তের বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন বা এর প্রতি মানুষকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না; বরং সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে শুরু করে জগত সংসার পরিচালনার প্রতিটি বিভাগকে ইসলামিকরণ তথা ধর্মীয় ক্ষমতায়ন করার ব্যাপারেও তাদের আহ্বান সুস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, এদের অনেকেই আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও ইসলামিকরণ করতে চায়। এ ক্ষেত্রে সমাজ বিজ্ঞান বা এ জাতীয় বিষয় শুধু নয়; বরং পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের মতো সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও তাদের এ আহ্বানের আওতা বহির্ভূত নয়"।[২১]

আমরা বারংবার এ কথা বলে ও লিখে যাচ্ছি এবং আরো অনেকেই তা করে যাচ্ছেন যে, পাশ্চাত্য সমাজের পরিচিত ঈশ্বরতন্ত্র ও পুরোহিত শাসনের ন্যায় ইসলাম এ জাতীয় ধর্মীয় কর্তৃত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই এবং ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে এ জাতীয় কোনো দাবিও করে না; বরং ইসলামের দাবি হচ্ছে সর্বস্তরে আল্লাহ্ প্রদত্ত শরিয়তের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, এ অর্থে যে তা হবে নাগরিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যা

হাসানুল বান্না, আবদুল কাদির আউদাহ, সাইয়্যেদ কুতুব, মুহাম্মদ আল গাজালী, মুহাম্মদ সালিম আল আওয়া, মুহাম্মদ আবু ফারেছ এবং আবদুল হালিম মুতাওয়ালী প্রমুখ। কালিদ মুহাম্মদ খালিদ তার পূর্বলিখিত "এখান থেকে শুরু করছি" শীর্ষক বক্তব্যের জন্য ওজর পেশপূর্বক ক্ষমাপ্রার্থনা করে "ইসলামে রাষ্ট্রনীতি" শিরোনামে যা লিখেছেন তাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

[২১] দেখুন : আল আহরাম, ৯/১২/১৯৯২ সংখ্যা, "বুদ্ধিজীবীদের সন্ত্রাসী ও উগ্রপন্থী চিন্তাভাবনা" শীর্ষক পৃষ্ঠা। অধ্যাপক ফাহমী হুয়াইদী ১৫/১২/১৯৯২ সংখ্যায় তার সাপ্তাহিক প্রবন্ধে এর উপর মন্তব্য লিখেছেন যার শিরোনাম ছিল : "ভুলক্রমে আমরা যাতে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ি"।

জাতির নাগরিকদের নির্বাচন বা মনোনয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইসলামি শরিয়াহই হবে এর যাবতীয় মূলনীতি, দিক-নির্দেশনা এবং স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রসহ সকল নীতির মূলভিত্তি।

কিন্তু অধ্যাপক আলম সাহেবরা তা মেনে নিতে রাজি নয়। সমজ ও রাষ্ট্র থেকে শুরু করে জগত সংসারের যাবতীয় বিভাগে ইসলামের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার আহ্বান তাদের কাছে খুবই অপছন্দনীয়! এ ধরনের আহ্বানকে তারা ইসলামের নতুন এক সংস্করণ বলে মনে করেন, তাদের ভাষায় যার নাম হচ্ছে: "রাজনৈতিক ইসলাম"। তারা ইসলামকে মানবজীবনে কি অবস্থায় দেখতে চায়? যদি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামি বিধি-বিধানের কোনো স্থান না থাকে তাহলে মানবজীবনে ইসলামের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা এবং ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়নের দাবিরই বা কি অর্থ থাকল?

পণ্ডিত আলম ও তার সহযোগীরা মার্কসবাদের সুদিনে সমাজ ও রাষ্ট্রকে মার্কসীয়করণের দাবি করেছেন এবং এ পদে খুবই সচেষ্ট ছিলেন। তাহলে কেন তারা ইসলামকে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষক ও দর্শকের ভূমিকায় দেখতে চান? তারা কি মনে করে যে ক্ষমতা, রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি ইত্যাদিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও গতিপথের পরিবর্তন হয়, কখনো ডান দিকে আবার কখনো বাম দিকে; কিন্তু এখানে ইসলামের নীতি পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নেই!

কেন তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইসলামিকরণে বিরোধিতা করেন?[২২] কেনই বা সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদিকে ইসলামিকরণ তাদের এত অপছন্দ? এর দ্বারা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচারের ইসলামিকরণ ইত্যাদিই তো বুঝানো হয়। সভ্যতা-সংস্কৃতির ইসলামিকরণ অর্থ হচ্ছে : পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দাপট ও কর্তৃত্ব থেকে একে মুক্ত করে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিম জাতির মৌলিকত্ব ও এর পরিচয় বহনকারী সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্ম দেওয়া। এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে কোনো জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তার সংস্কৃতি ও তার সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর গঠন সে জাতির সমাজ বিজ্ঞান বা সামাজিক বিষয়াদির সাথেই অধিকতর সম্পৃক্ত।

---

[২২] দেখুন : ওয়াশিংটনস্থ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক থ্যট কর্তৃক মুদ্রিত মরহুম ড. ইসমাঈল ফারুকী, ড. আবদুলহামিদ আবুসুলাইমান, ড. ইমাদুদ্দিন খলিল ও ড. তাহা জাবির আল-আলাওয়ানী প্রমুখ লিখিত "ইসলামাইজেশন অফ থ্যট" সম্পর্কে রচনাসমগ্র।

কোনো জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির ইসলামিকরণের দাবি হচ্ছে এর মানবিক ও সামাজিক বিষয়াবলীর পুনর্বিবেচনা করা। এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ যেমনি করা যাবে না তেমনি আবার এর সকল কিছু গ্রহণীয় নয় বলে এড়িয়েও যাওয়া যাবে না; বরং পাশ্চাত্যের সামাজিক ও তদসংশ্লিষ্ট পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং এর আদর্শিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং মৌলিক নিয়ম-নীতি ইত্যাদির আলোকে একে অবাক দৃষ্টিতে না দেখে বুদ্ধিমত্তা, আত্মবিশ্বাস ও মুক্তচিন্তা নিয়ে এর প্রতিটি দিক অধ্যয়ন করতে হবে। অতঃপর অতিভক্তি অথবা আধুনিকতা-প্রীতি থেকে দূরে অবস্থান করে বিষয়ভিত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধ্যয়নের মাধ্যমে যা গ্রহণীয় তা গ্রহণ করতে হবে এবং যা বর্জনীয় তা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। এমনিভাবে কতিপয় বিষয়াবলীকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে আবার কতিপয় বিষয়াবলী প্রত্যাখ্যাত হবে।

এভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে আরবীয় ইসলামি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা হবে, যা পাশ্চাত্যের বিতর্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। শুধুমাত্র নামকরণের মাধ্যমে এ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জন্ম নিবে না; বরং বিরামহীন চিন্তা-গবেষণা, গভীর অধ্যয়ন ও অধ্যবসায় ইত্যাদির মাধ্যমেই জন্ম নিতে পারে কাঙ্ক্ষিত মানের এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা সময়ের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সগৌরবে সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে।

কিন্তু পদার্থ ও রসায়ন ইত্যাদিকে কেউ ইসলামিকরণের দাবি করে থাকে এমনটি আমার জানা নেই। যদি এরপর হয়ে থাকে তাহলে এ জাতীয় দাবির সারমর্ম হচ্ছে, যা আমরা ইতঃপূর্বে ইঙ্গিত করেছি, যে এর মাধ্যমে সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের যোগসূত্র স্থাপন করা, এ অর্থে যে এ জগত সংসার আল্লাহরই সৃষ্ট, এ পরিচালনায় তাঁর রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি যা কখনো পরিবর্তন হয় না এবং এখানে যা কিছু ঘটে থাকে তা যুগপৎ বা অকস্মাৎ সংঘটিত কোনো বিষয়ে নয় অথবা নয় প্রকৃতির কোনো মু'জেযা; বরং তা হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তার কাজ যিনি সুনিপুণ ও সুনির্ধারিত নিয়মে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদিকে বুঝানো হয়ে থাকে। এমনিভাবে এর মাধ্যমে এটিও বুঝানো হয় যে এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান মানবতা বিধ্বংসী কাজে ব্যবহার না করে কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা। সংক্ষেপে এ জাতীয় দাবির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে আকিদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকে ইত্যাদির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে।

এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা পদার্থ ও রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি থেকে উপকৃত হওয়ার পর কেউ যদি এমনটি বলে থাকে যা সুলাইমান আ. বলেছিলেন যখন আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান বহনকারী তার একজন সভাসদ চোখের পলকে রানি বিলকিসের সিংহাসন

উঠিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল, তাহলে এতে এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষতি হওয়ার কি আছে? সুলাইমান আ. তখন বলেছিলেন: "এটি আমার প্রতিপালক প্রদত্ত মর্যাদা ও মেহেরবাণী, এর মাধ্যমে মূলত আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে; আমি কি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হব না তাঁর নাফরমানী করব?"[২৩] অথবা যুল ক্বারনাইন বাদশাহ বাঁধ দেওয়ার পর যা বলেছিলেন, কেউ যদি এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার পর অনুরূপ বলে থাকে তাহলে এতে এ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষতি হওয়ার কি আছে? তিনি বলেছিলেন: "এটি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া ও মেহেরবাণী মাত্র"।[২৪]

মনে হচ্ছে লেখক তার কল্পনায় সমাজ, রাষ্ট্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ক্ষমতা ইত্যাদির ইসলামিকরণের সাথে মধ্যমপন্থী সহনশীল ইসলামি আন্দোলনগুলোর দাবি ও আহ্বানের কোনো প্রকার সম্পর্ক খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, ইসলামি রেঁনেসার জগতে যার শিকড় অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত এবং যুগ যুগ ধরে অত্যন্ত সুপ্রাচীন ও সুপরিচিত।

লেখক যে সকল ইসলামি আন্দোলনগুলোর উল্লেখ করেছেন এবং যেগুলোকে সহনশীল, গোঁড়া ও পক্ষপাতদুষ্ট এবং সন্ত্রাসী ইত্যাদি গুণে (!) গুণান্বিত করেছেন, এর সবগুলোকে একই কাতারে রেখে এগুলোর মাণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করা মূলত কতিপয় ভিন্ন ও বৈচিত্রপূর্ণ বিষয়কে সমপর্যাভুক্ত করারই নামান্তর। লেখক প্রদত্ত শিরোনামই এর ওপর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সেক্যুলারিজমের ইস্যু

ড. কামাল আবুল মায্দ "ইসলাম ও আরববাদ" শীর্ষক সেমিনারে যে সকল বিষয়গুলোর ওপর আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা-গবেষণা এখন বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন এরমধ্যে সেক্যুলারিজমের ইস্যুটি উল্লেখযোগ্য, যা সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার প্রতি আহ্বান জানায়। এটি আমাদের ভূমি থেকে উদ্ভূত নয়, বরং অমুসলিম জাতির মধ্যেই এমন পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে এর জন্ম, ইসলামের ইতিহাসে যার কোনো নজির নেই।

পশ্চিমা জগত মূলত সেক্যুলারিজমের আশ্রয় নিয়েছে তাদের পুরোহিত পাদ্রিদের কর্তৃক পরিচালিত গীর্জার শাসন ঠেকানোর জন্যই, যা চিন্তা-গবেষণার পরিবর্তে

[২৩] সুরা নামল ২৭: ৪০।

[২৪] সুরা কাহাফ ১৮: ৯৮।

স্থবিরতা, জ্ঞানের বিপরীতে মূর্খতা, জনগণের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠী এবং এর গরিব মেহনতী ও খেটে খাওয়া মানুষের পরিবর্তে ধনী ও সামন্তশ্রেণি ইত্যাদির সাথে একাত্মতা পোষণ করেছিল।

আমাদের ইতিহাসে পুরোহিত, পাদ্রি, পোপ ও পবিত্র পোপ মুকাদ্দাস পিতা ইত্যাদির কোনো অস্তিত্ব নেই! নেই ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নামক কোনো পরিভাষা, যারা দাবি করে তাদের যাবতীয় কাজকর্ম আসমান থেকে অনুমোদিত।

সেক্যুলারিজমের ওপর লিখতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে, পাশ্চাত্যে ইহা জন্ম নেওয়ার দার্শনিক ব্যাকগ্রাউণ্ড রয়েছে যার সূচনা এরিস্টোটলের যুগ থেকে হয়েছিল, তার থিওরি ছিল এ জগত সংসারের সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই, তিনি এর কোনো কিছু সম্পর্কে অবগত নন এবং এর পরিচালনার তিনি কোনো ভূমিকা রাখেন না। এছাড়াও এর রয়েছে ধর্মীয় ব্যাকগ্রাউন্ড যেখানে জগত সংসার পরিচালনায় আল্লাহ ও কায়সার তথা শাসকগোষ্ঠীর মাঝে সুস্পষ্ঠ ও দৃঢ়তার সাথে এক বিভাজন রেখা টেনে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহর প্রাপ্য আল্লাহকে এবং কায়সারের প্রাপ্য কায়সারকে দিতে বলা হয়েছে।

কিন্তু আমাদের ধর্ম, জাতীয় চিন্তাধারা ও জাতীয় স্বার্থ ইত্যাদির বিপরীতে সেক্যুলারিজমের অবস্থান। আকিদা যদি দিক-নির্দেশক এবং শরিয়াহ যদি শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাহলে জাতির প্রত্যেক জনশক্তি যে বিশাল এক শক্তির অধিকারী হতে সক্ষম হবে সেক্যুলারিজম জাতিকে এ শক্তি থেকে শুন্য করতে চায়।

কতিপয় ইসলামি রাষ্ট্র উন্নত বিশ্ব ও সভ্য সমাজের কাতারে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা হিসেবে সেক্যুলারিজমকে আলিঙ্গন করেছিল এবং জেল-জুলুম, নির্যাতন-নিপীড়ন ইত্যাদির মাধ্যমে জাতির ঘাড়ে তা চাপিয়ে দিতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি, তারা কি সত্যিকারভাবে উন্নত ও সভ্য হতে সক্ষম হয়েছিল?

আতাতুর্কের তুরস্ক এর উৎকৃষ্ঠ প্রমাণ, জীবনের প্রতিটি বাঁকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণই ছিল যার একমাত্র ব্রত। মাথার টুপি নিষিদ্ধ করে হ্যাট চালু করা হয়েছিল এবং হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার আইনসহ পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে শরিয়তের অকাট্য ও সুস্পষ্ট বিধি-বিধানকে অকেজো করে রাখা হয়েছিল। জাতির কয়েক প্রজন্মকে যুগ যুগ ধরে নিজের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে পুরোপুরি দূরে রাখা হয়েছিল এমনকি তুরস্কে প্রচলিত আরবি বর্ণমালার পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণমালা চালু করা হয়েছিল। মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে আরবদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছিল, এমনকি অবশেষে আরবিয় ভাষায় আজান দেওয়াকে আইনগত অপরাধে গণ্য করা হয়েছিল।

এর ফলাফল কি ছিল?

ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা, বিধি-বিধান, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদি বিলুপ্ত করার পরও তুরস্কের মাটি থেকে ইসলামকে সমূলে উৎখাত করা সম্ভবপর হয়নি। জাতির অধিকাংশ জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে তাদের শিকড়, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আকিদা-বিশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে তাদের ওপর চেপে বসা শিকড়হীন বর্তমান বাস্তবতার সাথে সংঘাত করে জীবনাতিপাত করে আসছিল।

অবশেষে সেক্যুলারিজম তুরস্কের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল এভাবে যা এক একজন তুর্কী লেখিকার কলমে এভাবে ফুটে উঠেছে: "আমরা প্রাচ্যের প্রথম সারির রাষ্ট্র ছিলাম, অবশেষে আমার পাশ্চাত্যের সর্বশেষ সারির রাষ্ট্রে পরিণত হলাম"।

বরং পাশ্চাত্যরাও তাদের দলে ভিড়তে তুরস্কের প্রাণান্তকর চেষ্টা-সাধনা সত্ত্বেও তাকে তাদের দেহের একটি অংশ এবং তাদের সভ্যতার অংশীদার হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয়নি। তাই দেখা যায় সম্মিলিত ইউরোপীয় মুক্ত বাজারে তুরস্কের কোনো স্থান হয়নি। জার্মান চ্যান্সেলর সুস্পষ্টভাবে বলেছেন: তুরস্ক আমাদের সভ্যতার অংশীদার নয়, তার সভ্যতা ও আমাদের সভ্যতা একই নির্ঝরণী থেকে উৎসারিত নয়!

এভাবে সেক্যুলারিজম তুরস্কে মূলত ওই কাকের ঘটনারই চিত্রায়িত করল যে ঈগলকে অনুসরণের চেষ্টা করতে ব্যর্থ হয়ে ঈগলও হতে পারল না, আবার পুনরায় নিজের মূল সত্তার দিকে ফিরে আসতে তথা কাক হতেও সক্ষম হলো না।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঠিক রূপরেখা

কতিপয় নেতিবাচক চিন্তাধারা (স্কুল অব থট)

চিন্তা-গবেষণা ও ফিকহর জগতে আমরা অনেক নেতিবাচক দিক দেখতে পাই যা সচেতন পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট। ইসলামি পুনর্জাগরণ তথা ইসলামি আন্দোলনের পরিধিতে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ময়দান ও রাজনৈতিক বিধি-বিধানের ন্যায় বিপজ্জনক ও গুরুত্বপূর্ণ জগতও এ ধরনের নেতিবাচক দিক থেকে মুক্ত নয়। এখানে রয়েছে কঠিন বিপদ-মুসিবত যার যার সূচনা হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ইসলামি আন্দোলনের ওপর আঘাত হানার মধ্য দিয়ে। এটি একটি জীবন্ত, গতিশীল ও অস্থিতিশীল চিন্তাধারা: কিন্তু চতুর্দিকের সমাজকে কাফির ঘোষণা করা, জগত জীবনের প্রতি কালো চোখে দৃষ্টিপাত করা এবং এর আহবায়করা সমাজ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবনাতিবাহিত করা ইত্যাদির মাধ্যমে এ চিন্তাধারা মানব সমাজকে কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল করে তোলে। এখনো ইসলামি আন্দোলনের অধিকাংশ লেখক-বুদ্ধিজীবি ও নীতি-নির্ধারকদের ওপর এর প্রভাব বিদ্যমান। এখনো অধিকাংশ দাওয়াতী মিশন, প্রশিক্ষণ শিবির ও রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা এ ধরনের চিন্তাধারার আলোকে প্রনীত।

ইসলামি আন্দোলনকে অবশ্যই জুলুম-নির্যাতন ও এসংশ্লিষ্ট কালা কানুন এড়িয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। পাশাপাশি জগত-জীবনে সুস্থ ও বিপদমুক্ত চিন্তাধারা এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

এখানে আরেকটি চিন্তাধারার অস্তিত্ব দেখা যায় যা বাহ্যিক দিকের ওপর ভিত্তি করে প্রদত্ত বিধি-বিধান নামে পরিচিত, যার পৃষ্ঠপোষকদেরকে আমি “নব্য বাহ্যিকতাবাদ” নামে নামকরণ করেছি। এরূপ চিন্তাধারায় শরিয়তের টেক্সটের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করাকে যথেষ্ট মনে করা হয়, এক্ষেত্রে শরিয়তের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং জনকল্যাণের প্রতি কোনো গুরুত্বারোপ করা হয় না। অথচ ইসলামি শরিয়তের গবেষকরা বেশ জোর দিয়ে বলেছেন যে, এর যাবতীয় বিধি-বিধান মানুষের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ সাধনের নিমিত্তেই নিবেদিত। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম বলেন: কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ, ইনসাফ ত্যাগ করে জুলুম, দয়া-অনুগ্রহ ছেড়ে নিষ্ঠুরতা, জ্ঞানের পরিবর্তে মূর্খতা, অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এগুলোকে শরিয়াহভুক্ত করার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, ইসলামি শরিয়তে এসবের কোনো স্থান নেই।

শরিয়তের কোনো কোনো বিধান বা আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ জাতীয় চিন্তাধারা হয়তোবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে গ্রহণ করা যেতে পারে; কিন্তু "শরিয়াহ প্রদত্ত রাষ্ট্রনীতি", যেখানে মুসলিম-অমুসলিম, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, সবল-দুর্বল ইত্যাদি সকলের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হয় সে ক্ষেত্রে এ জাতীয় চিন্তাধারা গ্রহণ করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভবপর নয়। এ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধানের জন্য অবশ্যই ব্যাপকতা ও গতিশীলতা, পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার এবং স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে, এ সকল বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

এখানে খারেজি চিন্তাধারা মতবাদ বা খারেজি ফিক্হ নামে অন্য একটি চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া যায় যারা প্রাচীন খারেজিদের দেখানো পথ ধরে চলতে আগ্রহ পোষণ করে থাকে। এ চিন্তার ধারক-বাহকরা তাদের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে হয়তবা সাহসী বা একনিষ্ঠ হতে পারে; কিন্তু তাদের চিন্তার জগত অত্যন্ত সীমিত। জীবন-জগত ও ধর্ম-কর্মের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সংকীর্ণ। অপরের সাথে কর্মকাণ্ড এবং লেন-দেনে তারা কঠোর। অপরকে প্রত্যাখ্যান করা, অভিযুক্ত করা এবং অপরের প্রতি ধারণা পোষণ করা ইত্যাদি হচ্ছে তাদের কর্মকাণ্ড ও চিন্তাধারার মূলভিত্তি। এমনকি ইসলামপন্থীদের ক্ষেত্রেও তাদের আচার-ব্যবহার এর থেকে ভিন্ন নয়। পাশাপাশি তারা নিজের মতামতকেই গুরুত্ব দেওয়ার মতো ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত।

এছাড়াও এখানে ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা বা ট্রাডিশনাল ফিক্হ নামে অপর একটি মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা তাদের পছন্দনীয় একটি মাযহাবের সুপ্রাচীন গ্রন্থগুলোতে জীবন যুদ্ধের আদর্শিক, রাজনৈতিক, আইন প্রণয়নসহ সমসাময়িক সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়ায়। এ জাতীয় লোকেরা তাদের পছন্দনীয় মাজহাবের পরিধির অভ্যন্তরে থাকতেই অভ্যস্ত এবং শরিয়তের সকল মাজহাব ও মতামতের দিকে সম্মিলিতভাবে দৃষ্টিপাত করে এর মধ্যস্ত প্রশস্ততা, ব্যাপকতা ও গতিশীলতার সন্ধান করতে রাজি নয়। এমনিভাবে তারা সমসাময়িক যুগের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতামতের দিকেও দৃষ্টিপাত করতে রাজি নয়। এ জাতীয় মতবাদ মূলত শরিয়তের প্রশস্ত পরিধিকে সংকীর্ণ করে দেয় এবং শরিয়াহ প্রদত্ত সহজ-সরল সমাধানগুলোকে জটিল করে তোলে।

এ সকল নেতিবাচক চিন্তাধারা বর্জন ও এগুলোর প্রভাবমুক্ত থাকা ব্যতীত কোনো ইসলামি রেঁনেসা বা আন্দোলনের পক্ষে সঠিক পরিপক্ক রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর নয়। ইসলামি আন্দোলনের জন্য এমন পরিপক্ক চিন্তাধারা ও সঠিক পথনির্দেশিকা প্রয়োজন যা শরিয়তের বিধি-বিধান ও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদত্ত সমাধান, মতপার্থক্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী হবে।

রাজনৈতিক বিধি-বিধানের কতিপয় ভুল-ত্রুটি, যার সমাধান অতীব প্রয়োজন

ইসলামি আন্দোলনকে অবশ্যই পাশ্চাত্য থেকে আগত বিভিন্ন চিন্তাধারা, কিছু বিস্ময়কর বিধি-নিষেধ এবং মনগড়া ও ভিত্তিহীন পদ্ধতিতে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াস ইত্যাদি যাবতীয় ভুল-ত্রুটির সঠিক সমাধানে সচেষ্টভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও রাষ্ট্রপরিচালনার নিয়ম নীতির ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বেশ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। অতীতে ইবাদাত ও লেনদেন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবনের বিধি-বিধান ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অধ্যয়ন, গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, তাতে রাজনৈতিক বিধি-বিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতির জন্য এ সকল গবেষণাকর্মের সামান্যতম অংশও ছিল না।

এমনিভাবে আজকের দিনেও স্বয়ং এ মাঠের কর্মীদের মাঝেও এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল বোঝাবোঝি, বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা, ও চিন্তার মতপার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়; এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে এ ধরনের মতপার্থক্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার দূরত্বে পরিণত হয়।

আমরা দেখি এখানে অনেকে রয়েছেন যারা মনে করেন শুরা আবশ্যকীয় নয়; বরং এটি পথনির্দেশক মাত্র। অনেকেই রাষ্ট্রপ্রধানকে গণপ্রতিনিধিদের মতামত ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা কিংবা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার বৈধতা প্রদান করে থাকেন। আবার অনেক এমনও রয়েছেন যারা মনে করেন গণতন্ত্র এবং এর যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও এর ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করা কুফরি কাজ কিংবা কুফরির দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ারই নামান্তর!

অনেকে মনে করেন জাতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের কোনো স্থান নেই, গৃহই হচ্ছে তাদের স্থান, স্বামীর গৃহ কিংবা কবর ব্যতীত অন্য কোথাও বের হওয়ার সুযোগ তাদের নেই। যে কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াতো দূরের কথা; বরং স্বাক্ষ্য প্রদান কিংবা ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোনো অধিকার মেনে নিতে এরা নারাজ! এর মূলত জাতির অর্ধেক সদস্যকে মৃত অবস্থায় দেখতে চায়।[১] বস্তুত মুসলিম উম্মাহকে এরা একটি ফুসফুসের মাধ্যমে শ্বাস গ্রহণ এবং; কেবলমাত্র একটি ডানার উপর ভর করে উড়াল দিতে বাধ্য করতে চায়।

---

[১] আফগানিস্তানের তালেবানদের সর্বশেষ কার্যক্রম আমাদের জানা আছে। কাবুল দখল করার পর তারা মহিলাদের কর্মস্থলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, অথচ এর মধ্যে শত শত শহীদের বিধবা স্ত্রীরাও ছিল।

অনেকে মনে করেন সমসাময়িক যুগের বহুদলীয় রাজনীতি ইসলামে অনুমোদিত নয়। ইসলামি রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-উপদল, সংস্থা, কমিটি ইত্যাদি গঠন করাও বৈধ নয় বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করে থাকেন।

আমার শরীর শিহরিত হয়ে উঠেছিল যখন কতিপয় ভাইয়ের মাধ্যমে "সংসদীয় গণতন্ত্র তাওহিদের পরিপন্থী" শীর্ষক পুস্তিকা সম্পর্কে অবগত হলাম যা ভাবাবেগে আক্রান্ত ইসলামি দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তিত্ব কর্তৃক লিখিত! তারা এখানে বিস্ময়করভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে, আমল তথা বাহ্যিক কাজ-কর্মকে আকিদা-বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলছে। অথচ আমল তথা বাহ্যিক কাজ-কর্ম কিংবা আচার-ইবাদাত ইমান-কুফরির মধ্যে নয়; বরং ভুল-সঠিকের মধ্যেই আবর্তিত হয়। এটি মূলত রাষ্ট্র পরিচালনায় শরিয়তের বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত যেখানে মুজতাহিদ গবেষকদের জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান বরাদ্দ করা হয়েছে যদি তারা সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের সক্ষম হয়, আর যদি ভুল হয় তাহলে একগুণ প্রতিদান বরাদ্দ করা হয়েছে।

ইতিহাসে খারেজিদের ঘটনা এবং এ ঘটনা একই স্রোতধারায় প্রবাহিত। তারা এমন একটি বিষয়ে হজরত আলীকে রা. কাফির আখ্যা দিয়েছিল যা মূলত রাজনৈতিক ও ইজতিহাদের বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু তারা একে আকিদা-বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। তারা বলেছিল আল্লাহর দ্বীনে সে (আলী) অন্যজনকে হাকেম বানিয়েছে, অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো হুকুম দেওয়ার অধিকার নেই! হজরত আলীর রা. ঐতিহাসিক সেই জবাব কতই না চমৎকার ছিল। তিনি বলেছিলেন: কথা সত্য ও বাস্তব; কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হয়েছে?

রাজনৈতিক বিধি-বিধান সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আমি খুবই হতবিহ্বল হয়ে পড়ি যখন আফগানিস্তানের সে সকল সিংহ শার্দূল আলেম-উলামা ও বীরপুরুষ যারা অত্যন্ত আবেগ, একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল,[২] তাদেরকে বলতে শুনি যে,

---

[২] দুর্ভাগ্যবশত : যদিও তারা অবশেষে আমাদের নিরাশ করেছিলেন। জাহেলিয়াতের সেই গোত্রপ্রীতির কাছে তারা পরাজিত হয়ে পড়ল, গোত্রপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা পরস্পরে হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ লিপ্ত হয়ে পড়ল। জিহাদের ময়দানের সহকর্মীরা এখন একে অপরের রক্তের নেশায় মত্ত হয়ে পড়ল। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের তথা ইতিহাসখ্যাত খোদাদ্রোহী শক্তির উপর বিজয় লাভ করতে সক্ষম হলো; কিন্তু নিজেদের আত্মা ও গোত্রপ্রীতির উপর বিজয় লাভ করত ব্যর্থ হয়েছিল! আফসোস! কোনো অদৃশ্য সহযোগী যদি তাদের মাঝে মীমাংসা করতে সক্ষম হতো!

মহিলাদের জন্য পড়াশোনা করা হারাম ও অবৈধ, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত করা হারাম, রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হারাম এবং শুরা আবশ্যকীয় এ কথা বলাও হারাম!

এ সকল চিন্তাধারার সাথে ঐকমত্য পোষণকারী কতিপয় ভাই আমার সাথে এ কথা বলে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল এই বলে যে, বর্তমান সময়ে ইসলামি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে যে, এমন সকল চিন্তাধারার সাথে তারা ঐকমত্য পোষণ করে থাকে যেগুলো মূলত ইসলামি চিন্তাধারা নয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইসলামি মিশন বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে ইসলামসম্মত নয় এমন উপায়-উপকরণের আশ্রয় গ্রহণ করব ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতার আশা করা দুরাশা মাত্র!

রাষ্ট্রপ্রধানের সময়সীমা নির্ধারণ

আমি বাদানুবাদকারী সে ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: রাষ্ট্র প্রধানের সময়সীমা নির্ধারণে যদি মুসলমানদের কল্যাণ থাকে তাহলে তা হারাম হওয়ার পক্ষে কী যুক্তি থাতে পারে?

তিনি বলেন: এটি মুসলমানদের কর্মপন্থার বিপরীত যা ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকরের রা. সময় থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে। এরূপ কখনো হয়নি যে তারা কিছু সময়ের জন্য খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন; বরং তাঁরা মৃত্যু অবধি জাতির নেতৃত্ব বহাল ছিলেন। রসুল সা. আমাদের নির্দেশ করেছেন তাদেরকে বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীনকে অনুসরণ করতে এবং তাদের দেখানো পথই অবলম্বন করতে। হাদিসের সুনান গ্রন্থগুলোতে হজরত ইরবাদ ইবনে সারিয়ার রা. বর্ণনায় রসুল সা. হতে এ সম্পর্কিত হাদিস বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়াও রাসুল সা. নতুন কোনো কর্মপন্থা অবলম্বন করার ব্যাপারে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত কর্মপন্থা গোমরাহী ও ভ্রষ্টতারই নামান্তর। তাই উল্লেখিত বিষয়টিও নব আবিষ্কৃত কর্মপন্থা অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত যা রসুলের সা. ভাষায় নিষিদ্ধ এবং যা পথভ্রষ্টতাকে অনিবার্য করে তোলে।

আমি তাকে বললাম: আমাদের খোলাফায়ে রাশেদীনদের দেখানো পথ অনুসরণের পূর্বে নবি সা.-এর শেখানো পথ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, যা হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানের দ্বিতীয়তম উৎস এবং কুরআনের কোনো বিষয় বোধগম্য না হলে অথবা কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হলে তার দিকেই মুসলমানদেরকে ধাবিত হতে হয়। হজরত ইরবাদ রা. বর্ণিত উল্লিখিত বর্ণনায় এসেছে: "তোমাদের অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত অনুসরণ করতে হবে..."। রসুলের সা. অনুসরণকে খলিফাদের অনুসরণের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

রসুলের সুন্নাতের পরিচয় তো সকলের নিকট সুস্পষ্ট। সুন্নাত বলতে তাঁর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি ইত্যাদি বুঝানো হয়। শুধুমাত্র রসুলের কোনো কাজের মাধ্যমে সর্বদা এর আবশ্যকতা বুঝানো হয় না; বরং কখনো জায়েজ বা শরিয়াহসম্মত হওয়াও বুঝায়। তাই কোনো কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়বলীও বিবেচনায় রাখতে হয় যা থেকে এর আবশ্যকতা অথবা শুধুমাত্র বৈধতা কিংবা উত্তম অবস্থাকে ইত্যাদি বোঝা যায়।

তাই আমরা দেখি অনেক সময় রসুল সা. সমকালীন যে পরিস্থিতি বা যে ধরনের কল্যাণকে তখন বিবেচনায় রেখেছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীন পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজন সাপেক্ষে রসুল সা. কর্তৃক গ্রহীত কর্মপদ্ধতির বিপরীতটাই গ্রহণ করেছিলেন।

> এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: মহানবি সা. খায়বার বিজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ বিজয়ী যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হজরত ওমর রা. ইরাকের এক বিশাল এক অঞ্চল জয় করার পর অনুরূপ করেননি। তিনি সে সময়ের বিবেচনায় যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ বিতরণ না করাই উত্তম মনে করেছিলেন। সাহাবিদের মধ্যে অনেকে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেছিল; বিশেষ করে তিনি সুস্পষ্টভাবে কুরআনের নির্দেশের বিপরীত মত পোষণ করেছিলেন। সুরা আনফালে এসেছে: "জেনে রাখো তোমরা যুদ্ধলব্ধ যে সকল ধন-সম্পদ অর্জন করেছ তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য..." (সুরা আনফাল, ৮: ৪১)। হজরত ওমর রা. এ ব্যাপারে বলেন: আমি যা মনে করছি তাতে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম সবার জন্য কল্যাণ রয়েছে। তোমরা কি আমাকে এমন নীতি অবলম্বন করতে বলছ যাতে শুধু বর্তমান প্রজন্মের কল্যাণ থাকবে, ভবিষ্যতে আগত প্রজন্মের জন্য কিছুই থাকবে না! অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতে আগত প্রজন্মের কল্যাণও বিবেচনায় রাখতে চেয়েছিলেন। এটি জাতির বিভিন্ন প্রজন্মের মাঝে এক প্রকার চমৎকার সহমর্মিতা ও পারস্পরিক ঐক্যের সেতু বন্ধন। এর ফলে এক প্রজন্ম অন্য প্রজন্মের ওপর নির্ভরতাকে বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। হজরত ওমর রা. এ ক্ষেত্রে সুরা হাশরের একটি আয়াতকে বিবেচনায় আনতে চান যেখানে মুহাজির ও আনসারের মাঝে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে: "এবং (তা সেইসব লোকের জন্যও) যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে" (সুরা হাশর, ৫৯: ১০)।

ইমাম ইবনে কুদামাহ মধ্যস্থতা বিষয়ে রসুল সা. ও হজরত ওমরের রা.-এর কাজের বৈপরীত্যের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: রসুল সা. তাঁর সমকালীন সময়ের জন্য যেটাই উত্তম সেটাই করেছেন, এমনিভাবে হজরত ওমরও রা. তার সমকালীন প্রেক্ষাপট সামনে রেখেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

যেখানে রসুলের কোনো কোনো কাজ যা তাঁর সুন্নাহর একাংশ, পরবর্তী সাহাবাদের জন্য আবশ্যকীয় হয় না এবং স্থান-কাল ও পাত্রের বিবেচনায় এর বিপরীত মত গ্রহণ করার সুযোগ তাদের থাকে, যেখানে মুসলমানদের একদলের কাজ কিভাবে পরবর্তীদের জন্য আবশ্যক হতে পারে?

কোন কাজ শুধুমাত্র আগের লোকেরা করেছেন এ কারণেই আমরা তা করতে শারয়ীভাবে দায়বদ্ধ নই। এখানে মূলত যা হয়ে থাকে তা হচ্ছে প্রত্যেকেই তার সমকালীন স্থান, কাল, পাত্র এবং অবস্থা ইত্যাদির আলোকে হুকুম দিয়ে থাকে; এগুলোর কোনো একটিতে পরিবর্তনের ফলস্বরূপ তার হুকুমের মূল ভিত্তি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার কারণে তা প্রদত্ত হুকুমও পরিবর্তন হতে বাধ্য।

এখানে ধর্তব্য ও বিবেচিত বিষয় হচ্ছে: বিভিন্ন ধরনের বিধি-বিধান ও আইন-কানুন থেকে যেগুলো স্থান, কাল, পাত্র, অবস্থা এবং পরিবেশ ইত্যাদির বিবেচনায় প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য হবে তাই বাচাই করতে হবে। তবে সাথে সাথে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই শরিয়তের সাধারণ মূলনীতি, মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ইসলামের মহানুভবতা ও উদারতা ইত্যাদিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

অপর দিকে মুসলমানরা রাষ্ট্রপ্রধানের সময়কাল নির্ধারিত না থাকার ওপর অঘোষিতভাবে কার্যত যে ঐকমত্য ঘোষণা করে আসছে, এ ক্ষেত্রে তার ওপর ভিত্তি করে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে চেষ্টা করা এক ধরনের নির্বুদ্ধিতাও বটে!

মুসলমানদের এ ধরনের ঐকমত্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কোনো ক্ষতি বা বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা না থাকলে প্রয়োজনে মৃত্যু অবধি রাষ্ট্রপ্রধানের সময়সীমা বহাল রাখা বৈধ, এ বিষয়ে আমাদের কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু এখানে অপর একটি নতুন বিষয় যোগ হয়েছে, তা হচ্ছে: সময়সীমা নির্ধারণের বিষয়। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কোনো আলোচনা হয়নি, এ বিষয়ে সেখানে নীরবতা অবলম্বন করা হচ্ছে। আর ইসলামি আইনের ধারা হচ্ছে: "নীরবতার ওপর ভিত্তি করে কোনো বিধান জারি করা যাবে না"। তাই উল্লেখিত বিষয়ের বৈধতা বা অবৈধতার দায়ভার অতীত মুসলমানদের ওপর চাপানো যাবে না।

সুন্নাত ও বিদআত

এখানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপ্রধানের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া বিদআতের অন্তর্ভুক্ত, এটি ইসলামের একটি নব আবিষ্কৃত বিষয় বলে গণ্য হবে। আর বিদআত

তথা নব আবিষ্কৃত বিষয়ের অবৈধতা ও পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

দ্বিতীয় কথাটি পুরোপুরি সত্য যে, প্রত্যেক বিদআত বা নব আবিষ্কৃত বিষয় অবৈধ ও পথভ্রষ্ট। কিন্তু প্রথম কথাটি যে, রাষ্ট্রপ্রধানের সময়সীমা নির্ধারণের মতো এ জাতীয় বিষয় শরয়ী বিদআতের পরিধিভুক্ত হবে, এ কথাটি অবশ্যই প্রমাণসাপেক্ষ এবং এ বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণ তলব করার অবকাশ রয়েছে।

ইসলাম সকল নতুন বিষয়কে রুখে দেয় এবং বিদআতের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে যাবতীয় নতুনত্বের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা করা শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিই নয়; বরং তা এক ধরনের ভয়ানক পথভ্রষ্টতাও বটে!

সত্যিকারের বাস্তবতা হচ্ছে ইসলাম বর্ণিত বিদআতের পরিধি শুধুমাত্র আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদাত ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু জীবনে পথ চলতে গিয়ে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে পরিবর্তিত বিভিন্ন বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান, কৃষ্টি-কালচার এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকসহ নানাবিধ বিষয়ে বিদআতের কোনো অংশ নেই। এখানে নতুন কিছু জন্ম নিলে তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং "আল ই'তেছাম" গ্রন্থে ইমাম শাতেবী বর্ণিত মতানুযায়ী এগুলো "আল-মাসালিহি আল-মুরছালাহা" তথা (Unrestricted interest) 'উপেক্ষিত জনকল্যাণ' শীর্ষক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর ওপরই ভিত্তি করে মূলত সাহাবায়ে কেরাম এমন সকল কাজ সম্পাদন করেছেন যা রসুল সা. করেননি। এরমধ্যে কুরআন সংকলন, বিভিন্ন দফতর বণ্টন, ট্যাক্সের বিধান এবং জেলখানা নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এমনিভাবে পরবর্তীতে আসা তাবেয়িগণ এমন সকল কাজ সম্পাদন করেছেন যা সাহাবিরা করেননি। যেমন: মুদ্রা প্রচলন, ডাক ব্যবস্থার প্রচলন ইত্যাদি।

এমনিভাবে এর ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী মুসলমানগণ এমন সকল নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছেন, রসুল সা. কিংবা সাহাবিদের যুগেও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। যেমন: বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংকলন যা ইতঃপূর্বে পরিচিত ছিল এবং জ্ঞানের জগতে কতিপয় নতুন বিষয়ের আবিষ্কার যা ইতঃপূর্বে ছিল না, যেমন: ধর্মতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং মানবতত্ত্বের নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে রসুল সা. বলেছেন: "যদি কেউ কোনো ভালো নিয়ম-নীতি বা বিধি-বিধান প্রচলন করে থাকে তাহলে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সে এর প্রতিদান পাবে এবং সাথে সাথে যারা তদানুযায়ী আমল করবে তার প্রতিদানও সে পাবে"।

ইতিহাস এখনো দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের রা. গৃহীত অনেক কার্যাবলীর স্বাক্ষী হয়ে আছে। এর সবগুলোই তাঁর আবিষ্কৃত বিধি-বিধান, পরবর্তীতে সাহাবাগণ এর ওপর ঐকমত্য পোষণ করার মাধ্যমে এগুলো সম্মিলিতভাবে গৃহীত বিধি-বিধান বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

সিরাত তথা রসুলের সা. জীবনকর্মকে বিভিন্ন বিধি-বিধানের দলিল হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে কতিপয় ভুল-ত্রুটি

রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি ও বিচ্ছিন্ন চিন্তা-ভাবনার অন্যতম কারণ হচ্ছেঃ দলিল-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে রসুলের সা. সুন্নাত এবং সিরাত তথা জীবনকর্মের মধ্যে সংমিশ্রণ ও তালগোল পাকিয়ে ফেলা।

সুন্নাত হচ্ছে কুরআন শরিফের পাশাপাশি শরিয়তের বিধি-বিধান প্রণয়নের একটি উৎস। কুরআন হচ্ছে মূলভিত্তি, আর সুন্নাহ হচ্ছে এর ব্যাখ্যা, বর্ণনা এবং প্রয়োগ। এখানে সবাই যে ভুলের সহজ শিকার হয়ে পড়ে তা হচ্ছেঃ সিরাতকে সুন্নাতের স্থানে রেখে কুরআন-সুন্নাহর ন্যায় সিরাত থেকেও শরিয়তের আবশ্যকীয় বিধি-বিধান উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করা।

সিরাত তথা জীবনকর্ম সুন্নাতের সমার্থবোধক নয়। সিরাতের মধ্যে এমনও বিষয় রয়েছে যা শরিয়তের বিধি-বিধানের আওতায় পড়ে না কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে এর সাথে কোনো সম্পর্কও রাখে না। এজন্যই উসুল বিশেষজ্ঞরা সুন্নাতের পরিচয় দিতে গিয়ে সিরাতের কথা উল্লেখ করেননি। তাদের ভাষায় সুন্নাহ হচ্ছেঃ রসুলের সা. কথা, কাজ ও মৌনসম্মতির সমষ্টি, এখানে সিরাতের কোনো স্থান নেই।

কিন্তু মুহদ্দিস তথা হাদিস বিশারদগণ রসুলের সা. কথা, কাজ ও মৌনসম্মতির সাথে সাথে শারীরিক ও চারিত্রিক বিষয়াবলী তথা সিরাতকেও হাদিসের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। মুহাদ্দিসগণ মূলত জীবনের যাবতীয় বিষয়াবলীকে একীভূত করতে আগ্রহ পোষণ করে থাকেন, এ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধি-বিধান প্রণয়নের সাথে তার সম্পর্ক আছে কি নেই, এ বিষয় তাদের চিন্তাভাবনা নেই। তাই তারা রসুলের সা. নবুয়্যতপূর্ব জীবন তথা জন্ম, দুধপান, লালন-পালন, যৌবন, বিবাহ-শাদি ইত্যাদি থেকে শুরু করে শারীরিক ও চারিত্রিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। এক কথায় রসুলের সা. জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পুরো জীবনকাল তাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সর্বোপরি কতিপয় ইসলামি দল বা জনগোষ্ঠী সাধারণত সিরাত থেকে শরিয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান উদ্ভাবন করতে সচেষ্টা থাকেন এবং একে মুসলমানদের জন্য আবশ্যকীয় বলে মনে করেন।

এখানে দু'টি বিষয় উল্লেখযোগ্য-

প্রথমত: সিরাতগ্রন্থে এমন সকল ঘটনাবলী পাওয়া যায় যেগুলো বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়ে আসেনি। মূলত আলেম-উলামাগণ শরিয়তের বিধি-বিধান তথা হালাল-হারাম সম্বলিত হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা ও কঠোরতা প্রদর্শন করে থাকেন সিরাত বর্ণনার ক্ষেত্রে তা করেন না; এবং এ ক্ষেত্রে সহজ-সরল পন্থা অবলম্বন করে থাকেন।

দ্বিতীয়ত: সিরাত মূলত রসুলের সা. জীবনের বাস্তবিক কার্যক্রমেরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। অর্থাৎ এটি সাধারণত সুন্নাহর বিভিন্ন দিক তথা কথা, কাজ ও মৌনসম্মতির মধ্যে কাজকেই অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। আর রসুলের সা. কাজ এককভাবে ওয়াজিব বা আবশ্যকতার প্রতি ইঙ্গিত করে না; বরং এর দ্বারা শুধুমাত্র শরিয়াহ্ সম্মত বা বৈধতার প্রতিই নির্দেশ করে থাকে। পরবর্তীতে অন্য কোনো দলিল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থার আলোকে তা ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে আমরা অবশ্যই রসুলকে সা. অনুসরণ করতে বাধ্য এবং এ ব্যাপারে আমরা আদিষ্টও বটে। ইরশাদ হচ্ছে: "আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের আকাঙ্ক্ষি এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করে"।[৩]

কিন্তু এ আয়াতে রসুলকে সা. অনুসরণের আবশ্যকতা নয়; বরং তাঁর উত্তম বৈশিষ্ট্যের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ অর্থে যে জীবনের চলার পথের খুঁটি-নাটি বিস্তারিত সকল বিষয়ে নয়; বরং আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও সাধারণ অবস্থানের ক্ষেত্রে রসুলের সা. সিরাত থেকে নমুনা ও আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। যেমন: এটা আবশ্যক নয় যে সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও রসুলের সা. অনুসরণে সর্বপ্রথম গোপনে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করতে হবে। এমনিভাবে এটাও আবশ্যক নয় যে মাতৃভূমিতে নিরাপদে ও সঠিকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সক্ষমতা সত্ত্বেও রসুলের সা. অনুসরণে হিজরত করতে হবে।

আর সেজন্যই মক্কা বিজয়ের পরে প্রত্যেক মুসলিমের ওপর হিজরত করা আবশ্যক ছিল না, যেমনিভাবে পূর্বে তা ছিল। রসুল সা. বলেছেন: "মক্কা বিজয়ের পরে হিজরতের আর প্রয়োজন নেই; কিন্তু জিহাদ অথবা অন্য কোনো মহান উদ্দেশ্য সাধনে কেউ যদি হিজরত করতে চায় তাহলে তার জন্য সুযোগ থাকবে, তাই

---

৩ সুরা আহযাব, ৩৩ : ২১।

তোমাদের যদি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হতে বলা হয় তাহলে তোমরা বেরিয়ে পড়বে"।[৪] অর্থাৎ মদিনার হিজরতের বিধান এখন আর অবশিষ্ট নেই। যদি প্রত্যেক ভূ-খণ্ড থেকে এভাবে হিজরতের বিধান অবশিষ্ট থাকে তাহলে কোনো ভূখণ্ডেই মুসলমানরা তাদের দ্বীনের বিজয় কেতন উড়াতে সক্ষম হবে না।

এটিও আবশ্যক নয় যে বিভিন্ন ক্ষমতার ও শক্তিশালী জাতি থেকে সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করা যেমনিভাবে রসুল সা. কতিপয় গোত্র থেকে সহযোগিতার আহবান করেছিলেন, যার ফলে আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছিল। এ ধরনের উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন আমাদের এ যুগে কোনো ভালো ফলাফল বয়ে আনবে না, বরং আমাদের জন্য তা সুখকর হবে না।

এমনিভাবে এটাও আবশ্যক নয় যে তের বছর ধরে শুধুমাত্র আকিদা-বিশ্বাসের দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া যাতে তা মানুষের অন্তরে গেঁথে যায়। আমরাতো এখন মুসলিম সমাজেই এমন সকল লোকদের সাথে বসবাস করছি যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মদ সা. আল্লাহর প্রেরিত রসুল। তাই এদেরকে এত দীর্ঘকাল ধরে আকিদা-বিশ্বাসের কথা শোনানোর কোনো আবেদন এখন অবশিষ্ট নেই।

আমরা যদি এখন সামাজিক সুবিচার অথবা শুরা ও স্বাধীনতা কিংবা মসজিদুল আক্‌সা বা জাতির দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ করি তাহলে তা রসুলের সা. সুন্নাহ ও আদর্শ বিরোধী হবে এমনটি ভাবার কোনো সুযোগ নেই, এ যুক্তিতে যে রসুলের সা. মাক্কি জীবনে এসবের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, মাদানি জীবনই কেবলমাত্র এসকল কার্যক্রমের ক্ষেত্র ছিল। কারণ রসুলতো সা. মক্কায় জাহেলি সমাজ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন যেখানে পৌত্তলিকতা, শির্ক, মূর্তিপূজা, নবুয়্যতের অস্বীকার ইত্যাদি বিষয়ের ছড়াছড়ি ছিল। তাই সেখানে তাওহীদ ও রিসালাত প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলো ছিল সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারযোগ্য।

কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা অনুরূপ নয়। এখানকার মানুষ আল্লাহকে প্রভু ও প্রতিপালক, ইসলামকে একমাত্র দ্বীন এবং মুহাম্মদকে সা. নবি ও রসুল হিসেবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, যদিও শয়তানের ধোকায় পড়ে অনেকে আল্লাহর শরিয়াহ পালনে অবহেলা করে এবং পাপাচার ও অপরাধকর্মে জড়িয়ে থাকে।

---

৪ মুত্তাফাকুন আলাইহি, অধিক সংখ্যক সাহাবী বর্ণিত হাদিস।

রাজনৈতিক ইসলাম।।

নিকট অতীত থেকে সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারী ও পাশ্চাত্যের চিন্তা ভাবনার ধারক-বাহক কতিপয় ডানপন্থী ও বামপন্থী লেখক ও বুদ্ধিজীবী, অর্থাৎ যারা মার্কসবাদ এবং অথবা পাশ্চাত্যের লিবারেল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী তাদের বর্ণনা-বিবৃতি ও লিখনির মাধ্যমে কতিপয় পরিভাষা জনসমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ সকল পরিভাষার মধ্যে "রাজনৈতিক ইসলাম" শীর্ষক পরিভাষা উল্লেখযোগ্য। মুসলিম জাতির বিভিন্ন সমস্যা এবং এর আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর গুরুত্বারোপ করা, মুসলিম উম্মাহকে সকল বিদেশি শাসক ও শোষক থেকে মুক্ত করা যারা তাদের ঘাড়ে জগদ্দল পাথরের ন্যায় বসে আছে এবং তাদের ইচ্ছা মোতাবেক এর তাত্ত্বিক ও বৈষয়িক বিষয়াদি পরিচালনা করে থাকে। এ ছাড়া মুসলিম উম্মাহকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও আইন প্রণয়ন ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ থেকে মুক্ত করে পুনরায় এর বিভিন্ন সেক্টরে ইসলামি শরিয়তের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, ইত্যাদি বিষয়াদি ইসলামের যে বিভাগে আলোচনা হয়ে থাকে রাজনৈতিক ইসলাম বলতে মূলত তাই বুঝানো হয়ে থাকে।

তারা এ পরিভাষা ব্যবহার করে তারা মূলত এর মাধ্যমে ইসলামের এ বিষয়টির প্রতি জনমনে ঘৃণা সৃষ্টি করতে চায়। এমনিভাবে এর মাধ্যমে যারা আকিদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধান এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রের সমন্বয় হিসেবে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বদা সচেষ্ট সেসকল সত্যিকার ইসলামি ব্যক্তিত্বদেরকে জনসমাজে ঘায়েল করারও উদ্দেশ্য থাকে।

অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে, এ ধরনের নতুন নাম "রাজনৈতিক ইসলাম" শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কি-না? ইসলামে রাজনীতির প্রবেশ, এটা কি আধুনিক ইসলামি পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত নতুন কোনো বিষয় নাকি এটি কুরআন-সুন্নাহ কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনের কোনো বিষয় হিসেবে সকলের কাছে গ্রহণনযোগ্য?

এ সকল প্রশ্নকারী ভাইয়েরা আমাদের কাছে কুরআন-সুন্নাহ ও শরিয়তের দলিল-প্রমাণের আলোকে এ বিষয়ের প্রকৃত বাস্তবতা জানতে চেয়েছে। যাতে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যারা ধ্বংস হতে চায় ধ্বংস হয়ে যাক এবং যারা বাঁচতে চায় বাঁচতে পারে। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ও কৌতূহলী এ সকল ভাইদের জিজ্ঞাসার জবাবে আমি বলব:

প্রথমত : এ ধরনের নামকরণ প্রত্যাখ্যাত

প্রথমে যে বিষয়টি বলা দরকার তা হচ্ছে: মুসলমানদের কাছে এ ধরনের নামকরণ প্রত্যাখ্যানযোগ্য। এর মাধ্যমে মূলত ইসলাম বিরোধী এবং এর দুশমনদের

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা হয়, যারা ইসলামকে বিভিন্ন অংশে খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থায় দেখতে চায়। আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ও মুসলমানদের বিশ্বাস মোতাবেক একক ও অখণ্ড ইসলাম তাদের চক্ষুশূল। একে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে তারা এর নানাবিধ কাঠামো দাঁড় করাতে চায়।

কখনো তারা মহাদেশভিত্তিক ইসলামকে ভাগ করতে চায়ঃ যথা- এশীয় ইসলাম, বা আফ্রিকান ইসলাম। কখনো যুগের ভিত্তিতে ভাগ করে থাকে- যথাঃ নববি ইসলাম, রাশেদী ইসলাম, উমাইয়া ইসলাম, আব্বাসীয় ইসলাম, উসমানী ইসলাম, আধুনিক ইসলাম ইত্যাদি। কখনো জাতি-গোষ্ঠীর ভিত্তিতে ভাগ করে থাকে - যথাঃ আরবীয় ইসলাম, হিন্দি ইসলাম, তুর্কি ইসলাম এবং মালয় ইসলাম ইত্যাদি। আবার কখনো মাজহাব হিসেবে ইসলাম ভাগ করতে চায়, যেমনঃ সুন্নী ইসলাম, শিয়া ইসলাম ইত্যাদি। এখানে আবার সুণ্নী এবং শিয়া উভয়কে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এছাড়া আরো কিছু অতিরিক্ত ভাগ যোগ করা হয়, যেমনঃ বিপ্লবী যা জিহাদী ইসলাম, প্রতিক্রিয়াশীল, র‍্যাডিকাল বা ক্লাসিক্যাল ইসলাম, ডানপন্থী ইসলাম, বামপন্থী ইসলাম, গোঁড়া ইসলাম, লিবারেল ইসলাম ইত্যাদি। সর্বশেষ রয়েছেঃ রাজনৈতিক ইসলাম, মৌলবাদী ইসলাম, আধ্যাত্মিক ইসলাম, পার্থিব ইসলাম, ঐশ্বরিক ইসলাম ইত্যাদি। আমাদের জানা নেই তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মন-মস্তিষ্কে ইসলামের আরও নতুন কি কাঠামো জন্ম নিতে পারে!

প্রকৃত কথা হচ্ছে ইসলামের তথাকথিত এ সকল শ্রেণি বিভাজন মুসলমানদের কাছে একবাক্যে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। এখানে ইসলামের নানাবিধ প্রকার বা রূপ খোঁজার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহ-রসুল এবং কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত ইসলাম এক ও একক, এখানে কোনো ভাগ বা শ্রেণি নেই। ইসলামের সোনালী যুগের সোনালী মানুষগুলো থেকে শুরু করে পরবর্তীতে তাদের অনুসরণকারী মুসলমানগণ, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির সনদ দিয়েছেন, তাদের সকলেই এক ও অভিন্ন ইসলামের অনুসরণ করেছেন।

এটাই হচ্ছে ইসলামের সঠিক এবং সত্যিকার রূপ। পরবর্তীতে বিভিন্ন দলের মিথ্যা প্রচার-প্রাপাগান্ডা, নানাবিধ মতবাদের স্বেচ্চাচারিতা, বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধরা, কতিপয় দল-উপদল কর্তৃক প্রচলিত বিদআত, বিরোধীদের প্রবৃত্তির চাহিদা, মিথ্যাবাদীদের মিথ্যা দাবি, গর্ব ও অহংকারীদের কুটিল যুক্তি-তর্ক সন্দেহ পোষণকারীদের মিথ্যা সন্দেহাবলী এবং মুর্খ পণ্ডিতদের প্রদত্ত অপব্যাখ্যা ইত্যাদি সব কিছুর সমন্বয়ে ইসলামের নির্মল ও প্রকৃতরূপ মানুষের কাছে অপরিচিত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত : রাজনীতি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ

এখানে এ কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা কর্তব্য মনে করছি যে, রাজনীতি ব্যতীত ইসলামের সত্যিকার ও প্রকৃত রূপের (যেভাবে আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন) পরিপূর্ণতা লাভ অসম্ভব। ইসলামকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তা আর ইসলাম থাকবে না, অন্য কোনো ধর্মে পরিণত হতে বাধ্য। বৌদ্ধ ধর্ম বা খ্রিস্ট ধর্ম ইত্যাদিকে হয়তবা রাজনীতি থেকে পৃথক করার চিন্তা করা সম্ভব; কিন্তু ইসলামকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চিন্তা করা অসম্ভব।

পুরো মানব জীবনকে ঘিরে রয়েছে ইসলামের দিকনির্দেশনা

এখানে প্রধানতঃ দু'টি কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণ: এমন সকল ইস্যুতে ইসলামের মজবুত অবস্থান এবং সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে যেগুলো মূলত রাজনীতির মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত। ইসলাম শুধুমাত্র ঐশ্বরিক আকিদা-বিশ্বাস বা খোদায়ী বিধি-বিধানের নাম নয়। অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত রূপ এটি নয় যে, এটি শুধুমাত্র মানুষ এবং তার প্রভুর মধ্যস্থ সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, জগত সংসার পরিচালনা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য এর কোনো দিক নির্দেশনা নেই।

এটা কখনো হতে পারে না... ইসলাম হচ্ছে আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, আচার-আচরণ, এবং পরিপূর্ণ জীবন বিধান। অন্য ভাষায়: এটি হচ্ছে আইন প্রণয়নের মৌলিক নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান এবং যাবতীয় মূল্যবোধের দিকনির্দেশনা সম্বলিত জগত-জীবন পরিচালনার পরিপূর্ণ এক সংবিধান, যা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক বিষয়াদি, সমাজের, পরিবেশ-পরিস্থিতি, রাষ্ট্রীয় ভিত্তি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি সকল কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে।

যে ব্যক্তি কুরআন, রসুলের সা. সুন্নাহ ও জীবনকর্ম, নানাবিধ মাজহাবসহ ইসলামি ফিক্‌হের বিভিন্ন পুস্তকাদি অধ্যয়ন করবে তার কাছে এটি দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

এমনকি ইবাদাতের অধ্যায়ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মুসলমানরা সবাই একমত যে, কেউ যদি নামাজ না পড়ে, জাকাত দিতে অস্বীকার করে, প্রকাশ্যে দিবালোকের রোজা না রাখার দুঃসাহস দেখায় এবং সামর্থ সত্ত্বেও হজ করতে উদাসীনতা প্রদর্শন করে তবে এ জন্য তাকে শাস্তি বা সতর্কতামূলক শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কখনো কখনো তা লড়াই পর্যন্তও গড়াতে পারে যদি একদল জড়ো হয়ে শক্তি সমবেত করে বিরোধীতায় ফেটে পড়ে, যেমনিভাবে আবু

বকর রা. জাকাতের আবশ্যকতা ও এটি প্রদানের অস্বীকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বরং ইসলামি আইনজ্ঞরা বলেছেন, কোনো শহর বা কোনো গ্রামের অধিবাসীরা যদি সম্মিলিতভাবে এমন কোনো বিধান ত্যাগ করে যা ইসলামের নিদর্শন হিসেবে পরিচিত, যেমনঃ আজান, পুরুষদের খাৎনা করানো, দু'ঈদের নামাজ ইত্যাদি, তাহলে তাদেরকে যুক্তি-প্রমাণসহ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। যদি তারা তাদের কথা ও কাজে অটল থাকে এবং এ সকল বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না তারা পুনরায় যেখান থেকে দলচ্যুত হয়েছে সেখানে ফিরে আসে।

শিক্ষা-সংস্কৃতি, মিডিয়া পরিচালনা, আইন প্রণয়ন, শাসনকার্য পরিচালনা, অর্থনীতি, শান্তি প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধনীতিসহ জীবনের প্রতিটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে ইসলামে রয়েছে নিজস্ব মূলনীতি, বিধি-বিধান ও দিকনির্দেশনা। বামপার্শ্বের শূন্যের ন্যায় অকেজো কিংবা অন্য কোনো মতাদর্শ বা আদর্শবাদের সেবক হয়ে বেঁচে থাকার জন্য ইসলামের জন্ম হয়নি। ইসলামের জন্ম হয়েছে মানব জীবনের প্রতিটি সেক্টরের নেতা, সর্দার বা পরিচালক হয়ে বেঁচে থাকার জন্য। এছাড়াও মানুষ ইসলামের অনুসরণ করবে, ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে, এর মধ্যেই রয়েছে জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের স্বার্থকতা।

মানব জীবন পরিচালনায় ইসলাম তার সাথে অন্য কাউকে পরিচালক বা নেতা হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এক্ষেত্রে ইসলাম কোনো অংশীদারিত্বেও অনুমোদন দেয় না। হজরত ঈসার আ. মুখনিঃসৃত বাণী দাবি করে যে কথাটি বলা হয়ে থাকে "যা কায়সারের জন্য তা কায়সারকে দাও এবং যা আল্লাহর জন্য তা আল্লাহকে দাও", ইসলাম তা মানতে রাজি নয়।

ইসলামের দর্শন হচ্ছেঃ কায়সার এবং তার যা কিছু আছে সবই আসমান জমিন এবং এর মধ্যস্থ সবকিছুর অধিপতি আল্লাহ তায়ালার জন্যই নিবেদিত।

ইসলামের একত্ববাদের মূলভিত্তি হচ্ছে যে, কোনো মুসলিম এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু তালাশ করবে না, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না এবং এক আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয়ত কাউকে বিচারক হিসেবে মেনে নিবে না। "তাওহিদ বা একত্ববাদ" শীর্ষক সূরা যা "আল আনআম" নামে সকলের কাছে সুপরিচিত তাতে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।

> একত্ববাদের আকিদা-বিশ্বাস সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা, সাম্য এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধেরই ফসল। এর ফলে মানুষ আল্লাহকে বাদ

দিয়ে একে অপরকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না এবং এর মাধ্যমেই মূলত মানুষ কর্তৃক মানুষের বন্দেগি করার মানসিকতা দূর হয়ে যায়। তাই রসুল সা. আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের রাজা-বাদশাহদের কাছে লিখিত তাঁর চিঠির সমাপ্তি টেনেছিলেন সুরা আলে ইমরানের এ আয়াতের মাধ্যমে: "বলো: হে আহলে কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে একই ধরনের। তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ ছাড়া কারোর বন্দেগি ও দাসত্ব করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবো না। আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে নিজের রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে পরিষ্কার বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা অবশ্যই মুসলিম (একমাত্র আল্লাহর বন্দেগি ও আনুগত্যকারী)" (সুরা আলে ইমরান, ৩: ৬৪)।

শুধুমাত্র কালেমার (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পতাকা উত্তোলনের প্রথম দিন থেকেই মক্কার কাফির মুশরিক এবং কুরাইশ সর্দাররা ইসলামের এ দাওয়াতের বিরোধিতা করার এটিই ছিল মূল রহস্য। তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল এ কালেমার সত্যিকার মর্ম। ধর্মীয় বিধি-বিধানের পরিবর্তনের পাশাপাশি এখানে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বিধি-বিধানও রয়েছে তা সহজেই তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।

মুসলমানদের ব্যক্তিত্ব মূলত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

দ্বিতীয় কারণ: ইসলাম যেমনিভাবে আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, বিধি-বিধানসহ জীবনের সকল বিভাগকে ঘিরে আছে তেমনিভাবে একজন মুসলমানের মিশনও জীবনের সকল বিভাগকে ঘিরে আছে। একজন মুসলমানের ব্যক্তিত্ব কখনো রাজনীতি ব্যতীত পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তবে কেউ যদি ইসলামের পরিপূর্ণ শিক্ষা অর্জন করতে কিংবা এর প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয় অথবা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার শিকার হয় তাহলে হয়তবা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে।

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিবিধানের ন্যায় এক মহামিশন ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমের ঘাড়ে আবশ্যকভাবে চাপিয়ে দিয়েছে। কখনো একে "সরকার এবং সাধারণ জনগণকে নসিহত করার মাধ্যমে তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা", এ ভাষায়ও ব্যক্ত করা হয়। হাদিস শরিফে একে দ্বীনের সামগ্রিক বিষয় তথা পুরো দ্বীন হিসেবে বিবেচনা করে বলা হয়েছে: "দ্বীন তো অপরকে আদেশ-উপদেশ ও

পরামর্শ দেওয়ার মাধ্যমে তার কল্যাণ কামনা করারই নাম"।[৫] কখনো একে "পারস্পরিক সত্য ও ন্যায় এবং ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া" হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কুরআন শরিফের সুরা আসরে এ দু'টো কাজকে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতি থেকে মুক্তির মৌলিক শর্তাবলীর মধ্যে অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতির সার্বিক বিষয়ের খোঁজ-খবর রাখাই হচ্ছে একজন মুসলমানের জীবনের মিশন। আর এ মিশনেরই বর্তমান রূপ হচ্ছে রাজনীতি।

জুলুম-অত্যাচার ও বিবাদ-বিশৃঙ্খলার প্রতিরোধ করা হচ্ছে সর্বোত্তম জিহাদ

রসুল সা. আভ্যন্তরীণ জুলুম-অত্যাচার ও কলহ-বিবাদ প্রতিরোধের জন্য সর্বদা উৎসাহিত করতেন এবং বহিরাগত শত্রুর জুলুম-অত্যাচার ও আক্রমণের প্রতিরোধ থেকে একে উত্তম বলে বিবেচনা করতেন। যখন তাঁকে সর্বোত্তম জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি বললেন: "সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে জালেম-অত্যাচারী রাজা-বাদশাহর সামনে নির্ভীকচিত্তে সত্য ও ন্যায়ের ঘোষণা দেওয়া"[৬] আর এ জন্য যে, আভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদ বহিরাগত আক্রমণের পথকে সুগম করে দেয়।

আর এ পথে শাহাদাত বরণ করাকে আল্লাহর রাস্তায় সর্বোত্তম শাহাদাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রসুল সা. "হামযা হচ্ছে শহীদদের সর্দার। অতঃপর ওই ব্যক্তি যে জালেম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আদেশ-নিষেধের বাণী শোনায়, অতঃপর তাকে শহীদ করা হয়"।[৭]

তিনি (রসুল সা.) মুসলমানের অন্তরকে সর্বদা জুলুম-অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা এবং জালেমকে প্রশ্রয় না দেওয়ার শিক্ষায় উজ্জীবিত রাখতেন। এমনকি তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত এবং যা হানাফি মাজহাবে দুয়ায়ে কুনুতে বলা হয়: "আল্লাহ! আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তোমার সাথে কুফরি করার মাধ্যমে তোমার

---

৫ তামীম আদ্ দারী থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদিস। ইমাম নববীর প্রসিদ্ধ চল্লিশ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত।

৬ আল্লামা মুনযেরী তারগীব গ্রন্থে বলেন: ইমাম নাসায়ী বিশুদ্ধ সনদে তারেক ইবনে শিহাব থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন। দেখুন : নাসায়ী : ৭/১৬১, ইমাম নববী রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থে একে বিশুদ্ধ বলেছেন।

৭ হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত। হাকেম একে সহিহ বলেছেন কিন্তু যাহাবী তা প্রত্যাখ্যান করেন, খতিব এমন সনদে এটি বর্ণনা করেন যা আলাবানীর কাছে বিশুদ্ধ। দেখুন : (বিশুদ্ধ হাদিস / ৩৭৪)।

অকৃতজ্ঞ হই না, সাথে সাথে যারা তোমার সাথে কুফরি করে আমরা তাদের সঙ্গ ছেড়ে দিই এবং তাদের আনুগত্যের বন্ধন থেকে বেরিয়ে পড়ি"।

> নির্যাতিত নিষ্পেষিত মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে জিহাদের প্রতি সর্বোত্তম ভাষায় উৎসাহ দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন: "তোমাদের কি হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোনো বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরি করে দাও" (সুরা নিসা, ৪: ৭৫)। যারা জুলুম-অত্যাচার সহসাই মাথা পেতে নেয় তাদের প্রতি তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেছেন। অত্যাচারিত হওয়ার পরও সক্ষমতা থাকা অবস্থায় যারা সে ভূখণ্ড ত্যাগ করে অন্যত্র হিজরত করে চলে যায় না তাদের প্রতি খুব রাগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে এভাবে: "যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় জিজ্ঞেস করলো: তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা জবাব দিলো, আমরা পৃথিবীতে ছিলাম দুর্বল ও অক্ষম। ফেরেশতারা বললো, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না? তোমরা কি সেখানে হিজরত করে অন্যস্থানে যেতে পারতো না? জাহান্নাম এসব লোকের আবাস স্থিরীকৃত হয়েছে এবং আবাস হিসেবে তা বড়ই খারাপ জায়গা। তবে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু যথার্থই অসহায় এবং তারা বের হওয়ার কোনো পথ-উপায় খুঁজে পায় না, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেবেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়" (সুরা নিসা, ৪: ৯৭-৯৯)।

এমনকি এ সকল দুর্বল ও অক্ষম লোকদের সম্পর্কেও কুরআনের বাণী হচ্ছে "হয়তবা আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন"। এখানে নিশ্চিতসূচক শব্দ উল্লেখ না করে আশাব্যঞ্জক শব্দের মাধ্যমে জুলুম-অত্যাচার সহ্য করার প্রতি তিরস্কার ও নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে।

মুসলমানদের অন্তরে জুলুম-অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিরোধ স্পৃহা সৃষ্টি করার জন্যই মূলত কুরআন শরিফে ফেরাউন, হামান, কারূণসহ তাদের সহযোগী জালেম শাসকদের জুলুমের বিবরণ বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তাদের জুলুমের শিকার মজলুম অসহায়দের দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করা ও তা থেকে তাদেরকে উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

অসৎ কাজের প্রতিবিধান আবশ্যক

আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সা. হাদিসে অসৎ কাজের প্রতিবিধান না করে চুপ থাকা এবং দুষ্টের দমন না করে তা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করা ইত্যাদির প্রতি এরূপ কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ ও তিরস্কার করা হয়েছে যা সরিষা দানার মতো সামান্য ইমানের অধিকারী ব্যক্তির অন্তরকেও নাড়া দিতে বাধ্য।

আল্লাহর কুরআন ঘোষণা দিচ্ছে: "বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে থেকে যারা কুফরির পথ অবলম্বন করেছে তাদের ওপর দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার আ. মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল, তাদের গৃহীত সেই কর্মপদ্ধতি বড়ই জঘন্য ছিল" (সুরা মায়েদা, ৫: ৭৮-৭৯)।

রসুল সা. বলেছেন: "তোমাদের কেউ যদি কোনো খারাপ কাজ বা বিষয় দেখে তাহলে সে যেন হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করে দেয়, যদি তা করতে অপারগ হয় তাহলে যেন মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করে, যদি তাও করতে সক্ষম না হয় তাহলে যেন অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করে, আর এটাই হচ্ছে ঈমানের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বলতম স্তর"।[৮]

এখানে খারাপ কাজকে শুধুমাত্র চেনা-ব্যভিচার, মদ্যপান অথবা এ জাতীয় কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ভুল হবে। জনগণের মান-সম্মান ভূলণ্ঠিত করা, নির্বাচনে কারচুপি করা ইত্যাদি থেকে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে? নির্বাচনে ভোট প্রদান তথা সাক্ষ্য দানে বিরত থাকাও এক ধরনের অপরাধ; কারণ এর মাধ্যমে সাক্ষ্য গোপন করার ন্যায় অপরাধে অপরাধী হতে হয়। এমনিভাবে অনুপযুক্ত হাতে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা, জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করা, ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুত করা, ইনসাফপূর্ণ আদালতের মাধ্যমে দন্ডপ্রাপ্ত অপরাধ ব্যতীত কাউকে গ্রেফতার করা, জেলখানা ও বন্দীশালাগুলোতে বিভিন্ন উপায়ে মানুষের ওপর জুলুম-অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে কাজ সমাধা করে দেওয়া, জালেম শাসকদের তোষামোদ করা এবং মুমিন ব্যতীত আল্লাহর দুশমনদের সাথে আঁতাত করা ইত্যাদিও ওই সকল অপরাধের অন্তর্ভুক্ত যা অবশ্যই হাত, মুখ অথবা অন্তর দিয়ে হলেও পরিবর্তন এবং দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

---

[৮] ইমাম মুসলিমসহ আরো অনেকেই আবু সাঈদ খুদরী থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন।

এভাবে আমরা দেখি খারাপ ও অসৎ কাজের পরিব্যাপ্তি মূলত অনেক প্রশস্ত ও দীর্ঘ এবং এটি এমন সকল বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে যা রাজনীতির মৌলিক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

তাই ধর্মপ্রাণ, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশী কোনো মুসলিমের কি সুযোগ বা অনুমতি থাকতে পারে যে, কাটাবিদ্ধ হওয়ার ভয়ে অথবা দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের লোভে কিংবা জীবনের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে এ সকল পাপাচার ও অসৎ কাজ দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এবং ময়দান খালি করে পালিয়ে বেড়ানো?

> এ ধরনের অসুস্থ চিন্তা-ভাবনা যদি মুসলিম জাতির মধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করে তাহলে এ জাতির মিশনের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং জাতিও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। কারণ এর মাধ্যমে মূলত এ জাতি তার নিজের স্বকীয়তা ও আত্মপরিচিতি হারিয়ে অন্য কোনো জাতির পরিচয় ধারণ করে থাকে। অথচ কুরআনে এ জাতি তার নিজের স্বকীয়তা ও আত্মপরিচিতি হারিয়ে অন্য কোনো জাতির পরিচয় ধারণ করে থাকে। অথচ কুরআনে এ জাতির পরিচয় ও এর মিশনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে: "তোমারাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য। তোমরা নেকির হুকুম দিয়ে দাও, দুষ্কৃতি থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনো" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১১০)।

আমরা যদি রসুলের সা. মুখ থেকে মুসলিম জাতির জীবনের এ মিশন সম্পর্কে কোনো সাবধানবাণী পেয়ে থাকি তাহলে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তিনি বলেন: "যখন আমার উম্মত জালেমকে জালেম বলতে ভয় করবে তখন বুঝে নিতে হবে যে তারা তাদের পরিচয় ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে"।[১]

ঈমানের দাবি অনুযায়ী একজন মুসলিম কখনো কোনো পাপাচার বা অন্যায় কাজের সামনে নীরব দশর্কের ভূমিকায় থাকতে পারে না, তা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক যে কোনো প্রকারের হোক না কেন; বরং তার উচিত সামর্থ থাকা অবস্থায় পেশিশক্তির মাধ্যমে তা প্রতিরোধ এবং পরিবর্তন করতে এগিয়ে আসা যদি তা করতে সক্ষম না হয় তাহলে আদেশ-উপদেশ অথবা বর্ণনা-

---

[১] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলতার মুসনাদ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন।

বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে তা পরিবর্তনে এগিয়ে আসা, যদি তাও না পারা যায় তাহলে এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্তর হলো অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করা এবং মনে মনে তা প্রতিরোধ এবং পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যাওয়া যা হাদিসের ভাষায় "দুর্বলতর ইমান" নামে পরিচিত। রসুল সা. এখানে অন্তর দিয়ে পরিবর্তনের কথা বলেছেন, কারণ অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা হচ্ছে মূলত অন্যায়-অনাচার এবং এর ধারক-বাহকদের প্রতিরোধ এবং পরিবর্তন করে মানসিক প্রস্তুতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাথমিক পদক্ষেপ। এ ধরনের প্রস্তুতি কিংবা সিদ্ধান্ত নেতিবাচক নয় যেমনটি ধারণা করা হয়ে থাকে। যদি এমনটি হতো তাহলে হাদিসের ভাষায় এখানে "অন্তর দিয়ে পরিবর্তনের" কথা উল্লেখ করা হতো না।

জুলুম-অত্যাচার ও পাপাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে বিবেক, বিদ্যা-বুদ্ধি, অন্তর ইত্যাদিকে সর্বদা প্রস্তুত রাখার ফলাফল একদিন না একদিন মিলবেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ ঘৃণা, ক্ষোভ বা সিদ্ধান্ত ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ কোন না কোনো সময়েই হতে বাধ্য। কোনো একদিন ইতিবাচক ফল নিয়ে এর আত্মপ্রকাশ ঘটবেই। কখনো তা জনবিপ্লবে পরিণত হতে পারে, আবার কখনো গণবিস্ফোরণের রূপ নিতে পারে। কারণ জুলুম-অত্যাচারের ভারে দেওয়ালে যখন পিঠ ঠেকে যায় তখন তা বিস্ফোরণ ও বিপ্লবের জন্ম দেয়। সৃষ্টিজগতে এটাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার চিরাচরিত বিধান।

এখানে হাদিসে যা "অন্তর দিয়ে পরিবর্তন" বলে নামকরণ করা হয়েছে, অন্য হাদিসে "অন্তরের জিহাদ" বলে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আর এটি হচ্ছে সর্বশেষ স্তরের জিহাদ যেমনিভাবে এখানে সর্বনিম্ন স্তরের তথা দুর্বলতর ইমান বলা হয়েছে। ইমাম মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে (মারফু' হিসেবে) বর্ণনা করেন: "আমার পূর্বে বিভিন্ন জাতির কাছে যত নবি ও রসুল প্রেরণ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্য ওই জাতি থেকে বাছাইকৃত কতিপয় একনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথী ছিল, যারা তার বিধি-বিধান আঁকড়ে ধরে এবং আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করে চলেছিল। অতঃপর তাদের পর অন্য এক প্রজন্ম আসল যাদের কথা ও কাজের মিল নেই, যারা বলে এক, কিন্তু কাজ করে ভিন্ন এবং যা করতে বলা হয়নি তারা তাই করে থাকে। যে বা যারা তাদের বিরুদ্ধে বাহুবলের সাহায্যে জিহাদ করবে তারা মুমিন বলে গণ্য হবে এবং যারা মুখের সাহায্যে জিহাদ করবে তারাও মুমিনের কাতারে শামিল হবে, এমনিভাবে যারা অন্তর দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে তারাও মুমিনের দলভুক্ত হবে। এরপরও যারা থেকে যাবে বুঝে নিতে হবে এদের অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণও ইমান নেই"।

ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক উদ্যোগ

কখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে অন্যায়-অনাচারের প্রতিবিধান অসম্ভব হয়ে পড়ে, বিশেষ করে তা যখন সমাজে সয়লাব হয়ে যায় অথবা এর ভিত্তি যদি মজবুত হয়ে পড়ে এবং এর ধারক-বাহকরা শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর হয়ে পড়ে, অথবা তা যদি শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, যারা মূলত এর ধরক-বাহক হওয়ার পরিবর্তে এর বিরুদ্ধে প্রথম সারির লড়াকু হওয়ার কথা ছিল। এখানে অবস্থান প্রচলিত একটি প্রবাদের সাথে মিলে যায় তা হচ্ছে: "রক্ষকই যখন ভক্ষকে পরিণত হয়", অথবা অন্য ভাষায়: "বকরির পালকে নেকড়ে থেকে হেফাজতের জন্য রাখাল রয়েছে। কিন্তু রাখাল যদি নেকড়েতে পরিণত হয় তাহলে বকরির কি অবস্থা হবে?" তাই এমতাবস্থায় অবশ্যই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর প্রতিবিধানে এগিয়ে আসতে হবে। এখানে পারস্পরিক সহযোগিতা নিঃসন্দেহে ওয়াজিব বা আবশ্যক। এটি হচ্ছে ভালো ও কল্যাণকর কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দল-উপদল, সমবায়-সংস্থা বা সংগঠন ইত্যাদির মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে এর প্রতিবিধানে এগিয়ে আসা শরিয়াহ্ নির্ধারিত ফরজ বা আবশ্যক এবং পরিস্থিতিরও দাবি।

অধিকার ও ওয়াজিব

বর্তমান সভ্য জগতের বিভিন্ন, দর্শন ও সংগঠনে বাকস্বাধীনতা, যুক্তিযুক্ত সমালোচনা, বিরোধিতা বা পর্যালোচনা এ জাতীয় বিষয়গুলোকে মানুষের 'অধিকার' বলে বিবেচনা করা হচ্ছে; কিন্তু ইসলাম এ বিষয়গুলোকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বিবেচনা করেছে। ইসলামের ভাষায় এগুলো মানুষের পবিত্র দায়িত্বও বটে, যার অবহেলার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও অনিবার্য শাস্তি।

অধিকার ও ওয়াজিবের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। অধিকার এর আওতায় বৈধ ও পছন্দনীয় বিষয় রয়েছে যা কেউ ইচ্ছে করলে করতে পারে আর ইচ্ছা না হয়ে এড়িয়ে যেতে পারে। আর 'ওয়াজিব' বা 'ফরজ' তা শরিয়াহসম্মত কোনো অসুবিধা ব্যতীত না করা বা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই, সুতরাং এ দুইয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

> যে বিষয়টি একজন মুসলিমকে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে বাধ্য করে তা হচ্ছে: তার ঈমানের দাবি অনুযায়ী সে অপরের, বিশেষ করে তার অপর মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ-দুর্দশা, সমস্যাবলী ইত্যাদির প্রতি খেয়াল না করে এককভাবে জীবনযাপন করতে পারে। ইসলাম প্রদত্ত ভ্রাতৃত্ববোধের দাবি হচ্ছে তাকে অবশ্যই বিপদ-আপদে, সুখে-দুঃখে

> সর্বাবস্থায় অপর ভাইয়ের পার্শ্বে দাঁড়াতে হবে। "নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পরে ভাই-ভাই" (সুরা হুজরাত, ৪৯: ১০)।

হাদিস শরিফে বলা হয়েছেঃ "মুসলমানদের সমস্যার ব্যাপারে যার কোনো আগ্রহ নেই সে তাদের দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ, রসুল, মুসলিম শাসকগোষ্ঠী এবং জনসাধারণকে আদেশ-উপদেশ বা পরামর্শ ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ কামনায় আগ্রহ পোষণ করে না সে তাদের দলভুক্ত নয়। কোনো বাড়ির আঙিনায় অথবা কোনো বসতভিটায় যদি কেউ অভুক্ত অবস্থায় রাত যাপন করে তাহলে সেখানকার অধিবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সা. কোনো দায়-দায়িত্ব থাকে না"।[১০]

> কুরআনে যেভাবে অসহায় মিসকিনকে খাবার প্রদান আবশ্যক করা হয়েছে, তেমনিভাবে তাদেরকে খাবার প্রদানে অপরকে উৎসাহ প্রদানও আবশ্যক করা হয়েছে এবং জাহেলিয়াতের ঐ সকল লোকদের ন্যায় আচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যাদেরকে নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করে কুরআনে বলা হয়েছেঃ "কখনই নয়, বরং তোমরা এতিমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না এবং মিসকীনকে খাবার প্রদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না" (সুরা ফজর, ৮৯: ১৭-১৮)। এছাড়াও এ সকল বিষয়ে অমনযোগী হওয়া এবং অবহেলা প্রদর্শনকে কর্মফল তথা আখিরাতকে অস্বীকার করার আলামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "তুমি কি তাকে দেখেছো, যে আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে মিথ্যা বলেছে? সে-ই তো এতিমকে ধাক্কা দেওয়া এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না" (সুরা মাউন, ১০৭: ১-৩)।
>
> কুরআনের অপর এক স্থানে একেও আখিরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যেমনিভাবে কুফরীর কারণে শাস্তির কথা বলা হয়েছেঃ "সে মহান আল্লাহর প্রতি ইমান পোষণ করতো না এবং দুস্থ মানুষকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না" (সুরা হাক্কাহ, ৬৯: ৩৩-৩৪)।

এ ধরনের অসহায়, অভাবী ও মিসকিনদের অধিকার হরণই পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী ও জায়গিরদারী সমাজগুলোতে বিভিন্ন ধরনের বিপ্লবের সূচনা করে থাকে। হারানো

---

[১০] তাবরানি হুযাইফা থেকে আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর আর-রাজীর সনদে এ হাদিস বর্ননা করেন। হাদিস বিশারদগণ তার ব্যাপারে বিপরীতধর্মী কথা বলেছেন। দেখুনঃ মাজমায়ু'য যাওয়ায়েদ : (১/৮৭), আল মুনতাক্বা মিন তারগীব ওয়া তারহীব (৯৯৭)।

অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই এখানে গরিব অসহায় জনগোষ্ঠী সম্পদশালী শোষক শ্রেণিদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়ে থাকে।

ইসলাম একজন মুসলিমের নিকট যেভাবে সামাজিক অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করার দাবী করে, তেমনি রাজনৈতিক অত্যাচার-অনাচারের বিষয়েও একই দাবি করে তা যত প্রকারই হো না কেন। জুলুম-অত্যাচারকে হালকা করে দেখা এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর না হয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা পুরো জনবসতির ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি ও গজব নাজিলকে আবশ্যক করে। এ ক্ষেত্রে জালেম ও অত্যাচারী এবং এর নীরব দর্শক উভয়ই অপরাধের ক্ষেত্রে সমান পর্যায়ের। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আর সেই ফিতনা থেকে দূরে থাকো, যার অনিষ্টকারিতা শুধুমাত্র তোমাদের গোনাহগারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না" (সুরা আনফাল, ৮: ২৫)।

কুরআনে ওই সকল জাতির প্রতি নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে যারা জালেম ও অত্যাচারী শাসকদের অনুগত হয়ে বেঁচে থাকে এবং তাদের অঙ্কিত পথ ধরেই জীবন যাপন করে থাকে। যেমন নূহের আ. জাতি সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে: "নূহ বললো: হে প্রভু, তারা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এ সব নেতার অনুসরণ করেছে যারা সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পেয়ে আরো বেশি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেছে" (সুরা নূহ, ৭১: ২১)। হুদের আ. জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে: "তারা প্রত্যেক স্বৈরাচারীর তথা সত্যের দুশমনদের আদেশ মেনে চলেছে" (সুরা হুদ, ১১: ৫৯)। ফেরাউনের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে: "সে (ফেরাউন) তার জাতিকে হালকা ও গুরুত্বহীন মনে করেছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল ফাসেক" (সুরা আয যুখরুফ, ৪৩: ৫৪)।

বরং জালিম ও অত্যাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি শুধুমাত্র আন্তরিক ঝোঁক ও দুর্বলতা পোষণ করাকেও আল্লাহর আজাব নাজিলের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: "আর তোমরা জালেমদের দিকে মোটেই ঝুঁকবে না, অন্যথায় জাহান্নামের গ্রাসে পরিণত হবে এবং তোমরা এমন কোনো পৃষ্ঠপোষক পাবে না যে আল্লাহর হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে আর কোথাও তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য পৌছবে না" (সুরা হুদ, ১১: ১১৩)।

ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমের ওপর রাজনৈতিক দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। তাকে অবশ্যই রাষ্ট্রে বসবাস করতে হবে যা একজন মুসলিম শাসকের নেতৃত্বে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে। আর জনগণকে তার হাতে বাইয়াত তথা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় জাহেলিয়াতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে: "যে ব্যক্তি কোনো ইমাম তথা শাসকের হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ ব্যতীরেকে মৃত্যুবরণ করল সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল"।[১১]

নামাজ এবং রাজনীতি

একজন মুসলিম হয়তবা নামাজের মধ্যে থাকতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে রাজনীতির সাগরে নিমজ্জিত হতে পারে যখন সে নামাজের মধ্যে ওই সকল বিষয়বস্তু সম্বলিত কুরআনের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে যা এখন রাজনীতির মৌলিক বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত। যে ব্যক্তি সুরা মায়েদাহ তেলাওয়াত করবে, বিশেষ করে ওই আয়াতগুলো যেখানে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক শাসন কার্য পরিচালনা করবে না তাদেরকে কাফির, জালিম ও পাপাচারী ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে: "আর যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফির" (সুরা মায়েদা, ৫: ৪৪), "আর যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই জালেম" (সুরা মায়েদা, ৫: ৪৫), "আর যারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে না তারাই ফাসেক" (সুরা মায়েদা, ৫: ৪৭)। এ সকল আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে সে হয়তবা রাজনৈতিক বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে। এ সকল আয়াত শোনার পর কেউ তাকে কট্টর সরকার বিরোধী বলে বিবেচিত করতে পারে, কারণ এর মাধ্যমে সে শাসনগোষ্ঠীকে কাফির জালিম কিংবা ফাসিক অথবা এর সবগুলোর মাধ্যমে অভিযুক্ত করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলছে।

এমনিভাবে কেউ যদি কুরআনের ওই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে যেখানে মুসলিম ব্যতীত অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা থেকে সাবধান করা হয়েছে: "হে ইমানদারগণ! মু'মিনদের বাদ দিয়ে

---

১১ ইমাম মুসলিম তার গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন।

কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে দাও?" (সূরা নিসা, ৪: ১৪৪)।

"মু'মিনরা যেন ইমানদারদের বাদ দিয়ে কখনো কাফেরদের নিজেদের পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু, সহযোগী হিসেবে গ্রহণ না করে। যে এমনটি করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ, তাদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমরা যদি বাহ্যত এ নীতি অবলম্বন করো তাহলে তা মাফ করে দেওয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন আর তোমাদেরকে তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ২৮)।

"হে ইমানদারগণ! যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য (জন্মভূমি ছেড়ে ঘর থেকে) বেরিয়ে থাক তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করো, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে" (সূরা মুমতাহিনা, ৬০: ১)।

"হে ইমানদারগণ! তোমাদের নিজেদের জামায়াতের লোকদের ছাড়া অন্য কাউকে তোমাদের গোপন কথার সাক্ষী করো না। তারা তোমাদের দুঃসময়ের সুযোগ গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না যা তোমাদের ক্ষতি করে তাই তাদের কাছে প্রিয়। তাদের মনের হিংসা ও বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকে ঝরে পড়ে এবং যা কিছু তারা নিজেদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে তা এর চাইতেও মারাত্মক" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১১৮)।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি "কুনুতে নাযিলাহ" পড়ে যা ইসলামি ফিকহর সর্বস্বীকৃত একটি বিষয়। শেষ রাকআতে রুকু থেকে ওঠার পর দোয়া করা হয়, বিশেষ করে প্রকাশ্যে কিরাত বিশিষ্ট নামাজগুলোতে তা পড়া হয়। মুসলমানদের ওপর যখন কোনো বিপদ আপদ কিংবা শত্রুবাহিনীর আক্রমণ, ভূমিকম্প অথবা জলোচ্ছাস ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি আপতিত হয়, তখন তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে যে প্রার্থনা করা হয় তাই হচ্ছে কুনুতে নাযিলা। বিপদ-মুসিবতে আল্লাহর কাছে ধর্না দেওয়ার জন্য ইসলামি শরিয়াহ এ ধরনের প্রার্থনার অনুমোদন করেছেন।

সে সময়ের কথা এখনো স্মৃতির পাতায় অম্লান হয়ে আছে যখন শহীদ ইমাম হাসানুল বান্না ইসলামি শরিয়তের এ হুকুম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী

ইংরেজদের বিরুদ্ধে মিশরের জনগণকে সোচ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন তিনি "আল ইখওয়ান আল মুসলিমুন" পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, তারা যেন নামাজে কুনুতে নাযিলাহ পড়ার মাধ্যমে জবরদখলকারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানায়। তিনি এ দোয়ার কতিপয় বাক্যেরও প্রস্তাব করেছিলেন; কিন্তু তিনি কারো ওপর তা চাপিয়ে দেননি। তবুও আমরা তখন তা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম এবং নামাজে আমরা তা দিয়েই আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাতাম। দোয়ার বাক্যগুলো যা ছিল: "হে আল্লাহ! বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, ভীত-সন্ত্রস্তকে নিরাপত্তাদানকারী, অহংকারীকে লাঞ্ছনাকারী এবং জালেম ও অত্যাচারীদের ধ্বংসকারী। হে আল্লাহ! তুমিতো জানো এ জালেম ইংরেজ দস্যু বাহিনী আমাদের দেশকে জবর দখল করেছে, আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে, জনপদে জুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছে, ফিতনা ফাসাদে দেশকে চুরমার করে দিচ্ছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করুন, তাদের তেজস্বীতাকে ভোঁতা করে দিন, তোমার ভূ-খণ্ডে তাদের কর্তৃত্বের অবসান করে দিন এবং তোমার মুমিন বান্দাদের তাদের জুলুম-অত্যাচার থেকে হেফাজত করুন। হে আল্লাহ! যারা তাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিচ্ছে তারাসহ সবাইকে শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর হাতে পাকড়াও করুন..."। এমনিভাবে আমরা বিনয়ী ও দুনিয়া বিমুখ অবস্থায় নামাজের কাতারে থেকেও রাজনীতির যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। এটাই হচ্ছে মূলত ইসলামের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, এখানে দ্বীনকে দুনিয়া থেকে এবং দুনিয়াকে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। রাষ্ট্র ব্যতীত ধর্ম এবং ধর্ম ব্যতীত রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

রাজনীতি বিহীন ধর্ম এবং ধর্মহীন রাজনীতির দাবি

আগে যারা মনে করতো ধর্মের সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো কালেও ছিল না, আর যারা পরে "রাজনীতিতে ধর্মের কোনো স্থান নেই এবং ধর্মে রাজনীতি নেই" এ জাতীয় মিথ্যা শ্লোগানে গলা ফাটিয়ে ফেলে, তারাই মূলত: সর্বপ্রথম কথায় ও কাজে তাদের এ দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাকে।

এ জাতীয় লোকেরা সর্বদা ধর্মকে তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, আবার কখনো এর মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চেষ্টা করে। এরা সর্বদা মাওলানা নামধারী স্বল্পজ্ঞানী কতিপয় দুনিয়ালোভী ব্যক্তি থেকে ফতোয়া সংগ্রহের মাধ্যমে তা দিয়ে তাদের তথাকথিত দুনিয়া আখিরাত ধ্বংসকারী রাজনীতির বিরোধিতা করে তাদেরকে অপদস্থ করতে সচেষ্ট থাকে!

আমার স্মৃতির পাতায় এখনো অম্লান হয়ে আছে, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে আমরা যখন 'তুর' জেলখানায় ছিলাম, তখন আমাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল যে আমরা (যারা কুরআনের শাসন এবং ইসলামের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের আহবায়ক) না-কি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করছি, পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়াচ্ছি, তাই আমাদের প্রাপ্য উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে আমাদের হত্যা করা, অথবা ডান হাত এবং বাম পা কিংবা এর বিপরীতভাবে কেটে ফেলা, অন্যথায় আমাদের নির্বাসন দেওয়া!

একাধিকবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। অনেকবার এ ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে যদিও তার আকার-আকৃতি বা স্টাইল সময়ে সময়ে ভিন্ন ছিল।

এখনো আমি স্মরণ করছি (অনেকেই এখনো স্মরণ করে থাকে) যখন একদল সচেতন, ধর্মপ্রাণ ও ব্যক্তিত্ববান আলেম থেকে এ মর্মে ফতোয়া জারি করা হয়েছিল যে, ইসরাঈলের সাথে যে কোনো সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া হারাম ও অবৈধ এবং তা আল্লাহ, তাঁর রসুল ও মুমিনদের সাথে খেয়ানত করার শামিল; কিভাবে তখন এ জাতীয় লোকেরা তাদের বিভ্রান্ত রাজনীতির সমর্থন পাওয়ার লক্ষ্যে একদল তথাকথিত ফতোয়াবাজ আলেম থেকে ইসরাঈলের সাথে সন্ধি ও মিত্রচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার শরয়ী বৈধতা চেয়ে ফতোয়া দাবি করেছিল!

> এখনো পর্যন্ত শাসকগোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ফতোয়া চেয়ে আলেমদের কাছে ধর্না দিয়ে চলছে। এর সর্বশেষ ছিল ব্যাংক ইন্টারেস্ট ও বিনিয়োগবন্ড ইত্যাদিকে শরয়ী বৈধতা দানের প্রচেষ্টা। অবশ্য দুনিয়ালোভী ও স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন তথাকথিত কতিপয় আলেম এ আহবানে সাড়াও দিয়েছিল; কিন্তু খোদাভীরু, সুদক্ষ ও পারদর্শী আলেমরা এখনো এর প্রতিবাদ করে চলছে। "যারা আল্লাহর বাণী প্রসার ও প্রচার করে থাকে তারা তাঁকেই ভয় করে এবং আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না আর হিসেব গ্রহণের জন্য কেবলমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট" (সুরা আহযাব, ৩৩: ৩৯)।

রাজনীতি কি অপ্রীতিকর বিষয়?

তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে রাজনীতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি মর্যাদাসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কার্যত সেটা একটি মানসম্পন্ন ও জনকল্যাণকর পেশাও বটে; কারণ যথাসম্ভব সুন্দর পদ্ধতিতে জগত সংসার পরিচালনার কলাকৌশল সম্পর্কিত আলোচনাই এখানে মুখ্য বিষয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম ইমাম আবুল ওয়াফা ইবনে আকিল হাম্বলি থেকে বর্ণনা করেন যে, রাজনীতি হচ্ছে এমন কাজ যার মাধ্যমে মূলত মানুষ কল্যাণের নিকটবর্তী হয় এবং অকল্যাণ থেকে দূরে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে শরিয়তের কোনো বিধি নিষেধ লঙ্ঘন না করা হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম আরো উল্লেখ করেছেন: "ইনসাফপূর্ণ রাজনীতি কখনো শরিয়তের বিধি-বিধানের পরিপন্থী হতে পারে না; বরং তা শরিয়তের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তা শরিয়তের অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে। প্রচলিত পরিভাষায় আমরা একে রাজনীতি বলে থাকি; আসলে এটি মূলত আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ইনসাফ বৈ অন্য কিছু নয়।[১২]

আমাদের অতীত আলেম-উলামাগণও রাজনীতির গুরুত্ব এবং মর্যাদার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম গাজ্জালী বলেন: "দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের চারণভূমি, দুনিয়া ব্যতীত দ্বীনের পরিপূর্ণতা অর্জিত হয় না। ধর্ম এবং রাষ্ট্র দুই সহোদর ভাই তুল্য, ধর্ম হচ্ছে মূল, আর রাজা-বাদশাহ হচ্ছে এর প্রহরীর ন্যায়। মূল ছাড়া কোনো জিনিসের ধ্বংস অনিবার্য, তেমনিভাবে প্রহরী ছাড়া কোনো জিনিস নষ্ট হতে বাধ্য"।[১৩]

ড. জিয়া উদ্দীন রাইছ ইমাম এবং খেলাফতের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে: এহচ্ছে দ্বীনের "হেফাজত" এবং দ্বীনের মাধ্যমে পরিচালিত দুনিয়ার 'রাজনীতি'র ক্ষেত্রে শরিয়াহ প্রণেতা তথা রসুলের সা. সার্বিক প্রতিনিধিতুল্য।[১৪] সুতরাং দ্বীনের সংরক্ষণ এবং রাজনীতির সমন্বয়ই হচ্ছে খেলাফত।

রসুল সা. দ্বীনের আহ্বায়ক, শিক্ষক ও বিচারক ইত্যাদি হওয়ার পাশাপাশি একজন রাজনীতিবিদও ছিলেন। জাতির ইমাম হওয়ার সাথে সাথে তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরই দেখানো পথ ধরে রাজনীতি করেছেন সঠিক পথপ্রাপ্ত ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনগণ। তাঁরা আদল-ইনসাফের সাথে জাতিকে পরিচালনা করেছিলেন এবং ইমান-আমল ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে জাতির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

---

[১২] দেখুন : ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম প্রণীত আত্ তুরুক আল হুকমিয়্যাহ ফি আস্ সিয়াসাত আশ শরীয়াহ, পৃষ্ঠা : ১৩-১৫, আস্ সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহ কর্তৃক মুদ্রিত।

[১৩] ইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন : ১/১৭, জ্ঞান অর্জন সংক্রান্ত অধ্যায়, যা ফরজে কিফায়া। দারুল মা'রেফা, বৈরুত থেকে মুদ্রিত।

[১৪] দেখুন : ইসলামি রাজনীতির তত্ত্বকথা - ড. জিয়া উদ্দীন রাইছ, পৃষ্ঠা : ১২৫, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ।

কিন্তু বর্তমান সময়ের মানুষ, বিশেষ করে আমাদের এ ভূ-খণ্ডের অধিবাসীরা এবং রাজনীতিবিদ কর্তৃক নানাবিধ জুলুম-অত্যাচারের শিকার হওয়ার কারণে এখন রাজনীতি সংক্রান্ত সকল কিছুকে ঘৃণা ও অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছেন। রাজনীতি এখন তাদের অ্যালার্জি রোগে পরিণত হয়েছে: চাই তা উপনিবেশিক রাজনীতির জুলুম-অত্যাচারের কারণে হোক, অথবা বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠী কিংবা জালেম শাসকবর্গ ইত্যাদির জুলুম-অত্যাচারের কারণে হোক। সর্বোপরি বর্তমান রাজনীতি বিশেষ করে (Machiavellianism) ম্যকিয়াভেলিয়্যানিজম[১৫] দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হওয়ার কারণে এখন তা জনগণের চক্ষুশুলে পরিণত হয়েছে। এমনকি ইমাম আবদুহু এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি রাজনীতির এ ধোকা ও প্রতারণার তিক্ততা ভোগ করার পর তার ঐতিহাসিক এ উক্তি করেছিলেন: "রাজনীতি, রাজনীতিবিদ, এর নেতা, এর মাধ্যমে পরিচালিত বিষয়াদি, তথা রাজনীতি সংশ্লিষ্ট সকল কিছু থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি"!

রাজনীতির প্রতি মানুষের এ ধরনের বিতৃষ্ণা, ঘৃণা ও ক্ষোভ ইত্যাদিকে পুঁজি করেই ইসলাম বিরোধী ও ইসলামি রেঁনেসার দুশমনেরা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামি আন্দোলনকে ঘায়েল করা এবং ইসলামের জাগরণ রোধ করার জন্যই মূলত তারা ইসলামি জীবনব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের আহ্বানকে "রাজনৈতিনক ইসলাম" ইত্যাদি নামে নামকরণ করে চলছে।

বর্তমান সময় এটি চিরাচরিত নিয়ম পরিণত হয়েছে যে, ধর্মপ্রাণ কোনো মুসলিম ব্যক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়: "সে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত"। মূলত তাকে অপমান ও নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে এবং মানুষের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করার জন্য এমনটি করা হয়।

আরবের পশ্চিমাঞ্চলের কোনো এক দেশে একদা পর্দানশীন কতিপয় মুসলিম রমণী একজন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাছে এ মর্মে অভিযোগ করতে হাজির হলো যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো ফ্যাকাল্টিতে ভর্তির জন্য হিজাব খুলে আসার শর্ত করা হয়েছে। তারা এ ব্যক্তিত্বের কাছে এ আবেদন রাখল যে, তিনি যেন তাদের ওপর এ ধরনের শর্তাদি যেমন: মাথা খোলা রাখা, সর্ট জামা পরিধান করা ইত্যাদি যা আল্লাহ ও তাঁর রসুল সা. হারাম করেছেন, শিথিল করতে সুপারিশ

---

[১৫] যার থিওরি হচ্ছে "উদ্দেশ্যই উপায়কে গ্রহণযোগ্য করে তোলে"। অর্থাৎ উদ্দেশ্য যদি ভালো ও মহৎ হয় তাহলে তা অর্জনের যে কোনো উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা যাবে, যদিও তা অসৎ ও খারাপ হয়ে থাকে।

করেন। এ সকল রমণীদের জন্য আরো বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল এবং হতবিহ্বল হয়ে পড়ল যখন ফ্যাকাল্টি থেকে তাদের বলা হল যে, এ সকল পোশাক মূলত হিজাব নয়; বরং এটি রাজনৈতিক ইউনিফর্ম!!

ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে তিউনেসিয়ার একজন বড় মাপের সেক্যুলার ব্যক্তির বক্তব্য ছিল যে, এ হচ্ছে সাম্প্রতিক পোশাক বা ইউনিফর্ম!

অপর এক ব্যক্তি খোলা ময়দানে ঈদের নামাজের ব্যাপারে মন্তব্য করে যে, এটা সুন্নাহ নয়; বরং এটা হচ্ছে মূলত রাজনৈতিক নামাজ! রমজানের শেষ দশ দিনের এতেকাফকে বলা হয়েছে যে, এটা মূলত রাজনৈতিক এতেকাফ! আগত দিনগুলোতে এটাও হয়তো অসম্ভব নয় যে, মসজিদে জামায়াতের সাথে যে নামাজ পড়া হয় তা রাজনৈতিক নামাজ হিসেবে বিবেচিত হবে! সিরাতে ইবনে হিশাম বা এ জাতীয় সিরাত গ্রন্থে ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অধ্যয়ন করা, যদিও তা সুখশ্রুতির জন্য হয়, অথবা বুখারি শরিফের "মাগাজী অধ্যায়" তথা যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস অধ্যয়ন করা ইত্যাদি হয়তো একদিন রাজনৈতিক অধ্যয়ন বলে গণ্য হবে! এমনকি কখনো স্বয়ং কুরআন তেলাওয়াত করা, বিশেষ করে নির্দিষ্ট কতিপয় সুরা তেলাওয়াত করাও রাজনৈতিক তেলাওয়াত হিসেবে গণ্য হতে পারে!

এটা কখনো স্মৃতি থেকে বিলীন হওয়ার মতো নয় যখন দেখি রাজনৈতিকভাবে অভিযুক্ত কতিপয় ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সুরা আনফাল মুখস্থের অভিযোগ পেশ করা হয়; কারণ তা হচ্ছে জিহাদের সুরা!! আবার কখনো সুরা আল ইমরান মুখস্থ করার অভিযোগ পেশ করা হয়; কারণ এখানে জিহাদের ময়দানের কঠিন পরীক্ষা, ধৈর্য এবং ময়দানে অটল ও অবিচল থাকা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে!

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা সম্ভব হলো যে, পাশ্চাত্যঘেষা এ সকল জনগোষ্ঠী "রাজনৈতিক ইসলাম" নামকরণের মাধ্যমে ইসলামের যে রূপকে ঘৃণা ও উপহাসের খোরাকে পরিণত করে তুলতে চায় সেটাই মূলত ইসলামের সঠিক ও সত্যিকার রূপ, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে বিধিবদ্ধ করেছেন এবং রসূল সা. ও তাঁর সুযোগ্য খলিফাগণ তা বাস্তবে রূপদান করেছেন, আর আল্লাহর কাছে তো ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলাম এবং

আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা

বর্তমানে কোনো কোনো পত্রিকায় মুসলমানদের মাঝে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধান মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনার আবশ্যকতা সম্পর্কে বেশ হৈ চৈ চলছে, সেখানে কয়েজন কলামিস্টের সন্দেহভাজন লেখা রসদের ভূমিকা পালন করে চলছে। এক্ষেত্রে আমরা এমন সব ব্যক্তিদের কাছে থেকে আশ্চার্যজনক এমনসব কথা শুনতে পাচ্ছি যাদের কাছে মূলত ইসলাম ও শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো জ্ঞান নেই।

প্রত্যাখ্যাত কিছু সন্দেহ

তাদের মধ্যে কতিপয়ের বক্তব্য হচ্ছে: যারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান মোতাবেক শাসকার্য পরিচালনা করে না কুরআনের যে সকল আয়াতে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং কুফরি, জুলুম ও পাপাচার ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে তা মুসলমানদের উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং এ সকল আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট অবস্থাদি থেকে বুঝা যায় যে, তা আহলে কিতাব তথা ইহুদি-নাসারাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এমনিভাবে আল্লাহর বাণী: "হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী তাদের যাবতীয় ফায়সালা করো এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না। সাবধান হয়ে যাও, এরা যেন তোমাকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করে সেই হেদায়াত থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত করতে না পারে, যা আল্লাহ্ তোমার প্রতি নাজিল করেছেন" (সূরা মায়েদা, ৫: ৪৯)। এ আয়াত সম্পর্কে তারা বলেঃ এ আয়াত কিতাবের মাধ্যমে অমুসলিমদের বিষয়াদি ফায়সালা করার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে; মুসলিমদের মাঝে ফায়সালার ব্যাপারে নয়!!

এদের মধ্যে আবার অনেকের বক্তব্য হচ্ছে: তর্কের খাতিরে যদি এ কথা মেনে নিই যে, এখানে আয়াতের মধ্যে মুসলমানরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; তাহলে আয়াতস্থ 'হুকুম' তথা ফায়সালা দ্বারা বিবাদমান দু'গ্রুপের মাঝে মীমাংসা অথবা বাদী-বিবাদীর মাঝে কোনো জিনিসের ফায়সালা করে দেওয়া, যা মূলত বিচার বিভাগের কাজ ইত্যাদির দিকেই ইঙ্গিত করবে। এখানে আয়াতস্থ 'হুকুম' দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা অথবা আইন প্রণয়ন করা ইত্যাদি বুঝানো হয়নি, যা মূলত রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক কিংবা কার্যনির্বাহী কমিটি যেমনঃ রাজা-বাদশাহ, রাষ্ট্রপ্রধানগণ অথবা

মন্ত্রিপরিষদ ইত্যাদির দায়িত্ব এবং আইন প্রণয়ন কমিটি যেমন: পার্লামেন্ট, সিন্ডিকেট বা সিনেট ইত্যাদির দায়িত্ব, যাদের আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে তা পরিবর্তন, সংশোধন অথবা রহিত করার অধিকার রয়েছে।

> এদের মধ্যে আবার অনেকে বলে থাকে: ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের আহবায়কগণ শরিয়তের যে অর্থ বা রূপ গ্রহণ করে থাকে, মূলত তা কুরআনে ব্যবহৃত 'শরিয়াহ' শব্দটি ওই অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে না। মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতগুলোতে শরিয়াহ দ্বারা মূলত ওই সকল খোদায়ী বিধানকে বুঝায় যা আকিদা-বিশ্বাস, আখলাক এবং সৎ ও ভালো গুণাবলী অর্জন ইত্যাদিরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে "অতঃপর হে নবি, আমি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাকে একটি সুস্পষ্ট রাজপথের (শরিয়াহ) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার ওপরেই চলো এবং যারা জানে না তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না" (সুরা জাছিয়া, ৪৫: ১৮)।

কতিপয় সচেতন ভাই এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করেন, এ জাতীয় একটি জীবন্ত বিষয় যেন আমার কলম থেকে বাদ না পড়ে। অনেকে এ আবেদন রাখেন যে, এ ধরনের একটি জীবন্ত ইস্যুতে প্রচলিত অনেক সন্দেহভাজন লেখার স্তুপের নিচে যে সত্যটি ঢাকা পড়ে আছে আমি যেন তা যথাযথভাবে জনসম্মুখে নিয়ে আসতে যথাসাধ্য সচেষ্ট হই।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা

এখানে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:

যে সকল বিষয় দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট সেগুলোর জন্য দলিল-প্রমাণ খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক

প্রথমত: এখানে এমন কতিপয় বিষয় রয়েছে সেগুলোকে ইসলামি আইনবিশারদগণ দ্বীনের সুস্পষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন, সেগুলোর জন্য কোনো দলিল-প্রমাণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। এর দ্বারা মূলত ওই সকল বিষয়াবলী বুঝানো হয়ে থাকে যেগুলোর সার্বিকভাবে কারো অজানা থাকে না এবং যেগুলো বুঝে নিতে কোনো যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। এগুলো বংশানুক্রমে সবাই জেনে-বুঝে ও পালন করে চলছে যা এখন ঐতিহাসিক বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে।

এ সকল বিষয়াবলী কতিপয় মৌলিক ভিত্তি ও সুপ্রতিষ্ঠিত কিছু মূলনীতিরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, যা মূলত জাতীয় ঐক্যমতের এবং চিন্তা, অনুভূতি ও কাজের ক্ষেত্রে জাতির সকল সদস্যদের অভিন্নতা ও একতাকেই চিত্রায়িত করে থাকে।

তাই এ সকল বিষয়াবলীতে মৌলিকভাবে মুসলমানদের মাঝে কোনো দ্বিমত, পর্যালোচনা কিংবা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তা প্রমাণ করার প্রচেষ্টা করতে যাওয়া নিরর্থক। তবে কেউ যদি ইসলামের মূল গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়ে তাহলে সে হয়তোবা এক্ষেত্রে দ্বিমত বা যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের দুঃসাহস দেখাতে পারে।

আমি মনে করি এ জাতীয় বিষয়াবলীতে যা কিছু রয়েছে তম্মধ্যে এ বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এবং তাঁর রসুল সা.-এর মাধ্যমে প্রদত্ত এ সকল বিধি-বিধান শুধুমাত্র এ জন্য অবতীর্ণ করেননি যে, বনি আদম এর থেকে বরকত হাসিল করবে, অথবা মৃতদের ওপর তা তেলাওয়াত করবে কিংবা সুন্দর কাগজ বা ব্যানারে লিখে দেওয়ালে ঝুলিয়ে তা দিয়ে দেওয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে; বরং এ সকল বিধি-বিধান এ জন্যই অবতীর্ণ করেছেন যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে এগুলো অনুসরণ করা হবে, জগত-সংসারের সকল বিভাগে তা বাস্তবায়ন করা হবে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক কাজকর্ম, লেনদেন ইত্যাদি পরিচালিত হবে এবং সর্বোপরি আল্লাহর প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধানের মাধ্যমে জীবনের যাবতীয় গতি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে তার প্রভু, ইসলামকে একমাত্র জীবন-বিধান, মুহাম্মদ সা. নবি ও রসুল এবং কুরআনকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছে, তাকে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুল সা. প্রদত্ত ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত তাকে মেনে চলতে হবে। সে তখন সাথে সাথে বলবে: শুনলাম, অতঃপর আনুগত্যের শির নত করলাম এবং এ ক্ষেত্রে সে আর কোনো যুক্তি-প্রমাণ খুঁজতে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করবে না।

আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনার আবশ্যকতা ওপর দলিল-প্রমাণের আধিক্যতা

দ্বিতীয়ত: আমরা আমাদের উল্লেখিত অবস্থান থেকে নেমে এসে যদি আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার আবশ্যকতা এবং মুসলমানদের জন্য তা মেনে চলার বাধ্যবাধকতা ইত্যাদির ওপর দলিল-প্রমাণ খুঁজতে বের হই, তাহলে আমরা সর্বোচ্চ জোর দিয়ে বলতে পারি যে সুরা মায়েদার ওই আয়াত ব্যতীত, যেখানে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনা করতে অস্বীকারীদেরকে কাফির, জালিম অথবা ফাসিক ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা

হয়েছে তা বাদ দিলেও আমরা কুরআন ও হাদিসে এমন অসংখ্য দলিল-প্রমাণ পাই যেগুলো আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ সকল বিধানকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা ইত্যাদির দিকে সুস্পষ্ট ও সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে পথনির্দেশ করেছে; চাই এর মাধ্যমে আমাদের স্বার্থ হাসিল হোক কিংবা না হোক। সুরা নিসা থেকে এ জাতীয় আয়াতগুলো অধ্যয়ন করে দেখি। "হে নবি! তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা এ মর্মে দাবি করে চলছে যে, তারা ইমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার ওপর নাজিল করা হয়েছে এবং সেই সব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমার পূর্বে নাজিল করা হয়েছিল; কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়সমূহের ফায়সালা করার জন্য তাগুতের দিকে ফিরতে চায়, অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার হুকুম দেওয়া হয়েছেলি? শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সরল সোজা পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই জিনিসের দিকে, যা আল্লাহ নাজিল করেছেন এবং এসো রসুলের দিকে, তখন তোমরা দেখতে পাও ওই মুনাফিকরা তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। তারপর তখন তাদের কি অবস্থা হয় যখন তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের ওপর কোনো বিপদ এসে পড়ে? তখন তারা কসম খেতে খেতে তোমার কাছে আসে এবং বলতে থাকে : আল্লাহর কসম আমরা তো কেবল মঙ্গল চেয়েছিলাম এবং উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো প্রকারে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক, এটিই ছিল আমাদের বাসনা। আল্লাহ জানেন তাদের অন্তরে যা কিছু আছে। তাদের পেছনে লেগো না, তাদেরকে বুঝাও এবং এমন উপদেশ দাও, যা তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যায়। (তাদেরকে জানিয়ে দাও) আমি যে কোনো রসুলই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে। আর যদি তারা এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতো, যার ফলে যখন তারা নিজেদের ওপর জুলুম করতো ওখন তোমার কাছে এসে যেতো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতো আর রসুলও তাদের জন্য ক্ষমার আবেদন করতো, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল হিসেবে পেতো। না, হে মুহাম্মদ! তোমার রবের কসম, এরা কখনো মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে, তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে তার নিজেদের মনের মধ্যে কোনো প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান দেবে না, বরং সর্বন্তকরণে মেনে নেবে" (সুরা নিসা, ৪: ৬০-৬৫)।

এমনিভাবে সুরা নূর থেকে এ জাতীয় আয়াতগুলো অধ্যয়ন করে দেখি: "এবং তারা বলে, আমরা ইমান এনেছি আল্লাহ ও রসুলের প্রতি এবং আমার আনুগত্য স্বীকার করেছি, কিন্তু এরপর তাদের মধ্য থেকে একটি

দল (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ ধরনের লোকেরা কখনোই মু'মিন নয়। যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে, যাতে রসুল তাদের পরস্পরের মোকাদ্দমার ফায়সালা করে দেন, তখন তাদের মধ্যকার একটি দল পাশ কাটিয়ে যায়। তবে যদি সত্য তাদের অনুকূল থাকে, তাহলে বড়ই বিনীত হয়ে রসুলের কাছে আসে। তাদের মনে কি (মুনাফিকীর) রোগ আছে? না তারা সন্দেহের শিকার হয়েছে? না তারা ভয় করছে আল্লাহ ও তাঁর রসুল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? আসলে তারা নিজেরাই জালেম। মু'মিনদের কাজ হচ্ছে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রসুল তাদের মামলা-মোকদ্দামার ফায়সালা করেন, তখন তারা বলেন, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। এ ধরনের লোকেরাই সফলকাম হবে" (সুরা নূর, ২৪: ৪৭-৫১)।

এমনিভাবে সুরা আহযাবে এসেছে

"যখন আল্লাহ ও তাঁর রসুল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন তখন কোনো মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়" (সুরা আহযাব, ৩৩: ৩৬)।

কুরআনের এ সকল সুস্পষ্ট আয়াতগুলো কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে না। এ সকল আয়াত থেকে এ কথা খুবই সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ফায়সালার সামনে শিরনত করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা কিছু ফায়সালা করে দিয়েছেন তার বিপরীতে মু'মিন নর-নারীদের দ্বিতীয় কোনো অপশন নেই। একজন মু'মিন থেকে এটাই আশা করা হয়, তাকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসুল প্রদত্ত কোনো বিধান বা ফায়সালা গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হবে তখন সে শুধু বলবে: শুনলাম এবং আনুগত্যের শির নত করলাম। আল্লাহ তায়ালা শপথ করার মাধ্যমে ওই সকল লোকদের ইমান না থাকার কথা ঘোষণা দিয়েছেন, যারা যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসুল প্রদত্ত বিধান মানার পরও শাসনকার্য বা বিচারকার্য পরিচালনায় আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিচারক ও ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের দিকে ইঙ্গিত করতে চাই, তা হচ্ছে: আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান শুধুমাত্র কুরআনের আয়াতগুলোতে সীমাবদ্ধ

নয়; বরং তা বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপনীত আদল-ইনসাফকেও অন্তর্ভুক্ত করে, উভয়টাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন: কিতাব এবং মিযান আল্লাহই তো নাজিল করেছেন যথাযথভাবে, তুমি তো জানো না চূড়ান্ত ফায়সালার সময় হয়তো অতি নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে" (সুরা আশ শুরা, ৪২: ১৭)। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: "আমি আমার রসুলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছে। তাদের সাথে কিতাব ও মিজান নাজিল করেছি যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে" (সুরা হাদিদ, ৫৭: ২৫)।

অতএব এখানে উভয়টাই হচ্ছে আলোকবর্তিকা। একটি হচ্ছে কুরআন থেকে উৎসরিত আলো, অপরটি হচ্ছে বিবেক-বুদ্ধি এবং মানুষের নির্মল স্বভাবজাত আলো যা দাড়িপাল্লা থেকে উৎসরিত, উভয়টিই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং উভয়টি হচ্ছে "আলোর ওপর আলো" (অর্থাৎ আলো বৃদ্ধির যাবতীয় উপকরণ এক হয়ে গেছে)।

সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত আয়াতসমূহ

তৃতীয়ত: সুরা মায়েদার আয়াতসমূহ যেখানে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে অস্বীকারীদের কাফির, জালিম কিংবা ফাসিক ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে, সে আয়াতগুলো তার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবেই পথনির্দেশনা দিচ্ছে।

কুরআনের এ সকল আয়াতগুলো যে অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত তা পুরোটাই এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি, যাতে চিন্তাশীল লোকদের চিন্তার খোরাক হতে পারে এবং বিবেকবান ও সচেতন লোকদের বিবেকের রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: "আমি তাওরাত নাজিল করেছি। তাতে ছিল পথ নির্দেশ ও আলো। সমস্ত নবি, যারা মুসলিম ছিল, সে অনুযায়ী এ ইহুদি হয়ে যাওয়া লোকদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করতো। আর এভাবে রব্বানি ও আহবার (এরই ওপর তাদের ফায়সালার ভিত্তি স্থাপন করতো)। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর ওপর সাক্ষী। কাজেই (হে ইহুদি গোষ্ঠী) তোমরা মানুষকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো এবং সামান্য তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে আমার আয়াত বিক্রি করা পরিহার করো। আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফির। তাওরাতে আমি ইহুদিদের জন্য এ বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ,

চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সব রকমের যখমের জন্য সমপর্যায়ের বদলা। তারপর যে ব্যক্তি ওই শাস্তি সাদকা করে দেবে তা তার জন্য কাফ্ফারায় পরিণত হবে। আর যা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই জালেম। তারপর ওই নবিদের পরে মরিয়াম পুত্র ঈসাকে আ. পাঠিয়েছি। তাওরাতের মধ্য থেকে যা কিছু তাঁর সামানে ছিল সে তার সত্যতা প্রমাণকারী ছিল। আর তাঁকে ইঞ্জিল দিয়েছি, তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো এবং তাও তাওরাতের মধ্যে যা কিছু সে সময় বর্তমান ছিল তার সত্যতা প্রমাণকারী ছিল। আর তা ছিল আল্লাহ-ভীরুদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ। আমার নির্দেশ ছিল, ইঞ্জিলে আল্লাহ যে আইন নাজিল করেছেন ইঞ্জিল অনুসারীরা যেন সে মোতাবেক ফায়সালা করে। আর যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক"।[১৬]

এ সকল আয়াত সম্পর্কে তাফসির বিশারদগণের মতামত

প্রাচীন তাফসির বিশারদগণ থেকে এ আয়াতগুলো সম্পর্কে কতিপয় মতামত পাওয়া যায়:

কতিপয়ের বক্তব্য হচ্ছে: এ আয়াত সবগুলোই আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও নাসারাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন: প্রথম আয়াত অর্থাৎ "যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই কাফির"- এ আয়াত মুসলমানদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, দ্বিতীয় আয়াত ইহুদি এবং তৃতীয় আয়াত নাসারাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

আবার কারো কারো মত হচ্ছে: আয়াতগুলো আহ্লে কিতাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর দ্বারা তাদের সাবই তথা মুসলিম ও কাফির উভয়ই উদ্দেশ্য। ইমাম তাবারী, ইব্রাহীম নাখায়ী থেকে বর্ণনা করেন: এ আয়াতগুলো বনী ইসরাঈল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, পরবর্তী উম্মতের জন্যও এ বিধান জারি করা হয়েছে। হাসানের মতে: এ আয়াতগুলো ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে, তবে আমাদের ওপরও তা ওয়াজিব। ইবনে মাসউদকে বিচারকার্য ও শাসনকার্য পরিচালনা ঘুষ গ্রহণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: এটি কুফরি, অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন: "যারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফির"। ইমাম সুদ্দী থেকে এমন বক্তব্য পাওয়া যায় যা সবকিছুর সাথে আয়াতের সম্পৃক্ততার প্রতি ইঙ্গিত করে।

---

[১৬] সুরা মায়েদা, ৫: ৪৪-৪৭।

ইবনে আব্বাস থেকে ও অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায় যা সবকিছুর সাথে আয়াতের সম্পৃক্ততার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কারণ তাঁকে আয়াতে বর্ণিত যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদের কুফরির কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: যদি কেউ এমনটি করে সে কুফরি করল, তবে এ কুফরি যে আল্লাহ ও তাঁর রসুল এবং শেষ দিবস ইত্যাদিকে অস্বীকার করে থাকে সেই কুফরির মতো নয়। এমনিভাবে তাউসের বক্তব্য হচ্ছে: এ এমন কুফরি নয়, যা তাকে তার জাতিসত্তা তথা মুসলিম পরিচয় থেকে বের করে দিবে। আতা বলেন: এ হচ্ছে নিম্ন পর্যায়ের কুফরি, এমন জুলুম যার থেকে বেশি জুলুমও রয়েছে, এবং এমন পাপাচারিতা যা অন্যগুলোর তুলনায় স্বল্প। ইবনে আব্বাস থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস থেকে তা সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবি হাতিম, হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন এবং বায়হাকী তার সুনান গ্রন্থে একে বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে ইবনে আব্বাস থেকে আলী ইবনে হুসাইন এবং যাইনুল আবেদীনও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি শাসকগোষ্ঠীকে দু'ভাগে ভাগ করেছে, একদল যারা আল্লাহর নাজিল করা বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে থাকে তারা হচ্ছে কাফির, অপর এক দল যারা আল্লাহর বিধি-বিধানের স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু তা অনুযায়ী ফায়সালা করতে আগ্রহী হয় না তারা হচ্ছে জালিম ও ফাসিক।

তাফসির কারকগণের উপর্যুক্ত বক্তব্যের পর্যালোচনা

তাফসিরকারকদের উপর্যুক্ত বক্তব্য স্পষ্ট করার লক্ষ্যে এখানে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই:

এক: এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে উপর্যুক্ত আয়াতগুলো আহলে কিতাবের (ইঞ্জিলের) ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। আয়াতগুলো নাযিলের প্রেক্ষাপট এবং এর সংশ্লিষ্ট অবস্থা থেকেও এমনটি বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু আয়াতের শেষাংশ অর্থাৎ "যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফায়সালা করে না..." এখানে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা থেকে বুঝা যাচ্ছে এ আয়াতগুলো নির্দিষ্ট ঘটনার আলোকে নাজিল হলেও এগুলো মূলত ইহুদি, নাসারা এবং মুসলমান সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং এখানে আয়াতের বিধি-বিধান এবং এর আলোচ্য বিষয়কে শুধুমাত্র অমুসলিম তথা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রাখার যৌক্তিকতা কোথায়?

কতিপয় তাফসির বিশারদ কর্তৃক এখানে আয়াতের বিষয়বস্তুকে আহলে কিতাবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে: রাজা-বাদশাহ ও

শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হয়তোবা কতিপয় জনগোষ্ঠী তাড়াহুড়া করে তাদেরকে মুসলিম জাতিসত্তার গণ্ডি থেকে বের করে দিয়ে প্রকৃত কাফির হিসেবে অভিযুক্ত করে বসতে পারে; অথচ প্রকৃত অবস্থা এমনও হতে পারে, শাসকগোষ্ঠী আল্লাহর বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে না; বরং শয়তানের ধোকা কিংবা কু-প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাতে গিয়ে অপরাধকর্ম ও জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হতে পারে, যা থেকে আল্লাহর একান্ত রহমত ও হেফাজত ব্যতীত খুব কম সংখ্যক রাজা-বাদশাহ দূরে থাকতে সক্ষম হয়েছে।

এ জন্যই ইবনে আব্বাস এবং তাঁর সহচরবৃন্দ যেমনঃ আতা, তাউছ এবং ইবনে জুবাইর প্রমুখ তাফসিরবিশারদগণ বেশ গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, এখানে কুফরি দ্বারা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এমন ধরনের কুফরি বুঝানো হয়নি। যেমন : আল্লাহ, রসুল, কিতাব, ফেরেশতা ও শেষ দিবস ইত্যাদি অস্বীকার করার মাধ্যমে যে কুফরি করা হয় এখানে তা বুঝানো হয়নি। তারা বলেছেন : "এটা কুফরির সর্বোচ্চ স্তর নয়...", এ জন্যই ইবনে আব্বাস এখানে আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারী এবং স্বীকার করেও পালন করতে অনাগ্রহী এ দু'য়ের অপরাধের মাঝে পার্থক্য করেছেন।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ি আবু মিযলাজ এবং তাকে জিজ্ঞেস করতে আসা এবাদিয়া মতাবলম্বী বনী সাদুসের কতিপয় ব্যক্তির সাথে তৎকালীন শাসকবর্গ সম্পর্কিত যে কথোপকথন হয়েছিল তা অধ্যয়ন করলে আমাদের উপর্যুক্ত বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে। উভয়ের মাঝে সংঘটিত সংলাপ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, কিভাবে তারা (এবাদিয়া সম্প্রদায়) উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর ওপর ভিত্তি করে তৎকালীন শাসকবর্গকে মিল্লাতের গণ্ডি থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছে পোষণ করতেন!

ইমাম তাবারী ইমরান ইবনে হাদীর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আবু মিযলাজের কাছে আমর ইবনে সাদুস গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি এসে বলল:

হে আবু মিযলাজ! আল্লাহর বাণী "যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফির", আপনি কি তা সত্য বলে মনে করেন? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ! আমি তাই মনে করি। তারা বলল: "যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা জালিম", আপনি কি তা সঠিক বলে মনে করেন? তিনি বললেনঃ এটা ধর্মীয় বিষয়, যে বিষয়ে তারা দীক্ষা গ্রহন করেছে, তারা এমনটিই বলে থাকে এবং করে থাকে। যদি তারা তাদের ধর্মের কোনো বিধান বাস্তবায়নে অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহলে নিশ্চয়ই জেনেশুনেই তারা তা করেছে। তাদের অবশ্যই অজানা নয় যে, এ জন্য তাদের ধর্মে তারা অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে! তারা বলল: না, বিষয়টি এরূপ নয়,

আপনি সত্য প্রকাশে ভয় করছেন! তিনি বললেন: ভয়তো তোমাদের থাকা দরকার, তোমরা যা মনে করছ তথা বর্তমান শাসকবর্গকে এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করছো, আমিতো তা মনে করছি না। বরং উপর্যুক্ত আয়াতগুলো মূলত ইহুদি, নাসারা, মুশরিক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবু মিযলাজ বললেন: শাসকগোষ্ঠী জেনে তাদের কাজ করে যাচ্ছে! তাদের এ কথা অজানা নয় যে, তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে! কিন্তু উপর্যুক্ত আয়াতগুলো মূলত ইহুদি ও নাসারাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

উভয়প্রকার শাসকগোষ্ঠীর মাঝে পার্থক্য বিধানের আবশ্যকতা

দুই: এখানে উভয় প্রকার শাসকগোষ্ঠীর মাঝে পার্থক্য বিধান করা অত্যন্ত জরুরি যেমনটি ইবনে আব্বাস করেছেন।

প্রথমজন হচ্ছে যে শাসক ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানের অনুসরণ করে থাকে এবং ইসলামকে শাসনকার্যের নির্দেশিকা, জীবন-বিধান ও সংবিধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, অতঃপর দুনিয়ার প্রতি দুর্বলতা, অসৎ সঙ্গ ও কু-প্রবৃত্তি ইত্যাদি কারণে কতিপয় বিষয়ে ইসলামের বিধান থেকে ছিটকে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়জন হচ্ছে যে মূলত আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানের তোয়াক্কা করে না, তার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে অস্বীকার করে থাকে এবং এর ওপর মানবগড়া বিধানের জয়গান গেয়ে থাকে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সে যেন আল্লাহকে মানুষের কল্যাণ সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার কিংবা জেনেও এর বিপরীত করার অপরাধে অভিযুক্ত করছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন: "যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয় ভালোভাবে অবগত" (সুরা মুলক, ৬৭: ১৪)।

তাইতো আল্লামা মাহমুদ মুহাম্মদ শাকের তাফসিরে তাবারীর উপর তার... ব্যাখ্য-বিশ্লেষণী গ্রন্থে আবু মিযলাজ হতে বর্ণিত উপর্যুক্ত একটি অথবা দু'টি বর্ণনার ওপর পাদটীকা লিখতে গিয়ে বলেন: এ কথা সুস্পষ্ট যে, এবাদিয়া সম্প্রদায়ের যে সকল ব্যক্তিবর্গ আবু মিযলাজ থেকে জানতে চাইছিল, তারা মূলত শাসকগোষ্ঠীকে কাফির ঘোষণা করার জন্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে তাকে বাধ্য করতে চেয়েছিল, কারণ তারা শাসক ঘরানার লোক ছিল, হয়তবা তারা শাসকের নাফরমানী করে বসতে পারে অথবা আল্লাহর নিষিদ্ধ কোনো বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যা প্রথম বর্ণনায় এসেছে, নম্বর (১২০২৫)। তারা যদি আল্লাহ প্রদত্ত কোনো বিধান ছেড়ে দিয়েও থাকে তাহলে তারা জানে এর মাধ্যমে

তারা গুনাহর কাজ করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি তাদেরকে বলেন: তারা যা করছে জেনে বুঝেই তা করে যাচ্ছে এবং তারা এও জানে এটি করা গুনাহ ও অপরাধ।

সুতরাং, তাদের প্রশ্ন এমনটি ছিল না যে, শাসকগোষ্ঠী মানুষের জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু ইত্যাদি লুণ্ঠন করার জন্য ইসলামি শরিয়াহ বিরোধী আইন-কানুন প্রণয়ন করে চলছে, অথবা আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানের বিপরীতে মানব গড়া আইনের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে মুসলমানদের ওপর চাপসৃষ্টিকারী আইন-কানুন পাশ করিয়ে চলছে, যেমনটি বর্তমান সময় ইসলামে নিত্য নতুন রূপের আবিষ্কারক অনেকে ধারণা করে থাকে। এ ধরনের কাজতো, তথা ইসলাম বিরোধী আইন-কানুন প্রণয়ন করা ইত্যাদি মূলত আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনার বিরোধিতা, ইসলামের প্রতি অনাগ্রহ এবং বাতিল শাসনকে আল্লাহর শাসনের ওপর প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদির নামান্তর। এ নিঃসন্দেহে কুফরি কাজ। এ ধরনের দাবি বা কাজের প্রবক্তা এবং তা বাস্তবায়নের আহবায়ক ইত্যাদিকে কাফির ঘোষণা দেওয়ার বিষয়ে মুসলিম মাত্র কারো কোনো সন্দেহ নেই।

বর্তমানে আমরা যে সময় অতিবাহিত করছি, যেখানে আল্লাহর বিধি-বিধানকে সার্বিকভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে, বাতিলের শাসনকে আল্লাহর শাসনের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, শরিয়তের যাবতীয় বিধান অকেজো করে রাখা হয়েছে; বরং অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুনের ওপর মানবগড়া আইন-কানুনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হচ্ছে এবং এও বলা হচ্ছে শরিয়তের এ সকল বিধি-বিধান আমাদের বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়নি, যে সকল আবেদন, চাহিদা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে শরিয়তের বিধান নাজিল হয়েছিল, সময়ের আবর্তন-বিবর্তনে তার যাবতীয় আবেদন, গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতা হারিয়ে গেছে। সুতরাং আবু মিযলাজের বর্ণনায় তিনি যে কারণে ইবাদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথে একাত্মতা পোষণ করেননি; বরং তাদেরকে উল্টো আরো শাসিয়ে দিয়েছেন, তার সাথে বর্তমানে প্রচলিত অবস্থার সাদৃশ্য কোথায়?

আবু মিযলাজের বর্ণনার ব্যাখ্যা যদি তাই হতো যেমনটি ইসলামে নিত্য নতুন রূপের আবিষ্কারক গোষ্ঠী ধারণা করে থাকে যে, তারা (এবাদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন) মূলত শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক শরিয়তের বিধানের বিরোধিতার বিষয়ে জানতে চেয়েছিল, তাহলে এর জবাবে আমরা বলতে পারি যে, প্রথমত : কোনো শাসক স্বরচিত কোনো আইনকে শাসনকার্যের বাধ্যতামূলক বিধান হিসেবে চাপিয়ে দিয়েছে, তৎকালীন ইতিহাসে অন্তত এর সত্যতা মিলবে না। দ্বিতীয়তঃ শাসকগোষ্ঠী কোনো বিষয়ে আল্লাহর বিধান বহির্ভূত আইন-কানুনের মাধ্যমে ফায়সালা দেওয়ার ক্ষেত্রে

হয়তোবা অজ্ঞতাবশত এ কাজ করতে, এ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধানের ক্ষেত্রে অজ্ঞব্যক্তির ন্যায় তার সাথে আচরণ করা হবে। কিংবা অপরাধ প্রবণতা ও কু-প্রবৃত্তির চাহিদা মিটাতে গিয়ে সে শরিয়াহ্ বিরোধী আইনের আশ্রয় নিতে পারে, এ ক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করার মাধ্যমে ক্ষমার আশা করা যেতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে এ ধরনের ফায়সালার ক্ষেত্রে তার কোনো তা'বীল তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকতে পারে, এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্কে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে তা থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বের করার যে হুকুম রয়েছে, তা দিয়ে তাকে যাচাই করা হবে। অথবা এখানে একথা বলা যেতে পারে যে, আবু মিযলাজের যুগে অথবা তার আগের বা পরের এমন কোনো শাসক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে শাসনকার্যে আল্লাহর বিধানকে পরোয়া করতো না এবং শরিয়তের বিধি-বিধানের স্বীকৃতি দিত না বা বাতিলের বিধি-বিধানকে শরিয়তের বিধানের ওপর প্রাধান্য দিয়ে চলত। অথচ প্রকৃতপক্ষে এমনটি কখনো ছিল না। তাই আবু মিযলাজ ও এবাদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজনের কথোপকথনকে এর ওপর প্রয়োগ করা যাবে না। যারা কোনো শাসককে সহযোগিতা করতে গিয়ে কিংবা বহির্ভূত বিধানের শাসনকে বৈধতা দানের কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে উল্লেখিত বর্ণনাদ্বয়ের ভুল অর্থ গ্রহণ করতে চান, কিংবা বর্ণনাদ্বয়কে তার সঠিক অর্থে প্রয়োগ না করে বরং অপপ্রয়োগ করতে চান এবং এখান থেকে নিজের স্বার্থের অনুকূলে ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চান, এরা মূলত ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান অস্বীকারকারীদের দলভুক্ত। শরিয়তের বিধানের আনুগত্য করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের মতো এদেরকেও অবশ্যই তাওবা করতে হবে। যদি তারা তাওবা না করে তাদের কাজে অটল থাকে এবং আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করার পাশাপাশি বাতিলের বিধান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে এরা আল্লাহর দ্বীনকে অস্বীকারকারী এবং কুফরির ময়দানে অটল কাফিরের সমপর্যায়ভুক্ত হবে।[১৭]

কোনো শব্দের সার্বজনীন ও সার্বিক অর্থই ধর্তব্য হয়

তিন: উসূলে ফিক্হ বিশারদগণ কুরআন নাযিলের হাদিস বর্ণনার বিশেষ প্রেক্ষাপট নিয়ে এবং এক্ষেত্রে ব্যবহৃত ব্যাপক অর্থদানকারী শব্দ নিয়ে বেশ চিন্তা -গবেষণা করে সর্বশেষ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন যে, এ সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ঘটনা নয়; বরং সার্বজনীন ও ব্যাপক অর্থদানকারী শব্দই ধর্তব্য হবে। অন্যথায় শরিয়তের অনেক বিধানই এখন অকার্যকর হয়ে পড়বে, বিশেষ করে

---

[১৭] তাফসিরে তাবারীর উপর শাকের মাহমুদ মুহাম্মদ লিখিত টীকা থেকে সংকলিত।

যেগুলো নবির সা. যুগে নির্দিষ্ট কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। "ইহা হচ্ছে, যদি বিধান নাজিল সংক্রান্ত ঘটনা বিশুদ্ধ হয়ে থাকে, কারণ এ ক্ষেত্রে অনেক এমন ঘটনাও বর্ণিত হয়ে থাকে যার অধিকাংশই বিশুদ্ধ নয়"।

আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয়: "যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না", এখানে এ কথা বলা যাবে না যে, তা ইহুদি ও নাসারাদের জন্য নির্দিষ্ট যার বিধি-বিধান সম্বলিত কিতাব এখন রহিত হয়ে গেছে এবং যে সকল বিধানের আবেদন এখন আর অবশিষ্ট নেই, অপরদিকে এটি মুসলিম জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করবে না যাদের বিধি-বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং যাদের কিতাবের আবেদন আসমান ও জমিন যতদিন বর্তমান অবস্থায় অবশিষ্ট থাকবে ততদিন পর্যন্ত ফুরাবে না; এমনটি কল্পনায় স্থান দেওয়াও অবাস্তবিক। এখানে একথা কিভাবে চিন্তার স্থান দেওয়া যেতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসারীদের নির্দেশ দিচ্ছেন তারা যেন তাদের কিতাবে বর্ণিত আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে, অথচ কুরআনের অনুসারীদের এ নির্দেশ দিবেন না তারা যেন কুরআন বর্ণিত আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে অথচ কুরআনের অনুসারীদের এ নির্দেশ নিবেন না তারা যেন কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে?!

আমার "ফাতাওয়া ও বর্তমান যুগের মুফতীদের পদস্খলন"[১৮] সংক্রান্ত লেখার উল্লেখিত বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। আমি সেখানে বলেছিলাম:

কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সুরা মায়েদায় আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তাদের সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত নিয়ে অনেকে যে ব্যাখ্যা করে থাকেন সে আয়াতগুলো হচ্ছে: "যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফির", "যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই জালেম" "যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক"। এ ধরনের বক্তাদের কথা হচ্ছে: এ আয়াতগুলো আমরা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি নাজিল করা হয়নি; বরং এগুলো বিশেষ করে আহলে কিতাবদের জন্য নাজিল করা হয়েছে।

উল্লেখিত ব্যাখ্যা মোতাবেক বক্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে: ইহুদি ও নাসারাদের থেকে যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফির অথবা জালিম

---

[১৮] অবশেষে উক্ত লিখাটি দারুস সাহওয়া, কায়রো থেকে "নিয়ন্ত্রণ এবং লাগামহীনতার আবর্তে ফাতাওয়া" শির্ষক শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে।

কিংবা ফাসিক বলে গণ্য হবে, আর মুসলমানদের থেকে যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফিরও হবে না, অথবা জালিমও হবে না কিংবা ফাসিক বলেও গণ্য হবে না! আল্লাহর শপথ! এর থেকে আশ্চার্যকর ও অদ্ভুত কথা আর হতে পারে না! হ্যাঁ, এ আয়াতগুলো আহলে কিতাবদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে; কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এখানে সার্বজনীন ও ব্যাপক অর্থদানকারী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা আহলে কিতাব এবং মুসলিম সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাইতো উসূলবিদগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন: সংশ্লিষ্ট বিশেষ ঘটনা নয়; বরং সার্বজনীন ও ব্যাপক অর্থদানকারী শব্দই ধর্তব্য হবে।

একটি উপমার সাহায্যে বুঝাতে গেলে এটি এভাবেই বলা যেতে পারে যে, উমুক ব্যক্তি অসুস্থ; কারণ খাবার-দাবার ইত্যাদিতে তার রুচি নেই। সুতরাং ফলাফল হিসেবে যা পাওয়া গেল তা হচ্ছে: যে ব্যক্তির খাবার-দাবার ইত্যাদিতে রুচি থাকবে না সেই অসুস্থ। প্রথম কথাটি এখানে ব্যক্তি বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু দ্বিতীয় কথাটির ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যার খাবার-দাবার ইত্যাদিতে রুচির বিঘ্নতা ঘটবে সে অসুস্থ বলে বিবেচিত হবে। অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে: পরিচালনায় ত্রুটি থাকার কারণে উমুক স্কুলের ফলাফল খারাপ হয়েছে, আর যে স্কুলের পরিচালনায় ত্রুটি থাকবে তার ফলাফল খারাপ হতে বাধ্য।

প্রথম কথাটি এখানে নির্দিষ্ট স্কুল কেন্দ্রিক বলা হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে বলা হয়েছে, যা পরিচালনায় ত্রুটি সম্পন্ন এ স্কুলসহ, সকল স্কুল এবং অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

তাই এখানে আমরা বলতে পারি: আলোচ্য আয়াতগুলো আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নাজিল হলেও তাদের মাঝে এগুলো সীমাবদ্ধ হবে না; কারণ এখানে ব্যাপক অর্থবোধক ও সবাইকে অন্তর্ভুক্তকারী সার্বজনীন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা তাদেরকে এবং প্রত্যেক ওই ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যাদের মাঝে উল্লেখিত অবস্থাদি পাওয়া যাবে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তিমাত্র এটি গ্রহণ করতে পারবে না যে, উল্লেখিত শাস্তিগুলো শুধুমাত্র ইহুদি ও নাসারাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। অর্থাৎ ইহুদি ও নাসারাদের মধ্যে যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করবে না তারাই কাফের, জালেম ও ফাসেক ইত্যাদি অপরাধের অভিযুক্ত হবে, অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এমনটি করলে সে উল্লেখিত অপরাধে অভিযুক্ত হবে না, বিষয়টি একেবারেই অযৌক্তিক ও সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

কতিপয় কারণে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য

১ - এটি আল্লাহর আদল-ইনসাফের সাথে সাংঘর্ষিক; যদি এমনটি হয় তাহলে বুঝা যাবে যে আল্লাহ দু'জনকে দু'পাল্লায় পরিমাপ করবেন এবং এ ক্ষেত্রে আল্লাহ দু'ধরনের মাপকাঠি ব্যবহার করবেন, একটি আহলে কিতাবদের জন্য এবং অপরটি মুসলমানদের জন্য; অথচ আল্লাহ তায়ালা নাম-ঠিকানা ইত্যাদির মাধ্যমে তার বান্দাদের পরিমাপ করবেন না; বরং বান্দার ইমান-আমল ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে পরিমাপ করবেন। তাইতো সুরা নিসায় ইরশাদ হয়েছে : "চূড়ান্ত পরিণতি না তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর করছে, না আহলে কিতাবদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর। অসৎ কাজ যে করবে, সে তার ফল ভোগ করবে এবং আল্লাহর মোকাবিলায় সে নিজের জন্য কোনো সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবে না" (সুরা নিসা, ৪: ১২৩)।

ইমাম তাবারী তাঁর তাফসির গ্রন্থে (১২০৩০) আবুল বোখতারীর সনদে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি হুযাইফাকে রা. এ সকল আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বলল; "যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফের" "তারাই জালেম" এবং "তারাই ফাসেক" ইত্যাদি আয়াত না-কি বনী ইসরাঈল সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে? তিনি বললেন: বনী ইসরাইলতো তোমাদের ভাই, তাদের শাস্তির কথা যদি উল্লেখ করা হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে? কখনোই নয়! আল্লাহর শপথ! তোমাদের পথ থেকে সামান্যতমও ব্যতিক্রম নয়।

হুযাইফা রা. বর্ণিত উল্লেখিত হাদিস, যা হাকেম তার মুসতাদ্‌রাক গ্রন্থে (২/৩১২, ৩১৩) জারিরের সনদে আ'মাস, ইব্রাহীম ও হুমাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমরা হুযাইফার কাছে ছিলাম, এমন সময় এ আয়াত উল্লেখ করা হলো "যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফের"। অতঃপর উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল: এ আয়াতগুলো বনী ইসরাঈল সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে! তখন হুযাইফা বললেন: বনী ইসরাইল তো তোমাদেরই ভাই, তাদের জন্য যদি দুঃখ থাকে তোমাদের জন্য কি আরাম থাকবে! কখনোই নয়! যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ! তোমাদের পথ তাদের থেকে সামান্যতমও পৃথক নয়। হাকেম বলেন: এ হাদিসখানা ইমাম বুখারি ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ, কিন্তু তারা এটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেননি। ইমাম যাহাবীও এবিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

২- এখানে উল্লেখিত দাবি সঠিক বলে গ্রহণ করা হয় তাহলে মুসলমানদের ওপর যা নাজিল করা হচ্ছে তা আহলে কিতাবদের ওপর নাজিলকৃত বিধানের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের বলে গণ্য হবে। কারণ ইহুদি ও নাসারাগণ যদি আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা না করে তাহলে তারা হবে কাফির, জালিম বা ফাসিক, বিপরীতে মুসলমানরা যদি আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা না করে তাহলে তাদের কিছুই হবে না। বলাই বাহুল্য এতে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মুসলমানদের ওপর যা নাজিল করা হয়েছে তা হচ্ছে সর্বোত্তম কিতাব, মুসলমানদের কিতাবই আহলে কিতাবের বিধি-বিধানের সত্যায়নকারী এবং তার সংরক্ষক। আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে মুসলমানদের কিতাবই একমাত্র কিতাব যা সকল কিছুর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বিজয়ীর বেশে সামনের দিকে অগ্রসরমান। এটি এমন কিতাব যেখানে সামনে পিছনে তথা সর্বদিক থেকে মিথ্যার অনুপ্রবেশের সামান্যতমও সুযোগ নেই।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুলকে উদ্দেশ্য করে বলেন: "আর হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতি এ কিতাব নাজিল করেছি, যা সত্য নিয়ে এসেছে এবং আল কিতাবের মধ্য থেকে তার সামনে যা কিছু বর্তমান আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী ও তার সংরক্ষক। কাজেই তুমি আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী লোকদের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করো এবং যে সত্য তোমার কাছে এসেছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না" (সুরা মায়েদা, ৫: ৪৮)।

৩- কুরআনে আহলে কিতাবদের বিভিন্ন ঘটনা, তাদের অবস্থাদি এবং তাদের ওপর আরোপিত বিধি-বিধান ইত্যাদি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানরা যাতে এ সকল কিছু থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এখানে ভালো যা কিছু আছে তার অনুসরণ করবে এবং খারাপ যা কিছু থাকবে তা থেকে সাবধান হয়ে যাবে। অন্যথায় এ সকল কিছুর আলোচনা অনর্থক ও ব্যর্থতায় পরিণত হবে।

বাস্তবতা হচ্ছে মুসলমানদের আলেম-উলামাগণ সবাই এক বাক্যে আহলে কিতাব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধি-বিধান ও তাদের সম্পর্কিত আয়াতগুলোকে বিভিন্ন বিষয়ে দলিল-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, এ মর্মে যে উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণের জন্যই মূলত এগুলো কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য কুরআনে যেখানে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হচ্ছে, সেখানে মুসলমান আলেম-উলামাগণও অন্তর্ভুক্ত

হওয়ার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। যেমন আল্লাহর বাণী: "তোমরা অন্যদের সৎকর্মশীলতার পথ অবলম্বন করতে বলো কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাকো। তোমরা কি জ্ঞান বুদ্ধি একটুও কাজে লাগাও না?" (সুরা বাকারা ২: ৪৪)। এভাবে যেখানে বনী ইসলাঈলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেখানে সাধারণ মুসলমানগণও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। যেমন: ইরশাদ হয়েছে: "তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো?" এ ধরনের বিশেষ সম্বোধন বিশিষ্ট আয়াতে যদি এরূপ হয় তাহলে সাধারণ সম্বোধন বিশিষ্ট আয়াত, যেমন: আলোচ্য আয়াতের ব্যাপারে কি হবে? এখানে অবশ্যই মুসলমানগণও অন্তর্ভুক্ত হবে। উল্লেখিত আয়াতদ্বয় আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করার ক্ষেত্রে সকল অপব্যাখ্যাকারীর জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জস্বরূপ এবং আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত সকল শাসকের জন্য তিন তিনটি আঘাত ও প্রতিবন্ধক স্বরূপ তথা কুফরি, জুলুম ও পাপাচার। সুরা মায়েদার আয়াতে বর্ণিত "যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করে না তারা কাফের... ফাসেক... জালেম, এখানে 'কাফের' শব্দের অর্থ ইসলামে অবিশ্বাসী নয় বরং আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা (দেখুন : ড. কারযাবীর বই Islamic Awakening between Rejection and Extremise, chapter on Misconception")*

আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করার আবশ্যকতার ওপর ঐকমত্য

চতুর্থত: তাদের মতামত হচ্ছে এ সকল আয়াতগুলো আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও নাসারা যাদের উপর তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে; এ মতামতের মাধ্যমে তারা বুঝাতে চায়নি যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক নয়। এ ধরনের কথা কল্পনা করা আলেম-উলামা এবং জ্ঞানী-গুণীতো দূরের কথা; বরং একজন সাধারণ মুসলমানের ক্ষেত্রেও অসম্ভব। কুরআনের বিধি-বিধান পালন করা যদি আবশ্যকীয় নাই বা হয়, তাহলে তা নাজিল করার স্বার্থকতা কোথায়?

সর্বোপরি এখানে যা হয়েছে, কেউ কেউ কুফরি ইত্যাদি থেকে পলায়নের আশায় যা বলার তা বলেছে; কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান পাল আবশ্যক নয়, এমনটি কখনো তাদের অবচেতন মনেও স্থান পায়নি। এ জন্যই তো তাদের অনেকের বক্তব্য হচ্ছে: এটি আহলে কিতাব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এবং আমাদের ওপর তা ওয়াজিব।

---

* সম্পাদক

উল্লেখিত কথার দলিল হচ্ছে: ইমাম আবু জাফর তাবারী এ মত গ্রহণ করেছেন যে, এ আয়াতগুলো আহলে কিতাব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে; কিন্তু পরিশেষে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মতে ফায়সালা করার আবশ্যকতা ঘোষণা করেছেন।

আবু জাফর বলেন, আমার দৃষ্টিতে এখানে বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে: এসকল আয়াত আহলে কিতাবের কাফিরদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে; কারণ আয়াতের আগে ও পরে তাদের কথাই বলা হয়েছে, তারাই এখানকার আলোচ্য বিষয়। তাই এ আয়াতকে তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত।

এখানে যদি কেউ প্রশ্ন রাখতে চায়; আল্লাহ তায়ালা এখানে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করেছেন; আপনি কিভাবে একে আহলে কিতাবের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন?

এর উত্তরে বলা হবে, আল্লাহ তায়ালা এখানে ব্যাপকভাবে ওইসকল জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করেছেন যারা কিতাব বর্ণিত আল্লাহর বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে থাকে। তাই এখানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, অস্বীকার করে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সাল না করার কারণে তারা মূলত কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে সকল জনযোষ্ঠী যারা অস্বীকার করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফিরদেরই দলভুক্ত হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও রা. এর মত পোষণ করে থাকেন। কারণ এর মাধ্যমে তারা জেনে শুনে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে চলেছে, সুতরাং তাদের দৃষ্টান্ত হতে পারে ওই সকল কাফিরের ন্যায় যারা নবির আগমনের সংবাদ জানার পরও জেনে শুনে নবুয়্যাতকে অস্বীকার করেছে।

এখানে এসে আমরা বুঝতে পারলাম, এখানে ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করতে অস্বীকারকারী এবং অনাগ্রহী তাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, এখানে সকলকে একই পর্যায়ভুক্ত না করে মূলত শাসকগোষ্ঠীর অবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির আলোকে তাদের মাঝে পার্থক্য বিধান করা হয়েছে। আমরা এখানে এটাই বলতে চাচ্ছি এবং সকল গবেষক আলেম-উলামাগণও এটাই বলেছেন। তাদের কেউ এখানে নিঃশর্তভাবে ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করে যারা শাসনকার্যের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে বিবেচনায় রাখে না; বরং কখনো জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে থাকে, তাদের সকলকে কাফিরদের দলভুক্ত বলে ঘোষণা করেননি; বরং শাসকদের অবস্থান, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তারা তাদের মাঝে পার্থক্য করে থাকে।

সাইয়্যেদ রশীদ রেজার মতামত

আল্লামা রশীদ রেজা তাঁর তাফসির গ্রন্থে সূরা মায়েদার উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

কুফরি, জুলুম ও ফিস্‌ক এ শব্দত্রয় কুরআনে একই বিষয়ের বিভিন্ন অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সূরা বাকারায় "কাফিররাই হচ্ছে জালিম" শীর্ষক আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা তা বর্ণনা করেছি। ইসলামি আইনের আলেম-উলামাগণের মতে পারিভাষিক অর্থে কুফরি বলতে ইসলাম ধর্মের পরিধি থেকে বের হয়ে যাওয়া, কিংবা ইসলামের মৌলিকত্বের সাথে সাংঘর্ষিক এমন সকল বিষয়কে বুঝিয়ে থাকে; কিন্তু 'জুলুম' ও 'ফিস্‌ক' শব্দদ্বয় দ্বারা এমনটি ঝুঝানো হয় না। তাদের কারো পক্ষ থেকে এখানে দ্বিমত পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই যে, কুরআনে 'কুফরি' শব্দটি তাদের পারিভাষিক কুফরির অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এজন্যই তারা বলে থাকেন: এমন কুফরি যার উপরে আরো স্তর রয়েছে, অর্থাৎ সাধারণ পর্যায়ের কুফরি। এমনিভাবে জুলুম ও ফিস্‌ক শব্দদ্বয়ও তাদের পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সকল প্রকারের জুলুম ও ফিস্‌ক তথা পাপাচারিতা তাদের দৃষ্টিতে কুফরি নয়। তাই যে সকল বিষয়কে জুলুম ও পাপাচারিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেক্ষেত্রে তারা 'কুফরি' শব্দটি ব্যবহার করেন না। সুতরাং যারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদের সবাইকে সন্দেহাতীতভাবে কাফির ঘোষণা দেওয়া, ইসলামের পরিধি থেকে বের করে দেওয়া আলোচনা ও ব্যাখ্যা স্বাপেক্ষ। আলেম-উলামাদের পরিভাষাগত কুফরি এবং কুরআনের ভাষ্য উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে বিষয়টি আরো চিন্তা-গবেষণার দাবি রাখে।

আমরা যদি উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হাদিসগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখি এখানে ইবনে আব্বাসের যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে: "এখানে এমন পর্যায়ের কুফরি, জুলুম ও পাপচারিতা বুঝানো হয়েছে, যার ওপর আরো স্তরবিন্যাস রয়েছে"। তিনি আরো বলেন: "এ আয়াতদ্বয় বিশেষ করে ইহুদিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, মুসলমানদের এখানে কোনো কিছু নেই। ইমাম শা'বী থেকে বর্ণিত: প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে এবং তৃতীয় আয়াত নাসারা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।[১৯] এটাই এখানে সুস্পষ্ট। কিন্তু ইহুদি ও নাসারা

---

১৯ শা'বী থেকে বর্ণিত, এমনিভাবে তাবারী থেকেও বর্ণিত : প্রথম আয়াত মুসলমান, দ্বিতীয় আয়াত ইহুদি এবং তৃতীয় আয়াত নাসারাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ইবনুল আরবী তার আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ মতকেই বেছে নিয়েছেন, ইমাম কুরতুবীও তাঁর মতের পুনরোক্তি করেছে।

ব্যতীত অন্যান্য যাদের মধ্যে এ আচরণ পাওয়া যাবে এবং যারা তাদের প্রভুর কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারাও আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে নীতিগত দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই। কুরআনতো মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে এ ধরনের খোরাক প্রদানের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম শা'বী এখানে উপরে বর্ণিত হুযাইফা ও ইবনে আব্বাসের রা. হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

এখানে প্রথম দু'আয়াতে ইহুদিদের প্রসঙ্গে এবং তৃতীয় আয়াতে খ্রিস্টানদের প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে, তৃতীয় কোনো প্রসঙ্গের সুযোগ নেই। আয়াতের ভাষা হচ্ছে সার্বজনীন ও ব্যাপক, ব্যক্তি বিশেষ বা কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্দিষ্টকরণের কোনো যৌক্তিকতা নেই। এখানে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা না করা যদি এর স্বীকৃতি না দেওয়া অথবা একে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা, কিংবা মানবগড়া অন্যান্য সকল বিধি-বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি কারণে হয়ে থাকে, এমতাবস্থায় প্রথম আয়াতে, এমনিভাবে শেষ দু'আয়াতেরও কুফরির প্রকৃত অর্থ, অর্থাৎ ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়ার অর্থ গ্রহণ করতে নীতিগত কোনো অসুবিধা নেই। অত্র আয়াতগুলো নাযিলের প্রেক্ষাপট এবং সংশ্লিষ্ট অবস্থাদির প্রতি সাধারণ দৃষ্টিপাতের মাধ্যমেই তা প্রতিভাত হয়।

অত্র আয়াতদয়ের দিকে একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে প্রথম আয়াতে কুফরি, দ্বিতীয় আয়াতে জুলুম এবং তৃতীয় আয়াতে ফিস্‌ক তথা পাপাচারিতার উপাধিতে ভূষিত করার রহস্য উন্মোচন হয়ে যাবে। প্রথম আয়াতের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে : শরিয়তের বিধি-বিধান প্রণয়ন, হেদায়াত ও আলোকবর্তিকা সম্বলিত কিতাব অবতীর্ণ করা, যুগ যুগ ধরে নবিগণ ও আলেম-উলামাগণ কর্তৃক শরিয়তের বিধি-বিধানের অনুসরণ এবং এর অনুসরণ করতে পরবর্তী প্রজন্মকে অসিয়ত ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহর প্রদত্ত বিধানকে অস্বীকার করে, হেদায়াত ও আল্লাহ প্রদত্ত আলোর বর্তিকা থেকে বিমুখ হয়ে এবং অন্যান্য বিধি-বিধানকে শরিয়তের বিধানের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণে যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা ও ফায়সালা করে না তাদের কথা বলার মধ্য দিয়েই প্রথম আয়াতের পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তি বা সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে কাফিরদের দলভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত। এখানে সুস্পষ্ট যে, যারা অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনার আগ্রহ পোষণ করে না, অথবা মানবগড়া আইন-কানুনের আশ্রয় নিয়ে থাকে; কিন্তু পরবর্তীতে নিজের ভুল উপলব্ধি করে তাওবা করে নেয় তারা কাফিরদের দলভুক্ত হবে না। আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারণে তারা গুনাহগার হতে পারে; কিন্তু ইসলামের বেড়ি থেকে বের হয়ে যাবে না।

এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার জন্য আয়াতের সংশ্লিষ্ট অবস্থার প্রতি একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করাই যথেষ্ট।

কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতে কিতাবুল্লাহ কিংবা এর বিধি-বিধান সম্বলিত কোনো আলোচনা স্থান পায়নি, যা হচ্ছে ঈমানের মূলভিত্তি এবং দ্বীন ইসলামের মুখপাত্রস্বরূপ। বরং এখানে সীমা লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির বিধান তথা ক্বিসাস, হুদুদ ইত্যাদি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আদল, ইনসাফ ও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এ ধরনের শাস্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে এবং আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করবে না তাদের জালিম বলা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর এবং সংশ্লিষ্ট অবস্থা থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে থাকে।

তৃতীয় আয়াতে ইঞ্জিলের বিধি-বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর অধিকাংশই হচ্ছে আদেশ-উপদেশ, নিয়ম-নীতি, শিষ্টাচার ইত্যাদির বর্ণনা সংবলিত। সাথে সাথে শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে নয়; বরং আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতিতে শরিয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে এর বিধি-বিধান বাস্তবায়নের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং যারা এ সকল আদেশ-উপদেশ, হেদায়াত ইত্যাদির আলোকে ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক তথা পাপাচারী এবং অসৎ কর্মশীল।

পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর পথ ধরে বর্তমানে মুসলমানদের বিশাল একটি সংখ্যা বিভিন্ন ধরনের বিধি-বিধান ও আইন-কানুন ইত্যাদি প্রণয়ন করে চলছে এবং এগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তারা এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নাজিল করা বিধি-বিধানকে অবহেলা ও অবাঞ্ছিত করে চলেছে। যারা শরিয়াহসম্মত কোনো ব্যাখ্যা এবং সুনির্ধারিত কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাড়া আল্লাহর নাজিল করা আইনকে পায়ে ঠেলে মানবগড়া আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে সচেষ্ট হবে, উল্লেখিত তিনটি আয়াতের বর্ণিত হুকুম যার যার অবস্থার আলোকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে তাদের ওপরই প্রযোজ্য হবে। আল্লাহর প্রদত্ত বিধানকে অস্বীকার কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, অথবা সাধারণ আইনকে শরিয়তের আইনের ওপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে যে ব্যক্তি চুরি, জেনা-ব্যভিচার এবং সতী-সাধ্বী রমণীদের অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে নিঃসন্দেহে কাফিরদের দলভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি এছাড়া অন্য কোনো কারণে আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জালিমদের দলযুক্ত হবে, যদি এর মাধ্যমে অপরের অধিকার লঙ্ঘন হয় এবং আদল-ইনসাফের টুঁটি চেপে ধরা হয়; অন্যথায় সে ফাসিক তথা পাপাচারীদের দলভুক্ত হবে। সুতরাং 'ফিসক' শব্দটি ব্যাপক, প্রত্যেক কাফির এবং প্রত্যেক জালিম ব্যক্তি 'ফাসিক' হতে পারে; কিন্তু

প্রত্যেক ফাসিক ব্যক্তি কাফির বা জালিম হবে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাধারণ এবং সার্বিকভাবে আল্লাহর বিধান হচ্ছে আদল-ইনসাফ; চাই তা সরাসরি শরিয়তের ভাষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হোক বা ইজতিহাদ ও ইসতেম্বাত তথা চিন্তা-গবেষণা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রমাণিত হোক। এবিষয়ে জনৈক বিজ্ঞব্যক্তি বলেছেন: "যেখানেই আদল-ইনসাফ সেখানেই আল্লাহর বিধান"।

কিন্তু যখন কোনো ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট এবং অকাট্য বিধান সংবলিত শরিয়তের প্রমাণিত কোনো ভাষ্য পাওয়া যাবে, সে ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই উক্ত বিধানের পরিবর্তন হবে না; তবে যদি এখানে সাংঘর্ষিক এবং অগ্রাধিকারযোগ্য অপর কোনো ভাষ্য পাওয়া যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে তা গ্রহণীয় হবে। যেমন : জরুরি এবং প্রয়োজন সংক্রান্ত বিধি-বিধানের অধ্যায়ে অনাঙ্ক্ষিত কষ্ট লাঘবের জন্য ইসলামি আইনে স্বাভাবিক বিধানের পরিবর্তে কতিপয় জরুরি বিধানের সুযোগ রয়েছে।

এটাই ছিল আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করার বিষয়ে শাইখ রাশীদ রেজার মতামত এবং অবস্থান। জানার উদ্দেশ্য কেউ তা অধ্যয়ন করতে চাইলে তার জন্য এটি খুবই সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত। পূর্বাপর থেকে বিচ্ছিন্ন তার বক্তব্যের কিছু অংশ গ্রহণ করে তাকে অত্যন্ত সহনশীল, ভুল ব্যাখ্যা দানকারী এবং পরাজিত মানসিকতাসম্পন্ন ইত্যাদিতে অভিযুক্ত এবং অপবাদ দেওয়া কখনো বৈধ হতে পারে না। এ মহান সংস্কারকের ওপর তা বড় ধরনের জুলুম করার নামান্তর হবে।

ইবনে আব্বাসের মতামতের পর্যালোচনা

অনেক ধারণা করে থাকেন, এখানে ইবনে আব্বাসের মতামত হচ্ছে যে এ আয়াতগুলো তার নাজিলের প্রেক্ষাপটের মধ্যেই সীমিত। এ নিয়ে তারা সুপরিচিত ইসলামি চিন্তাবিদ অধ্যাপক ফাহমী হুয়াইদীর সাথে বাদানুবাদ করেছে। আমার জানা নেই কিভাবে তারা ইবনে আব্বাসের সাথে এ কথার সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে; অথচ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের তাফসিরে তাঁর থেকে বর্ণিত মতামত থেকে বুঝা যায় যে, গুটিকয়েক আয়াত যেখানে সংশ্লিষ্ট ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ দলিল-প্রমাণ রয়েছে সেখানেই শুধু তিনি এ ধরনের মতামত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তা ব্যতীত অন্যান্য সকল আয়াতকে তিনি সংশ্লিষ্ট ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে বরং সার্বজনীন ও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন।

সুরা আল মায়েদার উল্লেখিত আয়াতগুলোতে তার বর্ণিত মতামতই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল। ইমাম তাবারীসহ আরো অনেকেই (যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) বর্ণনা করেন: "তারাই কাফির", এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস

বলেন : হ্যাঁ আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করার কারণে সে কুফরি করল; কিন্তু তা ওই ব্যক্তির মত নয়, যে আল্লাহ, রসূল, কিতাব ও ফিরিশতা ইত্যাদি অস্বীকার করার মাধ্যমে কুফরিতে নিমজ্জিত হয়।

এমনিভাবে তার থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এখানে আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর মাঝে পার্থক্য বিধান করেছেন। অবিশ্বাসীরা হবে কাফির এবং বিশ্বাসীরা হবে জালিম অথবা ফাসিক।

ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেনঃ যারা উল্লেখিত আয়াতগুলোকে আহলে কিতাবের জন্য সীমাবদ্ধ করতে চায় তাদের কথার প্রতিউত্তরে ইবনে আব্বাস বলেনঃ "তোমরাতো উত্তম জাতি, এখানে যদি ভালো কিছু থাকে তাহলে তা তোমাদের জন্য, আর যদি খারাপ কিছু থাকে তা আহলে কিতাবের জন্য!" মনে হচ্ছে অত্র আয়াতগুলোতে মুসলমানগণও অন্তর্ভুক্ত আছে বলে তিনি মনে করেন।[২০]

বাদী-বিবাদীর মধ্যে ফায়সালা সীমাবদ্ধ থাকার দাবি

যে বা যারা বলতে চায় কুরআনে 'হুকম' শব্দটি ঝগড়াটে দু'ব্যক্তি অর্থাৎ বাদী-বিবাদীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের মীমাংসা করার অর্থেই ব্যবহৃত হয়; রাজনীতি, শাসনকার্য পরিচালনা বা আইন-প্রণয়নের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এর দলিল হচ্ছে উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে "আপনি তাদের মাঝে ফায়সালা করুণ", এখানে এ কথা বলা হয়নি যেঃ "আপনি তাদের ওপর ফায়সালা করুন"। এ ধরনের দাবি মূলত মৌলিকভাবেই সঠিক নয়।

সুরা মায়েদার আয়াতগুলো পুরোপুরিভাবে কেউ অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবে তাতে বাদী-বিবাদীর মাঝে ফায়সালা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রনীতি, বিচারকার্য, শাসনকার্য পরিচালনা ও আইন-কানুন প্রণয়নসহ প্রভৃতি বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তাওরাতের আলোচনা করতে গিয়ে কুরআনে বলা হয়েছেঃ "আমি তাওরাত নাজিল করেছি। তাতে ছিল পথ নির্দেশ ও আলো। সমস্ত নবি, যারা মুসলিম ছিল, সে অনুযায়ী ইহুদি হয়ে যাওয়া লোকদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করতো। আর এভাবে রব্বানী ও আহবার (এরি ওপর তাদের ফায়সালার ভিত্তি স্থাপন করতো)। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর ওপর সাক্ষী। কাজেই (হে ইহুদি গোষ্ঠী) তোমরা মানুষকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় করো এবং সামান্য তুচ্ছ মুল্যের বিনিময়ে আমার আয়াত বিক্রি

---

২০ আল্লামা সুয়ুতী "আদ্ দূর আল মানছুর" গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করেন।

করা পরিহার করো। আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফির"।[২১]

এখানে ফায়সালা বলতে ব্যাপক অর্থ বুঝানো হয়েছে। ঝগড়াটে দু'গ্রুপের মাঝে ফায়সালা থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল কিছু ও এখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

> ইঞ্জিলের আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে: "আমার নির্দেশ ছিল, ইঞ্জিলে আল্লাহ যে আইন নাজিল করেছেন ইঞ্জিল অনুসারীরা যেন সে মোতাবেক ফায়সালা করে। আর যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক" (সুরা মায়েদা, ৫: ৪৭)।

এ কথা সুস্পষ্ট যে ইঞ্জিল তো এমন কোনো বিধি-বিধান সম্বলিত কিতাব ছিল না যার ওপর ভিত্তি করে বাদী-বিবাদীসহ বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমায় ফায়সালা করা যেতে পারে; বরং এখানে রয়েছে কতিপয় আদেশ-উপদেশ, ওয়াজ-নসীহত, আখলাক-শিষ্টাচার ইত্যাদি। তাই আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করা শুধুমাত্র মামলা-মোকাদ্দমার মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে না যেমনিভাবে এর প্রবক্তাগণ দাবি করে থাকেন।

তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে, এখানে 'হুক্‌ম' বলতে শুধুমাত্র বিচারকার্য ও মামলা-মোকাদ্দমায় ফায়সালা করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে শুধুমাত্র কাজি বা বিচারপতিদেরকে অভিযুক্তি করার মধ্য দিয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার, আইন প্রণয়ন বিভাগ ও শাসনতন্ত্র বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সবাই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করার দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত থেকে যাবে, এমনটি কখনো হতে পারে না? আল্লাহর আইন মোতাবেক ফায়সালা করার ব্যাপারে কাজি থেকে শুরু করে সরকার, রাষ্ট্রপ্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকলেরই দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং এক্ষেত্রে কেউ জবাবদিহিতার উর্ধ্বে থাকতে পারে না। এটি সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব, সমসাময়িক কালে আলেম-উলামা ও গবেষকগণ এমনটিই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

আল্লামা রাশীদ রেজা বলেন: আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করার কারণে কাজি বা বিচারপতিকে কুফরির মাধ্যমে অভিযুক্ত করার মধ্য দিয়ে সরকার, রাষ্ট্রপ্রধান ও আইন প্রণেতাগণসহ সংশ্লিষ্ট কেউই কুফরির অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। রাষ্ট্রপ্রধানগণ যদিও এ সকল আইন-কানুন প্রণয়ন করে না, তথাপিও তাদের অনুমতি এবং তত্ত্বাবধানেই এ সকল আইন-কানুন প্রণয়ন করা

---

[২১] সুরা মায়েদা ৫ : ৪৪।

হয়ে থাকে। শাসনকার্য পরিচালনা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সকল কিছুই তাদের তত্ত্বাবধানেই হয়ে থাকে, তাই তাদের কেউ দায়মুক্ত এবং জবাবদিহিতার উর্ধ্বে থাকতে পারে না।

আল্লামা শাইখ শালতুতও তাঁর 'ফাতওয়া' গ্রন্থে অনুরূপ কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিযুক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ। সকলের তা অধ্যয়ন করা উচিত।

কুরআনে 'শরিয়াহ' শব্দের ব্যবহার এবং এর তাৎপর্য

> আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, কতিপয় বক্তার বক্তব্যে, লেখকের লেখায় ও বিভিন্ন পত্রিকার কলামে অনেক সময় এ দাবী তুলতে দেখা যায় যে, যেহেতু কুরআনে 'শরিয়াহ' শব্দটি মাত্র এক বার তথা সুরা যাছিয়া (অতঃপর হে নবি, আমি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাকে একটি সুস্পষ্ট (শরিয়াহ) রাজপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার ওপরেই চলো এবং যারা জানে না তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না- (সুরা জাছিয়া, ৪৫: ১৮), ব্যতীত অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয়নি, সেহেতু এটি এদিকেই ইঙ্গিত দেয় যে শরিয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন ইসলামে অতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত নয়। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা যদি বিশুদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এখানে এটাও বলা যেতে পারে যে, তেমনিভাবে ইসলাম 'আখলাক' তথা আচার-আচরণের বিষয়টিকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেনি; কারণ কুরআনে তা শুধুমাত্র রসুলের সা. প্রশংসা করতে গিয়ে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: "হে নবি! নিঃসন্দেহে তুমি নৈতিকতার উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন" (সুরা কলম, ৬৮: ৪)।

এমনিভাবে এও বলা যেতে পারে যে, ইসলাম "আল ফাদায়েল" যাবতীয় সৎগুণাবলীরও কোনো গুরুত্ব দেয়নি; কারণ কুরআনে 'ফাদিলত' শব্দের কোনো উল্লেখ নেই।

শুধু তাই নয়, যদি তাই হয় তাহলে এ কথাও বলা যেতে পারে যে, ইসলামে মানুষের আকিদা-বিশ্বাসের কোনো গুরুত্ব নেই; কারণ 'আকিদা' অথবা 'আল আকিদা' তথা নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট কোনো অবস্থায় এ শব্দটি কুরআনে এবং হাদিস শরিফেও পাওয়া যায় না।

কুরআনে বর্ণিত যাবতীয় মূল্যবোধ, শিক্ষা, আলোচ্য বিষয়, মূলনীতি ইত্যাদিকে আমরা যদি এজাতীয় স্বল্প বিদ্যা-বুদ্ধি এবং স্বল্পার্থবোধক শাব্দিক বিশ্লেষণের

সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে অনেক কিছুই আমাদের সামনে তালগোল পাকিয়ে যাবে, উঁচু-নিচু সামনে মনে হবে। এমনিভাবে এর ফলে হক-বাতিলের সংমিশ্রণ হয়ে যাবে এবং সর্বশেষে আমাদের অজান্তেই আমরা সহজ-সরল ও সঠিক পথ হারিয়ে ফেলবো।

কুরআন হাদিসে বর্ণিত যাবতীয় মূল্যবোধ ও শিক্ষা ইত্যাদিকে মূল বিষয়বস্তুর আকারেই অধ্যয়ন করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে শাব্দিক বিশ্লেষণ ও কুরআন নাজিলের পরবর্তী সময়ের আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরনের পরিভাষা ইত্যাদি এড়িয়ে যেতে হবে; চাই কুরআনে বর্ণিত মৌলিক বিষয়বস্তু ও শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল হোক বা না হোক। ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক শিক্ষা, যাবতীয় মূলনীতি, শরিয়াহসম্মত সুপ্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা ইত্যাদির আলোকেই কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন করতে হবে।

কুরআন বর্ণিত উপাধি ব্যবহার বৈধতা

পঞ্চমত : আমার মনে হয় যারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদেরকে 'কাফির' আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে আলেম-উলামাদের কারো দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই; কারণ কুরআন কারিমে সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে এ উপাধি দেওয়া হয়েছে, যেমনিভাবে 'জালিম' এবং 'ফাসিক' হিসেবে আরো দু'টি উপাধি দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি শুধু কুরআনে বর্ণিত ভাষ্য এবং শব্দের ওপরই নির্ভর করতে চায় তাহলে তাকে নিন্দাবাদ করার কোনো সুযোগ নেই; তবে এক্ষেত্রে তাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে- কুফরিকে এখানে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসসহ আরো অন্যান্যদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা এবং অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এটি বুঝতে হবে যে, এখানে কুফরি বলতে ইসলামের পরিধি থেকে বের হয়ে যাওয়া, তাওহিদ ও রেসলাতে অস্বীকার করা ইত্যাদি বুঝানো হয়নি। এখানে বুঝতে হবে যে, আল্লাহর বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং এর প্রতি অবিশ্বাসী উভয়ের মাঝে বিরাট এক ব্যবধান রয়েছে। যেমনিভাবে পার্থক্য করেছেন কুরআনের মুখপাত্র এবং মুসলিম উম্মাহর সুপ্রসিদ্ধ গবেষক আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.।

দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

শাসকগোষ্ঠী এবং প্রজাসাধারণ উভয়ের জন্য এখানে এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যা শাসক গোষ্ঠী ও জনগণ উভয়কে অবগত করা আবশ্যক। দু'টি বিষয় এখানে লক্ষ্যণীয় :

১ - মানুষকে জালিম, ফাসিক ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা কোনো সহজ বিষয় নয়। এগুলোকে হালকা বা অবজ্ঞার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করার

কোনো সুযোগ নেই। ইসলামের পরিধি থেকে বের করে দেয় এমন কুফরিই শুধুমাত্র ভয়ংকর ও বিপজ্জনক নয়; বরং জুলুম-অত্যাচার ও পাপচারিতা ইত্যাদিও অনেক ভয়ংকর ও মারাত্মক অপরাধ, যা থেকে আল্লাহর সাক্ষাত প্রত্যাশী, স্বীয় ধর্মের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন সত্যিকারের মুসলমানকে সাবধান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: "সাবধান! জালিমদের ওপরই আল্লাহর অভিশাপ" (সুরা হূদ, ১১: ১৮), "আল্লাহ তায়ালা জালিমদেরকে পছন্দ করেন না" (সুরা আলে ইমরান, ৩: ৫৭), "নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন না" (সুরা মায়েদা, ৫: ৫১), "তোমাদের মধ্যে যে কেউ জুলুম করবে তাকে কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে হবে" (সুরা ফুরকান, ২৫: ১৯), "নিশ্চয় জালিমরা কখনো সফলকাম হতে পারে না" (সুরা ইউসুফ, ১২: ২৩), "জালিমরা সেদিনই বুঝতে পারবে কোন ধরনের বিপদ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে" (সুরা আশ-শুয়ারা, ২৬: ২২৭), "নিশ্চয় আল্লাহ পাপাচারীদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন না" (সুরা মুনাফিকুন, ৬৩: ৬), "ইমান আনার পরও পাপাচারের সঙ্গে জড়িত থাকা অত্যন্ত জঘন্য ও খারাপ কাজ" (সুরা হুজরাত, ৪৯: ১১), "জালিমদেরকে তাদের পাপাচারের কারণে কঠিন শাস্তি দিলাম" (সুরা আ'রাফ, ৭: ১৬৫)।

২ - আল্লাহ এবং তাঁর প্রদত্ত বিধানের প্রতি বিশ্বাস থাকা অবস্থায় আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করে মানবগড়া আইনের আশ্রয় নেওয়া যদিও মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এমন কুফরি নয়; তবুও নিঃসন্দেহে এটি একটি নীতিগর্হিত ও ইসলাম বিরোধী কাজ এবং এ ধরনের ব্যক্তি নিজের জন্য জালিম ও ফাসিক ইত্যাদি উপাধি বেছে নিয়েছে তাই মনে করতে হবে। তাও এ সামান্য সময়ের জুলুম নয়, কিংবা গুটিকয়েক মুহূর্তের অপরাধ নয়; বরং তা ধারাবাহিক জুলুম ও বিরতিহীন অপরাধকর্ম। যতদিন আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে মানবগড়া বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করবে ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের জুলুম ও অপরাধকর্মে জড়িত থাকবে। এভাবে বিরামহীন কোনো অপরাধকর্ম চালিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে ইজমা মতেই অন্যায়, এবং এরকম বিষয়ে নিরব থাকাও ইজমা মতেই অন্যায়। এরকম কাজের বিরোধিতা করা এবং তা পরিবর্তনের চেষ্টা করা নিঃসন্দেহে সকলের দ্বীনি দায়িত্ব এবং সকলের ওপর শরিয়াহ প্রদত্ত ওয়াজিব বা অবশ্য

> কর্তব্য। সাংবিধানিক উপায়ে এর পরিবর্তনে সোচ্চার হওয়া নীতি-নির্ধারক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যেমনঃ পার্লামেন্ট, আইনসভা ইত্যাদির একান্ত কর্তব্য, অন্যথায় সামরিক শক্তি বা প্রজাতন্ত্রের শক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে তা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে হবে এবং এর থেকে বড় কোনো বিশৃঙ্খলা ও খারাপ অবস্থার সূচনা করা যাবে না। যদি এ ধরনের কোনো সম্ভাবনা থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ক্ষতি এবং হালকা বিপদকেই বরণ করে নিতে হবে। এমতাবস্থায় বাহুবলের জিহাদ স্থগিত করে মুখের জিহাদ তথা বর্ণনা-বিবৃতি, লেখাপড়া এবং প্রয়োজনে অবস্থার আলোকে অন্তরের জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে, হাদিসের ভাষায় যাকে "দুর্বল ইমান" বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে এ ধরনের দুর্বল ইমানকে সংরক্ষণ ও সমবেত করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। পরবর্তী আলোচনায় তা আরো সুস্পষ্ট হবে ইনশা-আল্লাহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর বিশুদ্ধ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেনঃ রসুল সা. বলেছেনঃ "আমার পূর্বে বিভিন্ন জাতির কাছে যত নবি ও রসুল প্রেরণ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্য ওই জাতি থেকে বাছাইকৃত কতিপয় একনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথী ছিল, যারা তার বিধি-বিধান আঁকড়ে ধরে এবং তার আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করেছিল। অতঃপর তাদের পর অন্য এক প্রজন্ম আসল যাদের কথা ও কাজের মিল নেই, যারা বলে এক; কিন্তু করে ভিন্ন এবং যারা মুখের সাহায্যে জিহাদ করবে। তারাও মুমিনের কাতারে শামিল হবে, এমনিভাবে যারা অনন্ত দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে তারাও মুমিনের দলভুক্ত হবে। এরপর যারা থেকে যাবে সেক্ষেত্রে বুঝে নিতে হবে এদের অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণও ইমান নেই"।

সুতরাং ইসলাম বিরোধী ও শরিয়াহ বহির্ভূত বাস্তবতার সামনে আত্মসমর্পণ করা কখনো বৈধ হতে পারে না; বরং শরিয়াহসম্মত উপায়ে এর পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান, তারবিয়াত, সুকৌশল অবলম্বন এবং সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হবে। যতক্ষণ না জাতিগোষ্ঠী নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের সচেষ্ট হয়, অতঃপর আল্লাহ তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে সহযোগিতা করবেন।

আল্লাহ তো এমন কথাই বলেন যা প্রকৃত সত্য এবং তিনি সঠিক পথেই পরিচালিত করেন।

অসৎ কাজের প্রতিবিধানের স্তরবিন্যাস এবং এক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগের বৈধতা?

প্রশ্ন: সাম্প্রতিককালে গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক একটি বিষয়ে খুবই বাদানুবাদ ও আলোচনা-সমালোচনা চলছে, তা হচ্ছে অসৎ কাজের প্রতিবিধানে শক্তি প্রয়োগ প্রসঙ্গে। এক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করার অধিকার কে এবং কখন তা করা বৈধ হবে?

কতিপয়ের বক্তব্য হচ্ছে: তা একমাত্র সরকারের অধিকার। অর্থাৎ তা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, ব্যক্তিগত কোনো দায়িত্ব নয়; অন্যথায় এমন বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা-ফাসাদের সূচনা হতে পারে যা কোথায় গিয়ে ঠেকবে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। অপর এক দল একে প্রত্যেক মুসলিমের অধিকার; বরং তার ওপর আরোপিত ওয়াজিব বলে গণ্য করেন। এ ক্ষেত্রে তারা একটি বিশুদ্ধ হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন, যেখানে রাসুল সা. বলেছেন: "তোমাদের কেউ যদি কোনো খারাপ কাজ বা বিষয় দেখে তাহলে সে যেন হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করে দেয়, যদি তা করতে অপারগ হয় তাহলে যেন মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করে, যদি তাও করতে সক্ষম না হয় তাহলে যেন অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করে, আর এটাই হচ্ছে ঈমানের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বলতম স্তর"।[২২]

হাদিসে খারাপ বা অপছন্দনীয় কোনো বিষয় দেখার পর প্রথমত হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে মুখ দিয়ে অন্যথায় অন্তর দিয়ে পবির্তন করতে বলা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে দুর্বলতম ইমান। সুতরাং যে ব্যক্তি শক্তিশালী ইমানদার হওয়ার ক্ষমতা রাখে সে কেন দুর্বলতম ইমান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে?

এটিই আবেগপ্রবণ যুবকদেরকে উৎসাহী করে তোলে। অপছন্দনীয় কোনো বিষয় দেখে পরিণামের চিন্তা-ভাবনা করা ব্যতীত তারা বাহুবলের সাহায্যে এর পরিবর্তনে ঝাঁপিয়ে পড়ে; বিশেষ করে যেখানে সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের অন্যান্য নীতি-নির্ধারকগণ অপছন্দনীয় ও গর্হিত কাজে জড়িত থাকে অথবা এর ধারক-বাহকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তারা কখনো হালালকে হারাম বানিয়ে ফেলে অথবা শরিয়তের বিধি-বিধানকে অকেজো করে রাখে কিংবা শরিয়াহ প্রদত্ত শাস্তির বিধান রহিত করে দেয়। আবার কখনো সত্যের দাফন দিয়ে মিথ্যার জয়গানে মত্ত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত বা বেসরকারি পর্যায়ে যথাসাধ্য এ সকল অসৎ কাজের প্রতিবিধানের এগিয়ে আসা উচিত। তা করতে গিয়ে যদি কেউ দুঃখ-দুর্দশায়

---

[২২] ইমাম মুসলিম তার বিশুদ্ধ গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন।

পতিত হয়ে তাহলে আল্লাহর জন্যই তা হবে এবং যদি নিহত হয় তাহলে 'আল্লাহর রাস্তায়' বলে তা পরিগণিত হবে। এরাই শহিদ এবং হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী শহিদদের সর্দার হামযা ইবনে আবদুল মোতালিবের পার্শ্বে এদের অবস্থান হবে।

কখনো কখনো অধিকাংশ মানুষের কাছে, বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলিম যুবকের কাছে এ বিষয়টি দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে।

বিশেষ করে যখন দেখা যায় উল্লেখিত মতামতদ্বয়ের প্রথম মতের প্রবক্তারা হচ্ছে আলেমদের এমন একটি দল যারা জনসমাজে সরকার পূজারি বা নিরাপত্তা বাহিনীর এজেন্ট হিসেবে পরিচিত। তাই তাদের কথা গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদায় উপনীত হতে সক্ষম হয় না। অপর মতের প্রবক্তারা যুব সম্প্রদায়ের এমন একটি দল যাদেরকে কট্টরপন্থী, গোঁড়া, মৌলবাদী, আবেগ পূজারি ইত্যাদিতে অভিযুক্ত করা হয় এবং যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করা হয় যে, তারা শরিয়তের ভাষ্য বা মূলনীতিগুলোকে একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক না জুড়ে বাহ্যিকভাবে শাব্দিক অর্থ বা প্রকাশ্য ভাব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে।

আমরা এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক বিষয়ে আপনার থেকে কিছু মূল্যবান সময় কামনা করছি, যাতে উপরোক্ত মতামতদ্বয় থেকে কোনটি সঠিক অথবা এখানে তৃতীয় কোনো সঠিক মত আছে কি-না ইত্যাদি সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ তায়ালা মিথ্যার ধুম্রজাল থেকে সত্যকে বের করার ক্ষেত্রে আপনাদের কলমকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন॥

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিবিধানের আবশ্যকতা

> **জবাব:** ইসলামের মৌলিক অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের মধ্যে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিবিধান উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। আল্লাহ তায়ালা যে দু'টি মৌলিক উপাদানের কারণে মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকামী জাতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন তম্মধ্যে একটি হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধান। ইরশাদ হয়েছে: "তোমরাইতো শ্রেষ্ঠ জাতি। মানুষের কল্যাণে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধান করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে" (সুরা আলে ইমরান, ৩: ১১০)।

মু'মিনদের মৌলিক গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে : "তারা হচ্ছে আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাগমনকারী, তাঁর ইবাদাতকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী

উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য জমিনে বিচরণকারী, তাঁর সামনে রুকু ও সিজদাকারী, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিবিধানকারী, এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী" । (সুরা তাওবা, ৯: ১১২)। মুমিন নারীরা এখানে মুমিন পুরুষদের ন্যায়, এমন গুরুত্বপূর্ণ বিধান পালনে তাদেরও অংশগ্রহণ ও ভূমিকা রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এরা ভালো কাজের হুকুম দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে" (সুরা তাওবা, ৯: ৭১)। ঈমানের দাবি অনুযায়ী প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির একে অপরের ওপর ভ্রাতৃত্বের অধিকার রয়েছে, এমনিভাবে প্রত্যেক মুমিন নারীরও রয়েছে।

এ বিধান পালনে যারা সচেষ্ট থাকে কুরআনে তাদেরকে যেমনিভাবে সাধুবাদ জানানো হয়েছে, তেমনিভাবে যারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধানে এগিয়ে আসে না তাদেরকে নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। আল্লাহর কুরআনে ঘোষণা দিচ্ছে: "বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে থেকে যারা কুফরির পথ অবলম্বন করেছে তাদের ওপর দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার আ. মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল, তাদের গৃহীত সেই কর্মপদ্ধতি বড়ই জঘন্য ছিল" (সুরা মায়েদা, ৫: ৭৮-৭৯)।

এভাবে একজন মুসলমানের পরিচয় শুধুমাত্র এমনটি হতে পারে না যে, সে শুধুমাত্র নিজেরই কল্যাণ কামনায় ব্যস্ত থাকবে, ভালো কাজ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। নিজস্ব পরিমণ্ডলেই তার যাবতীয় কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্য কোনো ভালো ও কল্যাণের প্রতি তার কোনো মনোনিবেশ থাকবে না; যদিও তার চোখের সামনেই তা নিঃশেষ ও ধ্বংস হয়ে যায়। এমনিভাবে তার চতুর্পাশ্বে কোনো খারাপ কিছুর জন্ম ও লালন-পালন দেখলেও সে তা এড়িয়ে গিয়ে নিজের চরকায় তেল ঢালার কাজে ব্যস্ত থাকবে, একজন মুসলিমের ব্যক্তিত্ব কখনো এমনটি হতে পারে না।

বরং একজন মুসলমানের সত্যিকার পরিচয় হচ্ছে সে যেমনিভাবে নিজের কল্যাণ কামনায় রত থাকবে তেমনিভাবে অপরের কল্যাণ কামনাও তার মনোনিবেশের বাইরে থাকবে না। কুরআনের ছোট একটি সুরায় সংক্ষিপ্ত ভাষায় মুসলিম ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে: "সময়ের কসম! মানুষ আসলেই বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা

ছাড়া যারা ইমান আনে ও সৎকাজ করে এবং একজন অন্যজনকে হক থাকার ও সবর করার উপদেশ দেয়" (সুরা আল আস্‌র)।

সুতরাং একে অপরকে হক কথা ও সবরের উপদেশ দেওয়ার কাজে মনোনিবেশ ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতিগ্রস্থতা থেকে মুসলমানদের মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। একেই কুরআনের অপর জায়গায় সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিবিধান হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এটিই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও মুক্তির একমাত্র জামিনদার।

মুসলিম সমাজে যত প্রকারের পাপচারিতা, অনিষ্টতা ও ধ্বংসাত্মক কাজ হয়, তা এ সমাজের অমনযোগিতা, দুর্বলতা এবং পরস্পরের বিচ্ছিন্নতা ও যোগাযোগহীন ইত্যাদি কারণেই হয়ে থাকে। তাই এ সমাজে কোনো ধরনের অপরাধকর্ম স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসতে সক্ষম হয় না। অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন এ সমাজে তার কোনো নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং ধারাবাহিকতা নেই। এমনিভাবে অপরাধকর্ম এ সমাজে কখনো অনুমোদন ও বৈধতা লাভে সক্ষম হয় না।

যাবতীয় অপরাধকর্ম সংঘটনকে মুসলিম সমাজ ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর ন্যায় যাযাবরের জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য। সেও বেঁচে থাকে এবং জীবনযাপন করে থাকে; কিন্তু সমাজের অনাগ্রহ সত্ত্বেও আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ছন্নছাড়া অবস্থায় তাকে থাকতে হয়।

সুতরাং একজন মুসলিমের কাছে তার দ্বীনের দাবি হচ্ছে: অন্যায়-অনাচারের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদে সে সোচ্চার হবে এবং যাবতীয় অসৎকাজের প্রতিবিধানে এগিয়ে আসবে, যাতে অন্যায়-অবিচার এমন ভূ-খণ্ডে আসন গেড়ে বসতে না পারে যে ভূখণ্ডে এর কোনো স্থান নেই, এমন দেশে স্থায়ী হতে না পারে যা তার দেশ নয় এবং এমন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে স্থান পেতে না পারে যারা এর ধারক-বাহক নয়।

অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ ও এর স্তর বিন্যাসে বিশুদ্ধ হাদিস

আর এ ক্ষেত্রেই হজরত আবু সাঈদ খুদরীর রা. বর্ণনায় নবি সা. থেকে বিশুদ্ধ হাদিস পাওয়া যায়। তিনি বলেন: "তোমাদের কেউ যদি কোনো খারাপ কাজ বা বিষয় দেখে তাহলে সে যেন হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করে দেয়, যদি তা করতে অপারগ হয় তাহলে যেন মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করে, যদি তাও করতে সক্ষম না হয় তাহলে যেন অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করে, আর এটাই হচ্ছে ঈমানের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বলতম স্তর"।[২৩]

---

[২৩] ইমাম মুসলিম বিশুদ্ধ গ্রন্থের কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে আবু সাঈদ খুদরী থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন।

এখানে হাদিসের বক্তব্য সুস্পষ্ট যে মুসলমানদের যে কেউই যখনি কোনো খারাপ বা অপছন্দীয় কিছু দেখতে পাবে তা পরিবর্তন করা তার অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ে; বরং তার ওপর তা পরিবর্তনে এগিয়ে আসা ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

এ ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ হিসেবে যা বলা যায়, এখানে হাদিসে 'মান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। উসূলবিদগণের ভাষায়: 'মান' শব্দটি ব্যাপকতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যে বা যারাই কোনো খারাপ বা অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পাবে সবাইকে তা অন্তর্ভুক্ত করবে; চাই সে শাসকগোষ্ঠী হোক বা জনসাধারণের মধ্য থেকে হোক। রসুল সা. এখানে সকল মুসলিমকে উদ্দেশ্য বা সম্বোধন করেছেন, সাহাবায়ে কেরামগণ থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল প্রজন্মের কেউ এই সম্বোধনের বহির্ভূত থাকবে না।

রসুল সা. তখন ইমাম, রাষ্ট্রপ্রধান এবং জাতির শাসক ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জনসাধারনকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখনি তাদের কেউ কোনো খারাপ বা অসৎ কিছু দেখতে পাবে তখন সাধ্যমতো তা পরিবর্তনে যেন এগিয়ে আসে। তাঁর বক্তব্য ছিল: "যখনি তোমাদের (শাসিত জনগণ) কেউ কোনো খারাপ কিছু দেখতে পায় ..."।

অসৎ কাজের প্রতিবিধানের শর্তাবলী

যে বা যারাই অসৎ কাজের প্রতিবিধানে এগিয়ে আসে তাদের উচিত এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা, যা হাদিসের ভাষ্য থেকে উৎসারিত।

প্রথম শর্ত: সন্দেহাতীতভাবে খারাপ বা শরিয়াহ নিষিদ্ধ কাজ

হাদিসে যে খারাপ কাজটিকে প্রথমে পেশিশক্তির মাধ্যমে, অতঃপর মুখের মাধ্যমে, সর্বশেষে নিরুপায় অবস্থায় অন্তর দিয়ে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে খারাপ বা শরিয়াহ নিষিদ্ধ কাজের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এখানে 'মুনকার' শব্দ বলতে শরিয়াহ নিষিদ্ধ কার্য বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর পরিত্যাগ মানুষের ওপর আবশ্যক করেছে। যে এ সকল নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়বে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ তার জন্য থেকে শাস্তি নির্ধারিত হয়ে যায়; চাই তা কোনো খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়া হোক বা কোনো আবশ্যকীয় কাজ ত্যাগ করার কারণে হোক। চাই এ ধরনের হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ সগিরা হোক বা কবিরার অন্তর্ভুক্ত হোক। যদিও সগিরা গুনাহের কাজগুলোর ক্ষেত্রে শিথিলতা

প্রদর্শন করা হয় যা কবিরা গুনাহের কাজগুলোর ক্ষেত্রে করা হয় না; বিশেষ করে যদি সগিরা গুনাহের কাজের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা পাওয়া না যায় তাহলে বিভিন্ন উপলক্ষে এগুলোর অপরাধ থেকে বান্দাকে নিস্কৃতি দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তোমরা যদি বড় বড় গুনাহ থেকে দূরে থাকো, যা থেকে দূরে থাকার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে, তাহলে তোমাদের ছোট-খাটো খারাপ কাজগুলো আমি তোমাদের হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দেবো এবং তোমাদের সম্মান ও মর্যাদার জায়গায় প্রবেশ করিয়ে দেবো" (সুরা নিসা, ৪: ৩১)।

রসুল সা. বলেন: "পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ, জুমআ থেকে জুমআ, রমজান থেকে রমজান এগুলোর মধ্যবর্তী সকল (সগিরা) গুনাহকে মুছে দেয়, যদি কবিরা গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা যায়"।[২৪]

সুতরাং 'মুনকার' বলতে এখানে মাকরুহ অথবা সুন্নাত ও মুস্তাহাব ইত্যাদির পরিত্যাগ বুঝাবে না। একাধিক বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে যে এক ব্যক্তি রসুলকে সা. ইসলামে তার ওপর পালনীয় আবশ্যক বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নামাজ, জাকাত, রোজা ইত্যাদির কথা বললেন। প্রশ্নকারী পুনরায় বলল: এগুলো ব্যতীত আরো কিছু আছে কি-না? রাসুল সা. বললেন: আবশ্যকভাবে নেই; তবে যদি নফল বা অতিরিক্ত হিসেবে কিছু পালন করতে চাও তাহলে আছে। প্রশ্নকারী রাসুলের সা. এ কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠল: আল্লাহর শপথ! আমি আবশ্যকভাবে পালনীয় এই বিষয়গুলো থেকে কম-বেশি পালন করবো না। রসুল সা. বললেন: লোকটি সফল হবে অথবা বেহেশতে প্রবেশ করবে যদি তার কথায় সে সত্যবাদী হয়ে থাকে।[২৫] অপর এক হাদিসে এসেছে: রসুল সা. বলেন "যে ব্যক্তি কোনো বেহেশতী লোক দেখে আনন্দিত হতে চায় সে যেন এ লোকটিকে দেখে"।[২৬]

সুতরাং যে 'মুনকার' এর প্রতিবিধানের কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে তা অবশ্যই শরিয়াহ কর্তৃক 'হারাম' এ পর্যায়ের হতে হবে এবং প্রকৃতই শরিয়তে তা অপছন্দনীয় ও নিন্দিত হতে হবে। অর্থাৎ শরিয়তের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতির ভিত্তিতেই হারাম করা হয়েছে এমন বিষয় হতে হবে।

---

[২৪] ইমাম মুসলিম বিশুদ্ধ গ্রন্থে হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন।

[২৫] মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণিত।

[২৬] মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস, আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত।

শুধুমাত্র চিন্তা-গবেষণা বা ইজতিহাদ-ইসতিম্বাত করে হারাম করা হয়েছে এমন হতে পারবে না, যেখানে ভুল-সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যা স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে কখনো পরিবর্তন হতে পারে।

এমনিভাবে এর হারাম ও শরিয়তে বর্জিত হওয়ার বিষয়ে উলামাদের সর্বসম্মত রায় থাকতে হবে। সুতরাং যেখানে বৈধ-অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে অতীতে বা সমসাময়িক যুগে উলামাগণের মতানৈক্য রয়েছে, তা এ ধরনের মুনকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না যার পরিবর্তন বাহুবলের মাধ্যমে আবশ্যক; বিশেষ করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তা কখনো বৈধ হতে পারে না।

সুতরাং যে সকল ইস্যুতে অতীত ও সমসাময়িক যুগে আলেম-উলামা ও ফকিহদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে যেমন: ফটোগ্রাফিক ছবি, বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে বা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গান পরিবেশন, মহিলাদের হাতের তালু ও চেহারা হিজাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, মহিলাদের বিচারকার্যের দায়িত্ব পালন, এক স্থানের চন্দ্রোদয় অপর স্থানের রোজা রাখা বা রোজা ভাঙার ক্ষেত্রে গ্রহণীয় হওয়া, মহিলাদের বিচারকার্যের দায়িত্ব পালন, এক স্থানের রোজা রাখা বা রোজা ভাঙার ক্ষেত্রে গ্রহণীয় হওয়া এবং জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিকে চন্দ্রমাসের হিসেবের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা ইত্যাদি যে সকল ইস্যুতে আলেম-উলামা ও ফকিহদের থেকে নানাবিধ মতামত পাওয়া যায়, এ সকল ক্ষেত্রে কোনো মুসলিম ব্যক্তি, দল, গ্রুপ বা সম্প্রদায়ের জন্য বৈধ হতে পারে না যে নানাবিধ মতামত থেকে একটি মত গ্রহণ করে তা অপরের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করবে।

এমনকি সকলের বা অধিকাংশের মতামত সংখ্যালঘু বা স্বল্প সংখ্যকদের মতকে রহিত বা অনস্তিত্বে পরিণত করে না, যদিও তা একজনের মতামত হয়ে থাকে; তবে তাকে অবশ্যই মতামত প্রদানের যোগ্য মুজতাহিদ বা গবেষক পর্যায়ের হতে হবে। অনেক মতামত বা চিন্তাধারা এমনও রয়েছে যা একযুগে প্রত্যাখ্যাত ছিল, কিন্তু সময়ের আবর্তন-বিবর্তনে অপর এক যুগে তা প্রসিদ্ধ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

এমনও অনেক ফকিহ রয়েছেন যার মতামতকে দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে গ্রহণ করা হয়নি, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কেউ দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে সমর্থনপুষ্ট করে পেশ করার কারণে পরবর্তীতে তা গ্রহণীয় ও নির্ভরযোগ্য মতামতের রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার কথা উল্লেখযোগ্য। তালাক ও পারিবারিক জীবন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার বর্ণিত মতামতগুলো তার জীবদ্দশায় যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল এবং পরবর্তীতে কয়েক যুগ পর্যন্ত তা যে সকল বাধা-

বিপত্তির মোকাবেলা ও প্রতিরোধ করে আসছে তা ইতিহাসের সুপরিচিত এক অধ্যায়। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা এমন প্রজন্ম প্রস্তুত করে দিলেন যারা এগুলোর শুধু সমর্থন ও প্রচার-প্রসার করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং বর্তমানে এ সকল মতামত ও চিন্তাধারাগুলো বিভিন্ন মুসলিম ভূখণ্ডের বিচারকার্য, ফতোয়া প্রদান ও ইসলামি আইনের আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

যে অন্যায়ের প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বাহুবলের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক তা অবশ্যই সুস্পষ্ট এবং সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে প্রমাণিত অন্যায়-অনাচার বলে পরিগণিত হতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল আলেম-উলামাগণের ঐকমত্য থাকতে হবে; অন্যথায় এর প্রতিবিধান করতে গিয়ে অপর একটি অন্যায়-অনাচারের জন্ম হতে পারে। প্রত্যেকেই তার পছন্দনীয় মতটুকু অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার আগ্রহবোধ করতে পারে, যদিও তা বাহুবলের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে হয়ে থাকে!

কোনো কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে দেখা যায়, আবেগপ্রবণ ও উৎসাহী টগবগে যুবকদের একটি দল শিশুদের খেলনা, পুতুল ইত্যাদি বিক্রির দোকানগুলো ভেঙে দিচ্ছে; কারণ দেহবিশিষ্ট এ সকল মূর্তি কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত!

যখন তাদেরকে বলা হলো: অতীত যুগের আলেমগণ শিশুদের খেলনা হিসেবে এগুলোর বৈধতা দিয়েছেন; কারণ এর মাধ্যমে এ সকল ছবিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, এখানে সম্মান প্রদর্শনসহ হারাম হওয়ার যাবতীয় অবস্থাগুলো পাওয়া যাচ্ছে না ... ইত্যাদি। তখন তারা বলে: সে সময়ের ছবিগুলো বর্তমানের ন্যায় এত টেকনিক্যাল ও আধুনিক ছিল না যার চোখের পাতাগুলো জীবন্ত মানুষের ন্যায় উঠা-নামা করছে।

তাদেরকে বলা হয় কিন্তু শিশুরাতো এগুলোকে ডানে-বামে নিক্ষেপ করে থাকে, এগুলোর হাত-পা ইত্যাদি খুলে ফেলে এবং এগুলোকে কোনো সম্মান, মান -মর্যাদা ও পবিত্রজ্ঞান মনে করার যোগ্য বলে বিবেচনা করে না ... তারা এর কোনো উত্তর খুঁজে পায় না।

অপরাপর কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রে দেখা যায়, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে চাঁদ দেখা ও রোজা শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে কতিপয় যুবক জোরপূর্বক হোটেল, রেস্তোরাঁ, কফিশপ ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ সকল উৎসাহী যুবকদের ধারণা হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী দেশে রোজা শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে এখানেও রোজা শুরু হয়ে গেছে, তাই এখন প্রকাশ্যে দিবালোকে পানাহার করা বৈধ হতে পারে না।

যেমনি হয়েছিল মিশরে কোনো এক ঈদুল ফিতরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃক্ষ তাদের কাছে শাওয়ালে চাঁদ উদয় হওয়ার গ্রহণযোগ্য কোনো আলামত বা দলিল-প্রমাণ না

পাওয়ার কারণে পরবর্তী দিন রোজা রাখার ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু ইত্যবসরে পার্শ্ববর্তী কোনো কোনো দেশের দেখা যাওয়া এবং পরবর্তী দিনে ঈদ হওয়ার ঘোষণা হয়েছিল। তাই আগেপ্রবণ অতি উৎসাহী যুবকদের একটি দল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃপক্ষ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে চ্যালেঞ্জ করে আগামীকাল তারা একাই রোজা রাখা থেকে বিরত থাকবে এবং ঈদের নামাজ আদায় করবে; পরিণামে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল।

আমি মনে করি এখানে তাদের নানাবিধ ভুল হয়েছিল:

এক: চন্দ্রোদয় প্রমাণিত হওয়ার গহণযোগ্য উপায় নিয়ে আলেম-উলামা ও ফকিহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে: তাদের কেউ এ ক্ষেত্রে একজনের সাক্ষ্যকে যথেষ্ট মনে করেছেন, আবার কেউ দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা দাবি করেছেন। আবার অনেকে আকাশ মেঘমুক্ত থাকা অবস্থায় বিশাল এক সংখ্যক হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। প্রত্যেকেই এক্ষেত্রে দলিল-প্রমাণ ও স্বীয় যৌক্তিকতা পেশ করেছেন। সুতরাং মানুষকে নির্দিষ্ট একটি মত গ্রহণ করতে বাধ্য করা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যতীত অন্য কারো জন্য বৈধ হতে পারে না।

দুই: চন্দ্রোদয় প্রমাণিত হওয়ার জন্য উদয়স্থলের অভিন্নতা বা পার্থক্য গ্রহণীয় হবে কি-না? এ বিষয়ে ফকিহদের মতানৈক্য রয়েছে। একাধিক মাজহাব ও অর্ধিক সংখ্যক ফকিহগণ এক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের জন্য স্বীয় আকাশে চাঁদ দেখা যাওয়ার শর্তারোপ করেছেন এবং এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে তা গ্রহণীয় হবে না বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে আব্বাস ও তাঁর অনুসারীরাও এ মত প্রকাশ করেন। কুরাইব বর্ণিত হাদিস যা সহিহ মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দলিল।

তিন: ইসলামি আইনের মৌলিক একটি ধারা হচ্ছে: মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সরকার বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং জাতির প্রত্যেক সদস্যকে তা অবশ্যই মানতে হবে।

তাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যদি কোনো ইস্যুতে সুনির্দিষ্ট কোনো ইমাম বা কোনো মাজহাবের মতামত গ্রহণ করে থাকে তাহলে সবাইকে তা মেনে চলতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে উম্মতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করা যাবে না।

ফতোয়া প্রদানসহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমি এটাই বলতে চেয়েছি যে, রোজা রাখা এবং রোজা ভাঙার বিষয়ে আমরা মুসলমানরা সবাই যদিওবা একই কাতারে দাঁড়াতে সক্ষম না হই, তাহলে কমপক্ষে একই দেশের বসবাসরত নাগরিক হিসেবে সে দেশের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। একই দেশের অধিবাসী মুসলমানরা দু'ভাগে বিভক্ত হবে, কেউ রোজা রাখবে আবার কেউ রোজা ভাঙবে, এমনটি কখনো কাম্য ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আবেগপ্রবণ ও উৎসাহী যুবকদের উক্ত ভুল চিন্তাধারাগুলো বুলেটের সাহায্যে নয়; বরং সঠিক ও গ্রহণযোগ্য যুক্তি-তর্ক ও বুঝ প্রদানের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত: অন্যায়-অনাচার প্রকাশ্যরূপ ধারণ করা

অর্থাৎ যে 'মুনকার' তথা অন্যায় অনাচারের প্রতিবিধানে পেশিশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে তা অবশ্যই প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান হতে হবে। সুতরাং যা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে বা বন্ধ দরজার অন্তরালে সংঘটিত হয়ে থাকে সে ব্যাপারে গুপ্তচরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এবং গোপনে খোঁজ-খবর সংগ্রহ করতে তৎপর হওয়া বৈধ হবে না। বিভিন্ন মনিটরিং সেল, গোপন ভিডিও ক্যামেরা ইত্যাদির ব্যবহার, অথবা জোরপূর্বক গৃহে প্রবেশ করে কাউকে অপরাধকর্মে রত অবস্থায় ধরতে সচেষ্ট থাকা ইসলামি শরিয়তে বৈধ নয়।

অসৎ কাজের প্রতিবিধান সংক্রান্ত উক্ত হাদিসে অন্যায় অনাচারের প্রতিরোধ ও পরিবর্তনকে তা দেখতে পাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে: "তোমাদের কেউ যখন কোনো অপরাধকর্ম দেখতে পায়..."। সুতরাং নিছক জানতে পারা বা শুনতে পাওয়ার ওপর এ ধরনের কাজ সম্পৃক্ত হতে পারে না।

তাই কোনো ব্যক্তি যদি গোপনে কোনো পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং তা প্রকাশ্যে বলে না বেড়ায় ইসলামি শরিয়াহ তাকে শাস্তি প্রদানের জন্য কোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে না; বরং তার শাস্তির বিষয়টি আখেরাতে আল্লাহর জন্য ছেড়ে দেয়। ইসলামি আইন অনুযায়ী দুনিয়াতে তাতে পাকড়াও করার কোনো অজুহাতের আশ্রয় নেওয়া যাবে না; যতক্ষণ না তার অপরাধের খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এমনকি যে ব্যক্তি কোনো অপরাধ করার পর তা প্রকাশ না করে গোপনে আল্লাহর সাথে বোঝাপড়া করে নেয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, আখিরাতের শাস্তিও এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা হালকা করে দেন। যেমন: বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে: "অপরাধকর্ম করার পর যারা তা প্রকাশ করে বেড়ায় তারা ব্যতীত আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিই ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত"।

এ জন্যই গোপনে সংঘটিত অপরাধকর্মের ওপর কারো কোনো ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নেই। এর অগ্রভাগে রয়েছে অভ্যন্তরীণ ও অন্তরের রোগসমূহ যেমন- লৌকিকতা, কপটতা, মুনাফিকী, গর্ব অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা ও দ্বিমুখীতা ইত্যাদি। এ সকল অপরাধকর্মগুলো বাহ্যিক আকৃতিতে রূপ ধারণ না করা পর্যন্ত এগুলোর জন্য কাউকে পাকড়াও করা যাবে না যদিও এগুলো ইসলামি শরিয়তের সর্বোচ্চ কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ আমাদেরকে বাহ্যিকতার ওপর ভিত্তি করে ফায়সালা দিতে বলা হয়েছে এবং অন্তরের ফায়সালা আল্লাহ তায়ালার জন্যই নির্দিষ্ট।

উপর্যুক্ত কথার ওপর দলিল হিসেবে সর্বাগ্রে চমৎকার ও অদ্ভুত যে ঘটনাটি উল্লেখ করার দাবি রাখে, তা হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সংশ্লিষ্ট এবং ইমাম গাজ্জালী তাঁর ইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন গ্রন্থের "সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধান" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন: হজরত উমর রা. একদা দেওয়াল টপকে এক ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করে তাকে অপছন্দনীয় ও খারাপ অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিরস্কার করতে লাগলেন। লোকটি বলল, হে আমিরুল মু'মেনিন! আমি হয়ত একটি অপরাধ করতে পারি; কিন্তু আপনিতো এখানে তিনটি অপরাধ করলেন। উমর বললেন, সেগুলো কি? লোকটি বলল, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন "তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না" (সুরা হুজরাত, ৪৯: ১২), অথচ আপনি এখানে তা করলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন "সদর দরজা দিয়ে তোমরা গৃহে প্রবেশ করো" (সুরা বাকারা, ২: ১৮৯), অথচ আপনি তা না করে ছাদের কার্নিশ বেয়ে প্রবেশ করলেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন: "তোমরা অপরের গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না গৃহবাসীদের অন্তরঙ্গ হবে অর্থাৎ তাদের সম্মতি জেনে নেবে এবং তাদেরকে সালাম করবে"।[২৭] অথচ আপনি তা করেননি। হজরত উমর রা. তাকে ছেড়ে দিলেন এবং নিজের ওপর তাওবা করার বাধ্যবাধতকা আরোপ করলেন।[২৮]

বাহুবলের সাহায্যে অসৎকাজ প্রতিধানের তৃতীয় শর্ত: কার্যত ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হওয়া

অন্যায়-অনাচারের প্রতিরোধ ও পরিবর্তন যারা করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই তা করতে সক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে বৈষয়িক অথবা আত্মিক শক্তির অধিকারী হতে হবে, যাতে বড় কোনো ক্ষতির শিকার হওয়া ব্যতীত সহজেই কার্যোদ্ধারে সক্ষম হতে পারে।

---

[২৭] সুরা নূর ২৪: ২৭।

[২৮] আল এহইয়া, ৭/১২১৮, আশ শা'ব কর্তৃক মুদ্রিত, কায়রো।

আবু সাঈদ খুদরীর রা. বর্ণিত উক্ত হাদিস থেকেই এ শর্তের সন্ধান পাওয়া যায়। রসুল সা. বলেন: যারা শক্তির সাহায্যে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না তারা যেন মুখ তথা বর্ণনা-বিবৃতি দিয়ে তা পরিবর্তন করতে সচেষ্ট থাকে। অর্থাৎ যারা বাহুবল তথা বৈষয়িক শক্তি নেই সে যেন এ পথ ছেড়ে দিয়ে বর্ণনা-বিবৃতি, প্রতিবাদ মিছিল বা প্রতিবাদ সভা ইত্যাদি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, যদি সে তা করতে সক্ষম হয়।

শক্তির ব্যবহার সাধারণত ক্ষমতাবানদের জন্য সম্ভব। ক্ষমতাবান ব্যক্তি তার ক্ষমতার পরিধিতে তা ব্যবহার করে অসৎ কাজের প্রতিবিধানে সচেষ্ট হতে পারে। যেমন: স্বামী তার স্ত্রীর সাথে, বাবা তার সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের সাথে যারা তার ভরণ-পোষণে লালিত-পালিত, কোনো সংস্থার অধিকারী তার সংস্থার অভ্যন্তরে এবং সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান তার রাষ্ট্রসীমা বা কর্মসীমার পরিধিতে সাধ্য ও সক্ষমতার আওতার[২৯] থাকলে... ইত্যাদি।

আমরা এখানে বৈষয়িক অথবা আত্মিক শক্তির কথা এজন্য উল্লেখ করলাম; কারণ স্ত্রীর ওপর স্বামীর এবং পারিবারের ওপর গৃহকর্তার কর্তৃত্ব বৈষয়িক শক্তির বলে হয় না, বরং তা আদর-সোহাগ, মান-সম্মান, ভক্তি-শ্রদ্ধা ইত্যাদি আত্মিক শক্তির বলেই হয়ে থাকে।

অসৎ কাজ বা পাপাচার যদি সরকারের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে

তখনই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যখন অন্যায়-অনাচার সরকার বা রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় হয়ে থাকে, যার হাতেই বৈষয়িক ও সামরিক থেকে শুরু করে যাবতীয় শক্তির চাবিকাঠি। রাষ্ট্র বা সরকার যেখানে অপরাধী বা অপরাধের ধারক-বাহক হয়ে থাকে সেখানে অন্যায়-অনাচারের প্রতিবিধানে ব্যক্তি ও দলের কি করার আছে?

জবাব: তাদেরকে তার প্রতিবিধান ও পরিবর্তনের শক্তি ও সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করতে হয়ে। বর্তমান সময়ে তা তিন উপায়ে করা যেতে পারে:

এক: সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে: বর্তমান সময়ের অধিকাংশ রাষ্ট্র, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তাদের শাসনকার্য পরিচালনায়, পলিসি

---

[২৯] অর্থাৎ : কখনো রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষে তাদের কর্মপরিধি ও নেতৃত্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও সকল প্রকারের বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। যেমন : উমর ইবনে আব্দুল আযীয বংশীয় প্রথা রহিত করে শুরার ব্যবস্থার প্রচলন করতে সক্ষম হননি। এমনিভাবে হাবশের বাদশাহ নাজ্জাশী মুসরমান হওয়া সত্ত্বেও তা অনুযায়ী দেশ শাসন করতে পারেননি; কারণ তার প্রজাগণ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেনি, তিনি যদি ইসলাম অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করতে চাইতেন তাহলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হতো।

বাস্তবায়নে, বিরোধীদলকে দমন-নিপীড়ন ইত্যাদি কাজে সশস্ত্রবাহিনীর ওপর নির্ভরশীল। বিবেক-বুদ্ধির শক্তি নয়, বরং শক্তির বিবেক-বুদ্ধি হচ্ছে এ সকল সরকারের মূলভিত্তি। যে সকল সরকারের সাথে সশস্ত্র বাহিনীর একাত্মতা থাকবে তারা পরিবর্তনেচ্ছুক সকল জাতীয় স্পন্দনকে নিমিষেই গুঁড়িয়ে দিতে পারবে। যেমনিভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র আমরা দেখে থাকি, বিশেষ করে সর্বশেষে যা ঘটেছে চীনে, সেখানে সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় স্বাধীনতার দাবিদার ছাত্রবিপ্লবকে ঠান্ডা করে দেওয়া হয়েছে।

দুই: পার্লামেন্ট, সিন্ডিকেট, সিনেট বা আইনসভা ইত্যাদির মাধ্যমে: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যে আইন প্রণয়ন করতে বা সংশোধন ও পরিবর্তন কিংবা রহিত করতে সক্ষমতা অর্জন করে থাকে। সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে এ ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয় সে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করার মাধ্যমে যাবতীয় অন্যায়-অনাচারের প্রতিবিধান করতে এবং মানুষের ওপর তা চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়ে থাকে, যেখানে মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে সরকার প্রধান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানেরও বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ থাকে না।

তিন: বিশাল আকারের জনশক্তি ও জনসমর্থন যা 'ইজমা'র সাথে সামঞ্জস্যশীল এরূপ জনমত গঠনের মাধ্যমে। এ জনশক্তি কখনো আন্দোলিত হলে কোনো শক্তিই তার সামনে দাঁড়াতে কিংবা এর গতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। উত্তাল বিক্ষুব্ধ সাগরের পাগলা ঢেউ কিংবা বাঁধভাঙা বন্যার মতো এর গতি, যার সামনে কোনো কিছুই স্থির থাকতে পারে না। এমনকি স্বয়ং সশস্ত্র বাহিনীও এর সামনে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না; কারণ সর্বোপরি তারাও এ জনশক্তির একটি অংশ। তাদেরই বাপ-চাচা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-ভ্রাতা কিংবা আত্মীয় স্বজনের সমষ্টি হচ্ছে এ বিশাল জনশক্তি। ইরানের বিপ্লবে তো এমনটিই ঘটেছে।

যে বা যারা এ তিন শক্তির কোনো একটিও অর্জন করতে পারেনি তাদের উচিত ধৈর্যধারণ করে তা অর্জনে কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং পাশাপাশি মুখ ও কলম তথা বর্ণনা-বিবৃতি, লেখালেখি, দিকনির্দেশনা, দাওয়াতী তৎপরতা ইত্যাদির সাহায্যে অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে সচেষ্ট থাকা, যাতে এ ক্ষেত্রে এমন এক বিশাল জনমত অর্জন করা সম্ভবপর হয় যারা অন্যায়ের প্রতিবিধানে সংকল্পবদ্ধ হবে। এর পাশাপাশি যাবতীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এমন এক প্রজন্ম গঠন করতে আগ্রহী

হওয়া যারা সানন্দে সমাজ পরিবর্তনের দায়-দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিবে এবং এ লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাবে। আবু সা'লাবা আল খাশানী বর্ণিত হাদিসে এমনটিই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যখন তিনি রসুলকে সা. এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন "হে ইমানদারগণ! নিজেদের কথা চিন্তা করো, অন্য কারোর গোমরাহীতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই যদি তোমরা নিজেরা সত্য সঠিক পথে থাকে" (সুরা মায়েদা, ৫: ১০৫)। রসুল সা. তাকে বললেন, বরং তোমরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিবিধান করো যতক্ষণ না তোমরা দেখতে পাও যে, স্বার্থ, কৃপণতা ও কুপ্রবৃত্তি ইত্যাদির অনুসরণ ও অনুকরণ করা হচ্ছে, মানুষ দুনিয়ার গোলাম হয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতামত বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়ে উঠছে। যদি এমনটি দেখতে পাও তাহলে অন্য মানুষের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের কাজে মনোনিবেশ করতে থাকো। তোমাদের পশ্চাত্যে এমন দিবস অপেক্ষা করছে, এ দিবসগুলোতে যারা ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারবে তারা মূলত জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দাঁড়িয়েও ধৈর্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হবে। যারা এ দিবসগুলোতে তোমাদের ন্যায় কাজ করতে সক্ষম হবে তারা তোমাদের থেকে পঞ্চাশগুণ বেশি প্রতিদানের অধিকারী হবে।[৩০] কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে: "তুমি যখন দেখতে পাবে যে, অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে কিছু করা তোমার কোনো সাধ্য নেই"।

চার: **বড় কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকা:** শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে গিয়ে এর থেকে বড় কোনো ক্ষতির আশঙ্কামুক্ত থাকা। যেমন: এমন কোনো ফিতনা-ফাসাদের সূচনা হওয়ার আশঙ্কা না থাকা যেখানে নিরাপরাধ রক্তপাত ঘটে থাকে, ইজ্জত-আব্রুর শ্লীলতাহানি হয়ে থাকে এবং জনগণের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে থাকে। এর পরিণামে অন্যায়-অনাচার আরো শক্ত করে গেড়ে বসতে সক্ষম হয় এবং জালিমদের জুলুম আরো বেগবান হতে সক্ষম হয়।

তাই আলেম-উলামাগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে গিয়ে যদি এর থেকেও বড় অন্যায়ের সূচনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এক্ষেত্রে নীরব

---

[৩০] ইমাম তিরমিজী এ হাদিস বর্ণনা করেন এবং তিনি ইহাকে হাসান গরিব ও সহিহ বলেছেন। এমনিভাবে আবু দাউদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের সনদে বর্ণনা করেন। ইবনে মাযাহ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ ওতবা ইবনে আবী হাকিম থেকে তা বর্ণনা করেন।

ভূমিকা পালন করা বৈধ হবে। এমতাবস্থায় সম্ভাব্য দু'টি ক্ষতির অপেক্ষাকৃত বড় ক্ষতি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে স্বল্প ক্ষতিকে আলিঙ্গন করে নিতে হবে।

এ মর্মে বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে। রসুল সা. হজরত আয়েশাকে রা. বলেছেন: "তোমার জাতির সদস্যদের ইসলামের বয়স যদি স্বল্প না হতো তাহলে আমি কাবা শরিফকে ভেঙে ইব্রাহীমের ভিত্তির ওপর নির্মাণ করতাম"।

কুরআনেও এর সমর্থনে বিভিন্ন ঘটনাবলী উল্লেখ রয়েছে। মুসার আ. সাথে নবি ইসরাঈলের ঘটনায় মুসা আ. যখন তাঁর প্রভুর সাথে নির্ধারিত সাক্ষাত করতে গেলেন, যা চল্লিশ রাত্রিতে গিয়ে পৌঁছল। তাঁর এ সময়কার অনুপস্থিতির সুযোগ সামেরী তার সোনালী গো-বাছুর দিয়ে জাতির লোকদের ফিতনাগ্রস্থ করে ফেলল এবং তারা তার ইবাদাতে লিপ্ত হয়ে গেল। তার ভাই হারুন আ. জাতির লোকদের ওয়াজ-নসিহত করতে লাগলেন, কিন্তু তারা তাঁর নসিহতে কান দিল না; বরং তারা বলল "মুসা না আসা পর্যন্ত আমরা তো এরই পূজা করতে থাকবো" (সুরা ত্বহা, ২০: ৯১)। মূসা আ. ফিরে এসে তাঁর জাতিকে এ খারাপ অবস্থা তথা গো-বৎস পূজারত দেখে তাঁর ভাইয়ের ওপর খুব রাগ করলেন এবং রাগতস্বরে ভাইয়ের দাড়ি ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে আনলেন এবং বললেন "হে হারুন! তুমি যখন দেখলে এরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন আমার পথে চলা থেকে কিসে তোমাকে বিরত রেখেছিল? তুমি কি আমার হুকুম অমান্য করেছো? হারুন জবাব দিল: হে আমার সহোদর ভাই! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টেনো না। আমার আশঙ্কা ছিল, তুমি এসে বলবে যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং আমার কথা রক্ষা করোনি" (সুরা ত্বহা, ২০: ৯২-৯৪)। অর্থাৎ হারুন আ. তাঁর বড় ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে জাতির মধ্যস্থ ঐক্যবদ্ধতার সংরক্ষণকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন যাতে তার ভাইয়ের আগমনের পর দু'জনে পরামর্শ করে এ ভয়ানক ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম হন, যা সুচিন্তিত চিন্তাধারা ও সঠিক কৌশল অবলম্বনের দাবি করছিল।

এ হচ্ছে চারটি শর্ত। যে বা যারা শক্তিপ্রয়োগে অন্যায়ের প্রতিবিধানে এগিয়ে আসতে চায় তাদেরকে অবশ্যই উক্ত চারটি শর্তের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আংশিক পরিবর্তন সঠিক চিকিৎসা নয়

মুসলিম উম্মাহর অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে যারা কাজ করতে চান এবং ঘুণে ধরা এ সমাজের সংস্কার সাধনে এগিয়ে আসতে আগ্রহ পোষণ করেন এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হচ্ছে পাশ্চাদপদ যুগ

থেকে শুরু করে উপনিবেশিকতার যুগ, ধর্মনিরপেক্ষতার শাসন এবং জালেম শাসকদের শোষণ ইত্যাদি সময়ে মুসলিম উম্মাহর দেহে যে ক্ষত ও আঘাত সৃষ্টি হয়েছে তার ক্ষতি অনেক গভীরে এবং তার শেকড় অনেক সুদূরে প্রোথিত। এ সমাজে প্রচলিত অন্যায়-অনাচারের আংশিক পরিবর্তন এর প্রতিবিধান ও চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট নয়। অশ্লীল নাচ-গান থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটের বেলাল্লপনা, উলঙ্গ বেহায়াপনা, অশ্লীল অডিও ভিডিও ক্যাসেটের ছড়াছড়ি ইত্যাদি যাবতীয় অবৈধ ও অনুচিত কার্যাবলী এ সমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। বরং বাস্তব অবস্থা এর থেকেও বিপজ্জনক। এর প্রতিবিধান অবশ্যই বিরাট, ব্যাপক ও সুগভীর পরিবর্তনের দাবি রাখে।

এমন পরিবর্তন যা যাবতীয় চিন্তাধারা ও নিয়ম-নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এমন পরিবর্তন যাতে যাবতীয় মূল্যবোধ ও সকল মাপকাঠি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এমন পরিবর্তন যার আওতায় আখলাক তথা আচার-আচরণ এবং সকল কাজকর্মও থাকবে। এমন পরিবর্তন, যাবতীয়-নীতি, কৃষ্টি-কালচার, যার আওতা বহির্ভূত হবে না। এমন পরিবর্তন যেখানে অবশ্যই যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও আইন-কানুনও শামিল থাকবে।

> এর পূর্বে অবশ্যই ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, দিকনির্দেশনা এবং নমুনা উত্তর ইত্যাদি পেশ করার মাধ্যমে মানুষের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধন করতে হবে। মানুষ যখনি নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তনের যোগ্য করতে পারবে তখনি আল্লাহ তায়ালা তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে দেবেন, এটাই হচ্ছে সৃষ্টিজগতের আল্লাহর চিরাচরিত রীতি। "আসলে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা বদলান না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের গুণাবলী বদলে ফেলে" (সুরা আর রা'দ, ১৩: ১১)।

অসৎ কাজের প্রতিবিধানে নম্রতা অবলম্বন আবশ্যক

আরেকটি বিষয় এখানে ভুলে গেলে চলবে না, তা হচ্ছে অসৎ কাজের প্রতিবিধানে এবং পাপাচারীকে তার পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে অবশ্যই নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করা এবং সহানুভূতিশীল হওয়া আবশ্যক। রসুল সা. আমাদেরকে নম্রতা অবলম্বন করতে এবং সহানুভূতিশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি কাজেই নম্রতা ও কোমলতাকে পছন্দ করেন। নম্রতা ও কোমলতার উপস্থিতি প্রতিটি কাজের শোভা বর্ধন করে থাকে এবং এর অনুপস্থিতি প্রতিটি কাজকে অসুন্দর করে।

> ইমাম গাজালী 'এহ্ইয়া' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে যে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে এক ব্যক্তি খলিফা মামুনের মজলিসে প্রবেশ করে খুবই কঠোর ভাষায় তাকে আদেশ-নিষেধ করতে লাগল এবং তাকে বলল, হে জালেম, হে পাপাচারী ... ইত্যাদি। মামুন ছিল বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান এবং ধৈর্যশীল, সে অপরাপর রাজা-বাদশাহদের ন্যায় তাকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হয়নি; বরং তাকে বলল, একটু নম্র ও কোমলস্বরে কথা বলো, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমার চেয়েও উত্তম ব্যক্তিকে আমার চেয়েও খারাপ ও পাপাচারীর কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং সাথে সাথে তাকে নম্রতা ও কোমলতার নসিহত করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা মুসা ও হারুনকে আ. পাঠিয়েছিলেন, তারা নিশ্চয়ই তোমার থেকে উত্তম; তাদেরকে ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলেন, সে নিশ্চয়ই আমার থেকেও খারাপ ও নিকৃষ্ট ছিল; অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয়কে বলেছিলেন "যাও তোমরা দু'জন ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে" (সুরা ত্বহা, ২০: ৪৩-৪৪)।

ফেরাউনের মতো পাপাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী যার পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন "সে সীমালঙ্ঘন করেছে" এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা আশাব্যাঞ্জক শব্দ ব্যবহার করে বলেন "হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে"। এটা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, কোনো অবস্থাতেই দাওয়াতী তৎপরতা থেকে আল্লাহর পথের আহবায়কদের নিরাশ হতে নেই। যার প্রতি দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে সে যত বড় পাপাচারী ও অপরাধী হোক না কেন, দাওয়াতের ক্ষেত্রে যদি কঠোরতা ও সহিংসহা পরিত্যাগ করে নম্রতা, কোমলতা, সুকৌশল ও উত্তম সময় ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তাহলে এমতাবস্থায় ইতিবাচক ফলাফলের ব্যাপারে নিরাশ না হয়ে আশাবাদী হওয়া উচিত।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের মহানবি সা. এবং তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামগণের ওপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

গণতন্ত্র, বহুদলীয় রাজনীতি, নারী ও অমুসলিম প্রসঙ্গ

ইসলাম এবং গণতন্ত্র

প্রশ্ন: আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ি যখন কতিপয় ধর্মপ্রাণ ও আবেগপ্রবণ ব্যক্তিকে, যাদের কেউ কেউ আবার ইসলামিক আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট, বলতে শুনি যে গণতন্ত্র ও ইসলাম সাংঘর্ষিক এবং পরস্পর বিরোধী; বরং কতিপয় আলেমের বরাত দিয়ে এরা বলে যাচ্ছে যে গণতন্ত্র কুফরি দর্শন!! আর এ ক্ষেত্রে তাদের দলিল হচ্ছে গণতন্ত্র মানে হচ্ছে জনগণের জন্য জনগণের শাসন, অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে জনগণ শাসক হতে পারে না; বরং প্রকৃত শাসক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। "ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই জন্য" (সূরা আনআম, ৬: ৫৭)। এ ধরনের কথা অতীত ইতিহাসের খারেজিদের বক্তব্যের সাথে মিলে যায়, যার প্রতিউত্তর হজরত আলী রা. তাঁর সে ঐতিহাসিক কথার মাধ্যমে দিয়েছিলেন: "এটি সত্য ও বাস্তব কথা; কিন্তু স্বার্থ হাসিলের জন্য এর অপপ্রয়োগ করা হচ্ছে"।

তথাকথিত প্রগতিবাদী ও উদারনৈতিক সমাজব্যবস্থায় এ কথা বহুলাংশে প্রচলিত যে, ইসলামপন্থীরা হচ্ছে গণতন্ত্রের দুশমন এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরশাসনের সহযোগী।

আসলে কি ইসলাম গণতন্ত্রের দুশমন? গণতন্ত্র কি কোনো কুফরি ও গর্হিত বিষয়, যেমনিভাবে বলা হয়েছে? না-কি এটি ইসলামের উপর এক প্রকারের অপবাদ যা থেকে ইসলাম সম্পূর্ণ দায়মুক্ত?

এ বিষয়টি মধ্যমপন্থী ও সহনশীল ইসলামি ব্যক্তিত্ব এবং চিন্তাবিদদের থেকে সুস্পষ্ট সমাধান পাওয়ার দাবি রাখে, যারা কোনো প্রকারের বাড়াবাড়ি কিংবা শিথীলতার আশ্রয় না নিয়ে বিষয়টিকে যথাস্থানে রেখেই চিন্তা-গবেষণা করবে এবং এ ব্যাপারে ইসলামের উপর অনুচিত ও ভ্রান্ত কোনো দায়ভার চাপানো থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হবে; যদিও এ ব্যাপারে কতিপয় আলেম-উলামা থেকে অনুচিত কিছু বক্তব্য চলে এসেছে। সর্বোপরি তারাও তো মানুষ, তাদের কথায় ভুল-ভ্রান্তি বা সঠিক বিষয় থাকতেই পারে।

আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনাকে শরিয়তের দলিল-প্রমাণসহ এ বিষয়ে সঠিক সমাধান প্রদানে এবং এ ক্ষেত্রে আরোপিত যাবতীয়

সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে সত্যের উন্মোচন ঘটাতে তাওফিক প্রদান করেন। সাথে সাথে আরো প্রার্থনা করছি, আল্লাহ্ আপনাকে এ জন্য উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন! আমীন॥

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
আলজেরিয়া থেকে আপনার এ শুভাকাঙ্ক্ষী মুসলিম ভাই।

জবাব: অত্যন্ত আফসোসের বিষয়ে হচ্ছে কতিপয় ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের কাছে এবং বিশেষ করে যারা বিভিন্ন ধর্মীয় ইস্যুতে কথা বলেন কখনো তাদের কাছেও বিভিন্ন বিষয় এলোমেলো হয়ে যায়, তারাও হক-বাতিলের মাঝে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলেন। কখনো কখনো তা এমন পর্যায়েও গিয়ে ঠেকে যা প্রশ্নকারীর (আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন) উক্ত প্রশ্নে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ... এমনকি অপরকে কাফির বা ফাসিক ইত্যাদিতে আখ্যায়িত করা এখন সহজ বিষয়ে পরিণত হয়ে পড়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে শরিয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক একটি অপরাধ এবং সহিহ হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যিকারভাবে অভিযুক্ত না হলে তার দায়ভার যে নিজের কাঁধেই বর্তাবে তা যেন সবাই ভুলতে বসেছে।

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি আমার কাছে নতুন কোন বিষয় নয়। আলজেরিয়ার ভাইদের থেকে এ প্রশ্নটি অনুরূপ ভাষায় আমি বেশ কয়েকবারই জিজ্ঞেসিত হয়েছি এবং খুবই কঠিন ভাষায় তা করা হয়েছে: গণতন্ত্র কি কুফরি কোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত?

বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে আমি লেবাননের সিদা শহরে লেকচার দিতে গিয়ে কতিপয় জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়েছিলাম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে প্রশ্নটি ছিল তা হচ্ছে তুরস্কের সেক্যুলার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সেখানকার ইসলামি রেফাত পার্টির অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে। আমি তখন প্রশ্নকর্তাকে বললাম, ইসলাম ও মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদির মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনার মাঝেই এ বিষয়টির সমাধান খুঁজতে হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ যদি অংশগ্রহণের দাবি রাখে তাহলে তা অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ নেই। অতঃপর প্রশ্নকর্তা আমাকে বললেন, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা কিভাবে বৈধ হতে পারে, অথচ গণতন্ত্র তো একটি কুফরি বিষয়?!! এ বিষয়ে সে আমাকে একটি পুস্তিকাও দিয়েছিল!

কোনো বিষয়ে সমাধান প্রদানের পূর্বে তা সম্পর্কে সম্যক অবগতি আবশ্যক

বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে গণতন্ত্র সম্পর্কে ভালোভাবে জানাশোনা ও অধ্যয়ন ব্যতীত অনেকেই একে সুস্পষ্ট কুফরি ও অতি গর্হিত একটি বিষয় হিসেবে

বিবেচনা করে থাকে। এটি অবশ্যই পরিত্যাজ্য বলে অনেকে সমাধান দিয়ে থাকেন; অথচ তিনি এর নাম-শিরোনাম ব্যতীত এর মূলতত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত বক্তব্য সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিফহাল নন!

আমাদের সুপ্রাচীন আলেমদের কাছে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান হচ্ছে কোনো বিষয়ের সমাধান দেওয়ার পূর্বে এর বিভিন্ন দিকসহ তা সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করা আবশ্যক। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে না জেনে কোনো সমাধান দেয় তা অবশ্যই ভুল হতে বাধ্য। যদি কখনো নির্ভুল হয়ে থাকে তবে তা হবে নিতান্তই অকস্মাৎ বিষয়। হাদিসে এসেছে যে বিচারক না জেনে কোনো বিষয়ের ফায়সালা দেয় সেও ওই বিচারকের ন্যায় জাহান্নামী হবে যে সত্য জেনেও বিচারকার্যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

গণতন্ত্র, জগতের সর্বত্রই যার জয় জয়কার অবস্থা, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী যার দিকেই ধাবমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর যার নাগাল পেতে মরণপণ সংগ্রাম লিপ্ত, পূর্ব ইউরোপসহ অন্যান্য অঞ্চলের কোনো কোনো জাতি আবার জালেম স্বৈরশাসকের সাথে তিক্ত ও বেদনাদায়ক এক যুদ্ধের মাধ্যমে যার নাগাল পেতে সক্ষম হয়েছে, যার অর্জনের পথে অনেক রক্তপাত হয়েছে, হাজার হাজার নয়, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। অপরদিকে ইসলামপন্থীদের অধিক সংখ্যক যাকে ব্যক্তিশাসনের লাগাম টেনে ধরার এবং রাজনৈতিক স্বৈরশাসনের মূলোৎপাটনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন, যার তিক্ততা আরব ও মুসলিম জাতি আস্বাদন করে চলছে, উল্লেখিত সকল বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এ গণতন্ত্র কি প্রকৃতই অপছন্দনীয়, গর্হিত ও কুফরি বিষয় যেমনিভাবে কতিপয় পণ্ডিত (!) ব্যক্তিবর্গ বার বার আওড়িয়ে থাকেন?

গণতন্ত্রের মূল কথা কি?

পারিভাষিক ও একাডেমিক সংজ্ঞার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে সংক্ষেপে গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে জনগণই নির্বাচন করবে কারা তাদেরকে পরিচালনা করবে এবং কারা তাদের শাসক হবে, জনগণের মতামতকে পদদলিত করে তাদের অপছন্দনীয় কাউকে তাদের শাসক মনোনীত করা হবে না কিংবা তাদের অপছন্দনীয় কোনো শাসনব্যবস্থা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। সাথে সাথে শাসক যদি ভুল করে তাহলে তা পর্যালোচনার অধিকার জনগণের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং প্রয়োজনে তাকে পদচ্যুত করা বা পরিবর্তন করার অধিকারও থাকবে। জনগণের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও তাদের উপর কোনো মতবাদ, কিংবা রাজনৈতিক থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এমন কোনো নিয়ম-কানুন তাদের উপর

চাপানো হবে না যার সাথে তারা আদৌ পরিচিত নয় এবং যা তাদের মনঃপুত নয়। শাসকগোষ্ঠীর কেউ যদি উল্লেখিত মূলনীতির বিপরীত করে তাহলে তার প্রতিদান হচ্ছে যে, ক্ষমতাচ্যুত করে তাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে।

এটিই হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রকৃত মূলতত্ত্ব। এখানে মানবতা যে সকল কর্মপদ্ধতি খুঁজে পেয়েছে তা হচ্ছে নির্বাচন, জনগণের মতামত যাচাইকরণ, সংখ্যাগরিষ্ঠতার অগ্রাধিকার, বহুদলীয় রাজনীতি, সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ, বিরোধীদলের অধিকার সংরক্ষণ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ... ইত্যাদি।

সুতরাং উল্লেখিত মূলনীতি সংবলিত এ গণতন্ত্র কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক? কোথায় এ সংঘর্ষ? কুরআন ও সুন্নাহর কোন্ মজবুত দলিলের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের দাবি করা হয়ে থাকে?!

গণতন্ত্রের মূল কথা ইসলামের সাথে নীতিগতভাবে একমত

গণতন্ত্রের মূল কথা নিয়ে কেউ যদি চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে দেখতে পাবে যে ইসলামের মূলনীতির সাথে এখানে কোনো বৈপরীত্য নেই। মানুষ অপছন্দ করে কিংবা তাদে মনঃপুত নয় এমন ব্যক্তির ইমামতিকেও ইসলাম সমর্থন করে না। হাদিসে এসেছে “তিন ব্যক্তির নামাজ তাদের মাথার এক বিঘাত উপরেও পৌছে না ...” তাদের প্রথমজনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে “এমন ব্যক্তির নামাজ যে এমন সকল মানুষের ইমামতি করছে যারা তার ইমামতিতে সন্তুষ্ট নয়”।[১] নামাজের ব্যাপারে যদি ইসলামের এ জাতীয় বিধান হয়ে থাকে তাহলে জগত সংসার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় কিরূপ হতে পারে? বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে “তোমাদের শাসকদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে তারাই যারা তোমাদেরকে ভালোবাসে এবং তাদেরকে ভালোবাস, তারা তোমাদের কল্যাণ কামনা করে এবং তোমরাও তাদের কল্যাণ কামনা করে থাক; এবং তোমাদের মধ্যে খারাপ শাসক হচ্ছে তারাই যারা তোমাদের অপছন্দ করে থাকে এবং তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করে থাক, তারা তোমাদের অভিসম্পাত করে থাকে এবং তোমরাও তাদের অভিসম্পাত করে থাক”।[২]

---

[১] ইবনে মাযাহ/৯৭১, বুসিরী যাওয়ায়েদ গ্রন্থে উল্লেখ করেন : এ হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ এবং বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য। ইবনে হিব্বান তার সহি গ্রন্থেও এ হাদিস বর্ণনা করেন, আল মাওয়ারেদ/৩৭৭, উভয়ই ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন।

[২] ইমাম মুসলিম আওফ ইবনে মালেক থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন।

খোদায়ী দাবিদার শাসকগোষ্ঠীর প্রতি কুরআনের নিন্দাবাদ

যে সকল শাসকগোষ্ঠী আল্লাহর এ জমিনে নিজেদেরকে খোদা বলে দাবি করে প্রভূত্বের দোহাই দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিল এবং আল্লাহ বান্দাদেরকে নিজেদের বান্দা ও গোলাম হিসেবে গ্রহণ করেছিল, কুরআনে তাদেরকে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। যেমন পাপিষ্ঠ নমরুদ, কুরআনে ইব্রাহীম আ. এর সাথে তার আচরণ এবং তার সাথে ইব্রাহিম আ. এর অবস্থানের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, "তুমি সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করোনি, যে ইব্রাহীমের সাথে তর্ক করেছিলো? তর্ক করেছিল এ কথা নিয়ে যে, ইব্রাহীমের রব কে? এবং তর্ক এ জন্য করেছিলো যে, আল্লাহ তাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছিলেন। যখন ইব্রাহীম বললো, যার হাতে জীবনও মৃত্যু তিনিই আমার রব। জবাবে সে বললো, জীবন ও মৃত্যু আমার হাতে। ইব্রাহীম বললো, তাই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে, আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য উঠান, দেখি তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও। এ কথা শুনে সেই সত্য অস্বীকারকারী হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। নিশ্চয় আল্লাহ জালেমদেরকে সঠিক পথ দেখান না" (সুরা বাকারা, ২: ২৫৮)।

এ জালেম শাসক দাবি করে বসেছিল যে, সে জীবন মৃত্যু দান করার ক্ষমতা রাখে যেমনিভাবে ইব্রাহীমের প্রভু যিনি বিশ্ব জাহানেরও প্রভু, জীবন মৃত্যু দান করার ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং যেমনিভাবে ইব্রাহীমের প্রভুর আনুগত্য করা আবশ্যক তেমনিভাবে তার আনুগত্য করাও মানুষের উপর আবশ্যক!

জীবন মৃত্যু দানের ক্ষমতার দাবি করার ক্ষেত্রে তার দুঃসাহস এ মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল যে সে রাস্তা থেকে দু'জন লোক ধরে নিয়ে এসে একজনকে কোনো অপরাধ ব্যতীরেকেই শুলীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়ে বললো, দেখোতো আমিই তাকে মৃত্যু দান করলাম এবং অপরজনকে ছেড়ে দিয়ে বললো, দেখো, আমিই একে জীবন দান করলাম! সুতরাং আমি কি জীবন মৃত্যু দান করার মালিক নই?

একই পথের পথিক ছিল ফেরাউন, যে তার জাতির মাঝে ঘোষণা করেছিল: "আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় রব" (সুরা নাযিয়াত, ৭৯: ২৪)। এমনিভাবে গর্ব ও অহংকার ভরে সে বলেছিলো "হে সভাসদবৃন্দ, আমি ব্যতীত তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কোনো রবের কথা আমার জানা নেই" (সুরা কাসাস, ২৮: ৩৮)।

ঘৃণিত তিনটি দলের মধ্যস্থ ধ্বংসাত্মক মিত্রতার কথা কুরআনে উন্মোচন করে দেয়া হয়েছে:

এক: আল্লাহর এ জমিনে প্রভুত্বের দাবিদার জালিম শাসকগোষ্ঠী, যারা আল্লাহর বান্দাদের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসে, যেমন : ফেরাউন।

দুই: সুবিধাভোগী ও সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিবিদ, যে তার যাবতীয় মেধা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা জালেম স্বৈরশাসকের সেবায়, তার শাসন ক্ষমতা মজবুতিকল্পে এবং প্রজাতন্ত্রকে তার অনুগত রাখার জন্যই নিবেদন করে থাকে, যেমন : হামান।

তিন: জালেম স্বৈরশাসকের আশীর্বাদপুষ্ট পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী শোষক শ্রেণি, যারা অত্যাচারী শাসকের খেদমতে কিছু সম্পদ বিনিয়োগ করার মাধ্যমে জনগণের রক্ত মাংসের গড়া সম্পদ শতগুণ আদায় করে নেয়, যেমন : কারুন।

অন্যায় ও পাপাচারের অনুশীলন এবং মুসার আ. মিশরে বাধাদানকারী উল্লেখিত তিন মিত্র বাহিনীর কথা কুরআন কারিমে উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে অবশেষে আল্লাহ তায়ালা কঠিন পাকড়াও করেছিলেন এবং যাদের নিয়তিতে ধ্বংসেই অনিবার্য ছিল। "আমি মুসাকে ফেরাউ, হামান ও কারুণের কাছে আমার নিদর্শনসমূহ এবং আমার পক্ষ থেকে অদিষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা বললো জাদুকর, মিথ্যাবাদী" (সুরা মুমিন, ৪০: ২৩-২৪)। "আর কারুণ, ফেরাউন ও হামানকে আমি ধ্বংস করি। মুসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসে কিন্তু তারা পৃথিবীতে অহংকার করে অথচ তারা অগ্রগমনকারী ছিল না" (সুরা আনকাবূত, ২৯: ৩৯)।

বিস্ময়কর ব্যাপারে হচ্ছে, কারণ মুসার আ. সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, ফেরাউনের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না; কিন্তু সে তার জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাদের দুশমন ফেরাউনের সাথে আঁতাত করে নেয়, আর ফেরাউনও তাকে তার দলভুক্ত করে নেয়। এটি এ দিকেই ইঙ্গিত বহন করে যে, রক্ত-মাংস কিংবা জাত-বংশের ভিন্নতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বৈষয়িক স্বার্থই তাদেরকে একই সূত্রে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল।

জুলুম-অত্যাচার এবং ফিতনা-ফাসাদের মাঝে কুরআন বর্ণিত যোগসূত্র

কুরআনের সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্বের অন্যতম একটি দিক হচ্ছে এখানে জুলুম-অত্যাচার এবং ফিতনা-ফাসাদ উভয়ের মাঝে অভিনব এক যোগসূত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা ছিল বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ধ্বংস ও পতনের কারণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন "তুমি কি দেখনি তোমার রব সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী আদে-ইরামের সাথে কি আচরণ করেছেন, যাদের মতো কোনো জাতি দুনিয়ার কোনো দেশে সৃষ্টি করা হয়নি? আর মাসুদের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহে নির্মাণ করেছিল? আর কীলকধারী ফেরাউনের সাথে? এরা বিভিন্ন দেশে বড়ই

সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং সেখানে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। অবশেষে তোমার রব তাদের উপর আযাবের কশাঘাত করলেন। আসলে তোমার রব ওঁৎ পেতে আছেন" (সুরা ফজর, ৮৯: ৬ - ১২)।

কুরআন কখনো কখনো "আত তুগইয়ান" অর্থাৎ জুলুম-অত্যাচারকে "আল উ'লম" অর্থাৎ গর্ব-অহংকার এবং অন্যায় ও অবিচারের সাথে আল্লাহর বান্দাহদের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেয়ে বসা; এ ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমনিভাবে ফেরাউনের কথা বলতে গিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে "সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে সে ছিল প্রকৃতই উচ্চ পর্যায়ের লোক" (সুরা আদ দুখান, ৪৪: ৩১)।

"প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ফেরাউন পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়। তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে সে লাঞ্ছিত করতো, তাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং মেয়েদের জীবিত রাখতো। আসলে সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল" (সুরা কাসাস, ২৮: ৪)।

এভাবে আমরা দেখতে পেলাম জুলুম-অত্যাচার এবং বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা একটি অপরটির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জালেম স্বেচ্ছাচারী শাসকের অনুগত জাতির প্রতি কুরআনের নিন্দাবাদ

কুরআন শুধুমাত্র জালেম স্বৈরশাসকদেরকে নিন্দা জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে যারাই জালেম শাসকদের সহযোগী ছিল, তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় ছিল, তাদের দেখানো পথ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল এবং যাবতীয় দায়-দায়িত্বের লাগাম এ সকল জালেম শাসকদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা দর্শক ও সহযোগীর ভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছিল এদের কেউ কুরআনের ধর-পাকড় ও নিন্দাবাদ থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি।

> নূহের আ. জাতির কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "নূহ বললোঃ হে প্রভু, তারা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ওই সব নেতার অনুসরণ করেছে যারা সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি পেয়ে আরো বেশি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে" (সুরা নূহ, ৭১: ২১)।
>
> হুদের আ. জাতি আদ সম্প্রদায়ের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন: "এ হচ্ছে আদ, নিজের রবের নিদর্শন তারা অস্বীকার করেছে, নিজের রসূলদের কথাও তারা অমান্য করেছে এবং প্রত্যেক স্বৈরাচারী সত্যের দুশমনের আদেশ মেনে চলেছে" (সুরা হূদ, ১১: ৫৯)।

ফেরাউনের জাতির কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন : "সে (ফেরাউন) তার জাতিকে হালকা ও গুরুত্বহীন মনে করেছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল ফাসেক" (সূরা আয্ যুখরুফ, : ৫৪), "আর আমি মূসাকে নিজের নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট নিয়োগপত্রসহ ফেরাউন ও তার রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তাদের কাছে পাঠালাম: কিন্তু তারা ফেরাউনের নির্দেশ মেনে চললো, অথচ ফেরাউনের নির্দেশ সত্যাশ্রয়ী ছিল না। কিয়ামতের দিন সে নিজের কওমের অগ্রবর্তী হবে এবং নিজের নেতৃত্ব তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে, আর অবস্থানের জন্য এটি খুবই নিকৃষ্ট স্থান!" (সূরা হুদ, ১১: ৯৬ - ৯৮)।

জালেম ও অত্যাচারী শাসকদের পাপের বোঝা আংশিকভাবে হলেও জাতির উপর চাপানো হয়েছে এ জন্যই যে মূলত তাদের নীরব ভূমিকার কারণেই জাতির মধ্যে ফেরাউন শ্রেণির জন্ম হয়ে থাকে। তাই বলা হয়ে থাকে: ফেরাউনকে যখন বলা হলো কিসে তোমাকে ফেরাউন বানিয়েছে? সে বলল, আমাকে প্রতিহত করবে এমন কাউকে আমি পাইনি!

জালেম শাসকগোষ্ঠীর সেনাবাহিনীও শাসনযন্ত্রও তার পাপাচারের দায়দায়িত্ব বহন করবে

জালেম শাসকগোষ্ঠীর সাথে সাথে তার পাপাচারের যারা সর্বাধিক দায়দায়িত্ব বহন করবে তারা হচ্ছে শাসনযন্ত্র যাদেরকে কুরআনে 'আল জুনুদ' বা সেনাবাহিনী বলে নামকরণ করা হয়েছে। এর দ্বারা মূলত সামরিক শক্তিই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক শক্তির ঢাল-তলোয়ার এবং এর মাধ্যমেই শাসকগোষ্ঠী জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্দ করে দিয়ে থাকে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে "যথার্থই ফেরাউন, হামান ও তার সৈন্যরা (তাদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে) ছিল বড়ই অপরাধী" (আল কাসাস, ২৮: ৮), "অবশেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সাগরে নিক্ষেপ করলাম, এখন এ জালেমদের পরিণাম কি হয়েছে দেখে নাও" (সূরা কাসাস, ২৮: ৪০)।

জালিম শাসকশ্রেণির প্রতি সুন্নাতে নববীর নিন্দাবাদ

এমনিভাবে রসুলের সা. মুখনিঃসৃত পবিত্র হাদিস শরিফেও জালিম অত্যাচারী শাসকবর্গের প্রতি নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে, যারা লৌহদণ্ডের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। তাদের কথার প্রতিউত্তর নিয়ে এগিয়ে আসতে কেউ সাহসী

হয় না; বরং পতঙ্গপালের ন্যায়ে শাসকবর্গের সাথে জনগণও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়ে পড়ে।

এভাবে জালিম শাসকদের সহযোগী, যারা তাদের পথ বেয়ে চলে এবং তাদের সম্মুখে ধুপ প্রজ্জ্বলন ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে, সুন্নাতে নবির নিন্দাবাদ থেকে তারাও বাদ পড়েনি।

যে সকল জনগোষ্ঠী জালিম শাসকের ভয়ে সর্বদা তটস্থ থাকে, এমনি জালিমকে জালিম বলারও শক্তি-সাহস রাখে না হাদিস শরিফে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে।

আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সা. বলেন "জাহান্নামে একটি উপত্যকা থাকবে, সে উপত্যকায় একটি রূপ থাকবে যাকে বলা হবে 'হাবহাব', আল্লাহ তায়ালা সকল জালিম, স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারীদেরকে এখানেই বাসস্থান নিবেন"।[৩]

মুআবিয়া রা. হতে বর্ণিত, রসুল সা. বলেন: "আমার পরে এক দল শাসকগোষ্ঠীর আগমন ঘটবে, তারা যাই বলবে তার কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিউত্তর দেওয়া হবে না, পঙ্গপালের মতো তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে"।[৪]

হজরত জাবির রা. বর্ণনা করেন, রসুল সা. কা'বা ইবনে উজরাহকে বলেন "হে কা'ব! আল্লাহ তোমাকে মূর্খ ও অযোগ্য লোকদের শাসন হতে হেফাজত করুন!" কা'ব ইবনে বললেন অযোগ্য লোকদের শাসন কি? রসুল সা. বলেন "এমন শাসক যারা আমার পরবর্তীতে আসবে; কিন্তু আমার দেখানো পথ ধরে চলবে না, আমার কর্মনীতির অনুসরণ করবে না। তাদের মিথ্যাচারকে যারা সত্য বলে জানবে এবং তাদের অপকর্ম ও জুলুম-অত্যাচারের সহযোগী হবে তারা আমার দলভুক্ত নয়, আমিও তাদের দলভুক্ত নই এবং আমার হাউজে কাউছারের পানি তাদের নসিব হবে না; এর বিপরীত যারা এ সকল শাসকের মিথ্যাচারকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিবে না এবং তাদের অপকর্ম ও জুলুম-অত্যাচারের কোনো প্রকার সহযোগিতা করবে না তারা আমার দলভুক্ত, আমিও তাদের দলভুক্ত এবং তারা হাউজে কাওছারের পানি পান করতে সক্ষম হবে"।[৫]

---

[৩] ইমাম তাবারী হাসান সনদে এ হাদিস বর্ণনা করেন, ইমাম মুনজিরীও তারগীব গ্রন্থে এমনটি বলেছেন, হায়ছামী প্রণীত আল মাজমা' : ৫/১৯৭, হাকিম এ হাদিসকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন ৪/৩৩২।

[৪] আবু ই'য়ালা ও তাবরানী এটি বর্ণনা করেন। সহিহ জামেয়ুল সগীর/৩৬১৫।

[৫] আহমদ ও বায্‌যার এ হাদিস বর্ণনা করেন, উভয়ের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, দেখুন আত্ তারগীব লিল মুনজিরী, আয্ যাওয়ায়িদ লিল হাইছামী ৫/২৪৭।

হজরত মুআবিয়া রা. মারফু' হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেন "ওই জাতির মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না যেখানে সত্য ও ন্যায়ানুযায়ী ফায়সালা করা হয় না এবং যেখানকার দুর্বলরা দুঃখ-যাতনা সহ্য করা ব্যতীত সবলদের থেকে তাদের নায্য অধিকার আদায় করে নিতে সক্ষম হয় না"।[৬]

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেন: "যখন আমার উম্মতকে দেখবে যে, অত্যাচারীকে তা বলতেও ভয় পায়: হে জালিম বা অত্যাচারী ব্যক্তি! অর্থাৎ জালেমকে জালেম বলে সম্বোধন করতেও ভয় পায়, এমতাবস্থায় বুঝে নিতে হবে, তারাও জুলুমের পরিণাম বা শাস্তি মাথা পেতে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে"।[৭]

শুরা, নসিহত এবং আদেশ-নিষেধ

ইসলামি জীবনব্যবস্থার একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে শুরা তথা পরামর্শ গ্রহণ ইসলামে স্বীকৃত। ইসলাম পরামর্শ গ্রহণকে শাসকবর্গের উপর ও পরামর্শ প্রদানকে প্রজাদের উপর আবশ্যক করেছে; এমনকি পরামর্শ প্রদান করে, সদোপদেশ দেওয়া এবং কল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি বিষয়কে দ্বীনের পরিপূর্ণ রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর ইমাম তথা শাসকবর্গের দিকনির্দেশনা প্রদান এবং তাদের কল্যাণ কামনা করা এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এমনিভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধানকে ইসলাম একটি অত্যাবশ্যকীয় বিধান হিসেবে ঘোষণা করেছে বরং জালেম অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে সত্যের আওয়াজ বুলন্দ করাকে সর্বোত্তম জিহাদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে, ইসলামে আভ্যন্তরীণ ফিতনা-ফাসাদ ও জুলুম-অত্যাচারের প্রতিরোধ বহিঃ আক্রমণের প্রতিরোধ থেকে আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়। তা এ জন্যই যে, সাধারণত আভ্যন্তরীণ ফিতনা-ফাসাদ ও জুলুম-অত্যাচারই বহিঃ আক্রমণের পথ সুগম করে দেয়।

---

৬ তাবরানী নির্ভরযোগ্য সনদে এটি বর্ণনা করেন, মুনজিরী ও হাইছামীও অনুরূপ ব্যক্ত করেছেন, এমনিভাবে ইবনে মাসউদ থেকে উত্তম সনদেও এ হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে : ৫/২০৯, ইবনে মাযাহ দীর্ঘ একটি হাদিস আবু সাঈদ থেকে এটি বর্ণনা করেন।

৭ আহমদ তার মুসনাদ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেন, আল্লামা শাকের এ হাদেসের সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন (৬৫২১) এবং ইহাছামী বায্যার থেকে দু'টি সনদে বিষয়টি বর্ণনা করেন, এরমধ্যে একটি সনদের বর্ণনাকারী বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণনাকারীর অন্তর্ভুক্ত ৭/২৬২, হাকিম এ হাদিসকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন ৪/৯৬।

ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক

ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক হচ্ছে জনগণের নিযুক্ত প্রতিনিধি অথবা তাদের বেতনভুক্ত কর্মচারী। মালিক তথা জনগণের অধিকার রয়েছে তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধির কর্মতৎপরতার খোঁজ-খবর নেওয়া এবং ইচ্ছে করলে তার থেকে প্রতিনিধিত্ব কেড়ে নেওয়া; বিশেষ করে যখন সে এর দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আঞ্জাম দিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক কোনো নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ ক্ষমতার নাম নয়; বরং শাসকবর্গ মানুষ বৈ কিছু নয়, তারা যেমনিভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে তেমনিভাবে ভুলও করতে পারে। তারা ইনসাফ করতে পারে, আবার অবিচারও করতে পারে। জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের ভুল শুধরে দিবে এবং তারা বক্রতার পথ ধরলে তাদেরকে সোজা করে দিবে।

রসুলের সা. পথ বেয়ে আসা পরবর্তী মহান শাসকগণ তথা সঠিক ও সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনগণ এমনটিই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাদের দেখানো পথই হচ্ছে আমাদের চলার পথ, তাঁদের অনুসৃত নীতিই হচ্ছে আমাদের পাথেয়; যেহেতু তা মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মদের সা. সুন্নাত ও তাঁর শিক্ষা থেকেই উৎসারিত।

প্রথম খলিফা আবু বকর রা. তাঁর ভাষণে বলেন, হে মানবসকল! আমাকে তোমাদের উপর খেলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের থেকে কোনো অংশেই উত্তম নই, তোমরা যদি আমাকে সৎপথের উপর দেখতে পাও তাহলে আমার অনুসরণ করবে, এর বিপরীত আমাকে যদি বাতিল পথে দেখতে পাও তাহলে শুধরে দিবে। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যের উপর থাকি তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আনুগত্য করে যাবে, যদি আমি আল্লাহর নাফরমানি করি তাহলে আমার উপর তোমাদের কোনো আনুগত্য নেই"।

দ্বিতীয় খলিফা উমর আল-ফারুক বলেন "আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন যে আমার দোষ-ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দেয়!" তিনি বলেন "ওহে মানুষেরা! তোমাদের যে কেউ আমার মধ্যে কোনো বক্রতা দেখতে পায় সে যেন আমাকে সোজা করে দেয়...", উপস্থিত জনতা থেকে একজন প্রতিউত্তর দিয়ে বলল, হে ইবনুল খাত্তাব! আল্লাহর শপথ, আমরা যদি তোমার মধ্যে কোনো বক্রতা দেখতে পাই তাহলে আমাদের তরবারির ধারপ্রান্ত দিয়ে তা সোজা করে দিব![৮]

---

৮ অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত উমর এ কথা শুনে বলেন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যে, উমরের উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যে উমরকে তার তারবারীর মাধ্যমে শুধরে দিতে পারে- অনুবাদক।

তিনি মিম্বারের উপর থাকা অবস্থায় এক মহিলা তার মতামত প্রত্যাখ্যান করে তার প্রতিউত্তর দিয়েছিল, তিনি এতে আপত্তিকর কিছু দেখতে পাননি; বরং তিনি বললেন: "মহিলা সঠিক বলেছে, ওমরেরই ভুল হয়েছিল"।

এক ব্যক্তি হজরত আলীর রা. সাথে কোনো বিষয়ে বাদানুবাদ করলে তিনি তাকে বললেন, তুমি সঠিকই বলেছো, আমারই ভুল হচ্ছিল, "প্রত্যেক জ্ঞানবানের উপর একজন জ্ঞানবান রয়েছেন" (সুরা ইউসুফ, ১২: ৭৬)।

মূলনীতি প্রণয়নে ইসলামের অগ্রগামীতা

যে সকল মূলনীতির উপর গণতন্ত্রের ভিত প্রতিষ্ঠিত তা প্রণয়নে গণতন্ত্রের তুলনায় ইসলামের অগ্রগামীতা অনস্বীকার্য। কিন্তু ইসলাম এর প্রয়োগরীতি, বিস্তারিত বিধি-বিধান মুসলিম উম্মাহর চিন্তা-গবেষণার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। মুসলিম উম্মাহই তাদের ধর্মীয় মৌলিকত্ব, পার্থিব লাভ-লোকসান, স্থান, কাল ও পাত্রের ভিন্নতা এবং পরিবর্তিতে নিত্য নতুন অবস্থার আলোকে এ সকল মূলনীতির বিস্তারিত বিধি-বিধান, এবং এর বাস্তবিক প্রয়োগ তাদের কর্মনীতি ঠিক করে নিবে।

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

জুলুম-অত্যাচার এবং স্বৈরাচারী জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে জুলুমের কালো রাত্রির অবসান হয়েছে, গণতন্ত্র তার নিজস্ব একটি গঠন, প্রকৃতি এবং অবকাঠামো অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে গণতন্ত্রই হচ্ছে স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী রাজা-বাদশাহ এবং শাসকবর্গের জুলুম-অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র রক্ষাকবচ; যদিও মানব জাতির অন্যান্য সকল কাজ-কর্মের মতো এতেও কতিপয় সীমাবদ্ধাতা এবং দোষ-ত্রুটি থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়।

মানব জাতির গবেষক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের উপর এটি ব্যতীত অন্য কোনো উপায়-উপকরণের অনুসন্ধান করতে বিধি-নিষেধ নেই, হয়তোবা তা গণতন্ত্র থেকে আরো উত্তম এবং মানবতার মুক্তির জন্য আরো বেশি উপযুক্ত হতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি, দ্বিতীয় উপায় পদ্ধতি মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সহজলভ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলোর সঠিক প্রয়োগ এবং এর সমূহ বাস্তবায়নে তৎপরতার সাথে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। আদল- ইনসাফ কায়েম, শুরার বাস্তব রূপ দান, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জালিম অত্যাচারী শাসনবর্গের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া ইত্যাদির লক্ষ্যে যার বাস্তবায়ন একমাত্র আবশ্যক।

ইসলামি শরিয়তের সুপ্রতিষ্ঠিত একটি মূলনীতি হচ্ছে: যা ব্যতিরেকে আবশ্যকীয় কোনো কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায় না তাও তখন আবশ্যক হয়ে পড়ে। মৌলিক

কোনো কাজের লক্ষ্যে যদি কোনো উপায়-উপকরণ নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে তাহলে তা মৌলিক কাজটির সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হয়।

অমুসলিমদের থেকে চিন্তার কোনো খোরাক পেলে বা তাদের কর্মনীতিতে কোনো সমাধান খুঁজে পেলে তা গ্রহণ করতে ইসলামে কোনো বিধি-নিষেধ নেই। খন্দক বা পরিখার যুদ্ধে রসুল সা. পরিখা খননের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, যা ছিল মূলত পারসিকদের অন্যতম একটি রণকৌশল।

বদরের যুদ্ধবন্দীরা মুশরিক ও পৌত্তলিক হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে তাদের থেকে জ্ঞানার্জন করার জন্য রসুল সা. অনুমতি প্রদান করেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলমানের হারানো মানিক, যে যেখানেই তা পাবে সে সেখানে থেকেই তা গ্রহণ করতে পারবে।

আমি আমার বিভিন্ন লেখায় এ দিকেই ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেছি যে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-দর্শন ও বিধি-বিধান থেকে যা আমাদের জন্য উপকার বয়ে আনতে পারে তা গ্রহণ করা আমাদের জন্য অনুমতি রয়েছে, যদি তা কোরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট মৌলিক কোনো ভাষ্য অথবা শরিয়তের সুপ্রতিষ্ঠিত মৌলিক কোনো বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। অবশ্যই অন্যান্যদের থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হবে তাকে আমাদের মৌলিক সাজে সজ্জিত করে নিতে হবে, আমাদের মূল সত্তার সাথে তার সম্পর্ক জুড়ে নিতে হবে যাতে তার মূল জাতীয়তা হারিয়ে আমাদেরই অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।[১]

এ আলোকেই আমার গণতন্ত্রের মূলনীতি, উপায়-উপকরণ ও এর যাবতীয় ইতিবাচক দিকগুলো থেকে যা আমাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও আমাদের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ তা গ্রহণ করতে পারি; তবে এতে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের যাবতীয় অধিকার আমাদের থাকবে। আমরা এর মূল দর্শন গ্রহণ করব না, যেখানে হালালকে হারাম এবং হারামকে হলাল করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় বিধি-বিধানকে অকেজো করে রাখা হয় তা গ্রহণ করবো না।

নির্বাচন সাক্ষ্য প্রদানেরই অনুরূপ

আমরা যদি নির্বাচন, ভোট প্রদান ইত্যাদি বিধি-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাব যে এটি ইসলামের দৃষ্টিতে প্রার্থীর যোগ্যতার সাক্ষ্য প্রদান বৈ কিছু

---

[১] দেখুন : আমার রচনা "ইসলামিক সমাধান, প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা" শীর্ষক গ্রন্থের "ইসলামিক সমাধানের শর্তাবলী" শীর্ষক পরিচ্ছেদ থেকে "উদ্ধৃতি ও চয়নের বিধি-বিধান" নামক শিরোনামে লিখিত আলোচনা।

নয়। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে একজন সাক্ষীর সে সকল গুণাবলী ও যোগ্যতা থাকা শর্ত, যেমন আদল-ইনসাফ ও সন্তোষজনক চরিত্রের অধিকারী হওয়া ইত্যাদি তা একজন ভোটারের মধ্যেও বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। "তোমাদের মধ্য থেকে যারা ন্যায়বান তারাই কেবল সাক্ষ্য দিবে" (সুরা তালাক ৬৫: ০২), "আর সাক্ষীদের মধ্যে যাদের প্রতি তোমরা সন্তুষ্ট হও" (সুরা বাকারা, ২: ২৮২), স্থান কাল পাত্রভেদে আদল-ইনসাফের মাপকাঠিতে পরিবর্তন ও সহজ করা যেতে পারে যাবে বিশাল সংখ্যক নাগরিক সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত হতে পারে, তবে যারা আইনত দণ্ডণীয় অপরাধের সঙ্গে জড়িত এবং যারা দণ্ডপ্রাপ্ত, এ জাতীয় সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তারা অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে।

যে ব্যক্তি অসৎ কোনো ব্যক্তিকে সৎ বলে ভোট দিয়ে থাকে সে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের মতো মহাপাপে লিপ্ত হয়ে থাকে, যে অপরাধকে কুরআন কারিমে আল্লাহর সাথে অংশীদারীত্বের অপরাধের সাথে একাকার করে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে "মূর্তিপূজার আবর্জনা থেকে তোমরা বেঁচে থাক এবং মিথ্যা সাক্ষ প্রদান থেকে দূরে থাক" (সুরা হাজ, ২২: ৩০)।

যে ব্যক্তি কোনো প্রার্থীকে তার পরিবারভুক্ত, আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ কিংবা শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ অর্জন ইত্যাদির লক্ষ্যই নির্বাচিত করে থাকে সে আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘন করে থাকে। "আর তোমরা আল্লাহর জন্যই সাক্ষ্য প্রদান করো" (সুরা তালাক, ৬৫: ০২)।

আর যে ব্যক্তি নির্বাচনে ভোট প্রদান থেকে বিরত থেকে স্বীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা করল, যার ফলে উপযুক্ত প্রার্থী পরাজয় বরণ করল এবং সত্যিকারভাবে অনুপযুক্ত এবং যার মধ্যে শক্তিশালী ও আমানতদ্বার ও গুণদ্বয়ের সমাহার ঘটেনি এমন ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয় লাভ করল, সে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত আদেশ-নির্দেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করল। তাকে সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য আহবান করা হয়েছে, জাতির সর্বোচ্চ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সে তা থেকে নিজেকে বিরত রেখে সাক্ষ্য গোপন করল, অথচ আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করেছেন: "সাক্ষীদেরকে যখন সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকা হয় তারা যেন তাতে অস্বীকার না করে" (সুরা বাকারা, ২: ২৮২), "তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যারা সাক্ষ্য গোপন করে থাকে তাদের অন্তর গোনাহর সংস্পর্শে কলুষিত" (সুরা বাকারা, ২: ২৮৩)।

স্বাভাবিকভাবেই প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও এ জাতীয় শর্তাবলী ও প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সমাহারের আবশ্যকতা থাকবে এবং এ ক্ষেত্রে তা আরো গুরুত্বের দাবিদার হবে।

নির্বাচন সংক্রান্ত এ সকল বিধি-বিধান ও দিক নির্দেশনার পাশাপাশি পরিশেষে আমরা একে পরিপূর্ণ একটি ইসলামিক বিধি-ব্যবস্থা হিসেবে দাঁড় করানোর প্রয়াস পাব যদিও প্রকৃতই তা মুসলমান ব্যতীত অপরাপর জাতি-গোষ্ঠী থেকে সংগৃহীত।

জাতির শাসন এবং আল্লাহর শাসন

আমরা এখানে যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করার প্রয়াস পাচ্ছি এবং যার প্রতি শুরুতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য এবং এ ক্ষেত্রে ইসলামের মূল বক্তব্য সন্দেহাতীত ভাবে এক ও অভিন্ন। আমরা যদি সময়ের বাঁকে বাঁকে আগত বিভিন্ন অত্যাচারী রাজা-বাদশাহ এবং পাপাচারী শাসকবর্গের ইতিহাস, শাসকগোষ্ঠীর তল্পিবাহক আলেম-উলামা এবং অল্প বিদ্যায় ভয়ংকর একনিষ্ঠ আলেমদের ফতোয়া থেকে ইসলামকে বুঝতে ও জানতে চেষ্টা না করি; বরং ইসলামকে এর মৌলিক উৎস থেকে বুঝতে চেষ্টা করি এবং কুরআন, সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদার জীবনী ইত্যাদি নির্মল নির্ঝরণী থেকে ইসলামের বিধি-বিধান জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে উল্লেখিত বক্তব্য সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

যারা বলে থাকে গণতন্ত্র মানে জনগণের উপর জনগণের শাসন, এ কথা মেনে নেওয়ার মাধ্যমে মূলত আল্লাহর সার্বভৌমত্তকে অস্বীকার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, তাদের এ কথা সঠিক নয়। জনতার শাসন যা মূলত গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি, ইহা আল্লাহর সার্বভৌমত্তের মূলনীতি যা মূলত ইসলামি আইন প্রণয়নের মূল ভিত্তি, তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি মূলত ব্যক্তি শাসন তথা স্বৈরশাসনের সাথে সাংঘর্ষিক।

গণতন্ত্রের প্রতি আহবানের মাধ্যমে মানুষের উপর আল্লাহর সার্বভৌমত্তকে অস্বীকার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে না। গণতন্ত্রের আহবায়কদের কল্পনাও কখনো এমন চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক হয় নি। এখানে শুধুমাত্র যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয় এবং যা বাস্তবায়নের প্রতি সবাই লালায়িত থাকে তা হচ্ছে জগদ্দল পাথরের মতো জাতির ঘাড়ে চেপে বসা জালিম স্বৈরাচারী শাসকবর্গের পতন। নির্যাতন-নিস্পেষণ, জেল-জুলুম এবং লাঠি-ডাণ্ডাই হয়ে থাকে যাদের শাসনের হাতিয়ার। রসুলের সা. হাদিসে যাদেরকে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকা শাসক জালিম ও স্বৈরাচারী শাসক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তাদের অপসারণ।

হ্যাঁ, গণতন্ত্র বলতে এখানে যা কিছু বুঝানো হয়ে থাকে তা হচ্ছে জনগণই তাদের পছন্দসই শাসক নির্বাচন করবে, তার কার্যক্রমের খোঁজ-খবর রাখবে এবং শাসক জাতীয় সংবিধানের বিপরীত কর্মসূচি গ্রহণ করলে তা মেনে নিতে অস্বীকার করবে।

ইসলামের পরিভাষায় যদি শাসক কোনো খারাপ বা গোনাহ্‌র কাজের নির্দেশ দেয় তাহলে এক্ষেত্রে নির্দেশ লঙ্ঘন করতে হবে এবং জনগণের পরামর্শ বা সাবধানবাণীর প্রতি যদি আমল না দেয় তাহলে প্রয়োজনে শাসককে বরখাস্ত করার অধিকার জনগণের থাকবে।

(আল্লাহর সার্বভৌমত্ব) মূলনীতির উদ্দেশ্য

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজনবোধ করছি সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য" এটি ইসলামের একটি সার্বজনীন মূলনীতি, সকল পর্যায়ের ইসলামি আইনবিদগণ 'শরিয়তের বিধান' এবং 'বিধানদাতা' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বিধানদাতা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, নবি সা. তাঁর পক্ষ থেকে সংবাদ বাহক মাত্র। আল্লাহ তায়ালাই প্রকৃতপক্ষে আদশ-নিষেধ করেন, হালাল-হারামের বিধান জারি করেন এবং সকল বিষয়ের আইন-কানুন প্রণয়ন করেন।

খারেজী সম্প্রদায়ের বক্তব্য "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ফায়সালা করার মালিক হতে পারে না" এটি প্রকৃতই বাস্তব ও সত্য কথা; কিন্তু তাদের ব্যাপারে যে কারণে আপত্তি করা হয় তা হচ্ছে তারা যথাস্থানে এ কথার প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে প্রস্তুত ছিল না এবং তারা এর মাধ্যমে সকল বিষয়ে মানুষের ফায়সালাকে অস্বীকার করার একটি খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছিল, যা কুআনের সুস্পষ্ট বিরোধিতা বৈ কিছু নয়। কুরআন একাধিক স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের ফায়সালার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এরমধ্যে দাম্পত্য জীবনের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ফায়সালা করতে এগিয়ে আসার বিধান উল্লেখযোগ্য।

তাই হজরত আলী রা. খারেজি সম্প্রদায়ের এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেন "সত্য ও বাস্তব কথা; কিন্তু মিথ্যা ও অসৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হয়েছে"। তিনি তাদের বক্তব্যকে "সত্য ও বাস্তব কথা' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের নিন্দাবাদ করেছেন যে তারা অসৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করেছে।

আর কেনই বা তা সত্য ও বাস্তব কথা হবে না, আল্লাহ তায়ালাতো সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন "শাসন ও বিধান একমাত্র আল্লাহর জন্যই" (সুরা ইউসুফ, ১২: ৪০; সুরা আনআম, ৬: ৫৭)।

সুতরাং সৃষ্টির উপর আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, আর তা দু'ধরনের হতে পারে :

১. জগৎ সংসারে ক্ষমতার সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি জগতের সকল ক্ষমতার অধিপতি, তিনিই এ জগতের সকল কিছু স্বীয় ক্ষমতার মাধ্যমে পরিচালনা করেন এবং তাঁর চিরাচরিত নিয়মে এ জগত সংসারের সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন যেখানে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে "এরা কি দেখে না আমি ভূখণ্ডের ওপর এগিয়ে চলছি এবং এর গণ্ডি চতুরদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ রাজত্ব করছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই এবং তাঁর হিসেব নিতে একটুও দেরি হয় না" (সুরা আর রা'দ, : ৪১)। এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট যে এখানে রাজত্ব বা ক্ষমতা বলতে আইন প্রণয়ন তথা আদেশ-নিষেধ করার ক্ষমতা নয়; বরং এ জগত-সংসার পরিচালনায় আল্লাহর ক্ষমতা ও কুদরতের কথা বুঝানো হয়েছে।

২. আইন প্রণয়নের সার্বভৌমত্ব যাবতীয় আদেশ-নিষেধ প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্যই, তাইতো তিনি নবি ও রসুল প্রেরণ করেছেন, আসমানী গ্রন্থসমূহ নাজিল করেছেন, যেখানে তিনি সকল প্রকার বিধি-বিধান দিয়েছেন, আবশ্যকভাবে পালনীয় কাজগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছেন, হালালকে হালাল করেছেন এবং হারামকে হারাম করেছেন।

আল্লাহ তায়ালাকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদকে সা. নবি ও রসুল হিসেবে স্বীকৃতি দানকারী মুসলমান কখনো উপরে বর্ণিত আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে না।

যে সকল মুসলিম ব্যক্তিবর্গ গণতন্ত্রের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে থাকেন, তারা মূলত শাসন পদ্ধতির একটি অবকাঠামো হিসেবে তা গ্রহণ করার আহ্বান করে থাকেন যেখানে শাসক নির্বাচন, শুরার বাস্তবায়ন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধান, অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ এবং পাপকার্যের প্রত্যাখ্যান, বিশেষত যখন তা সুস্পষ্ট কুফরির দিকে ধাবিত হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামের রাজনৈতিক মূলনীতিগুলো বাস্তবরূপ লাভ করে থাকে।

যে বিষয়টি বিষয়টিকে আরো মজবুত করতে পারে তা হলো গণতন্ত্রের ধারক-বাহক হওয়া সত্ত্বেও সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকে যে, রাষ্ট্রীয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামি শরিয়ত হচ্ছে যাবতীয় আইন প্রণয়নের একমাত্র উৎস। এটি বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকেই নিশ্চিত করে থাকে। মূলতঃ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বলতে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানের সার্বভৌমত্ব এবং কর্তৃত্বকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে আরো একটি ধারা সংযোজন করা যায় যে সকল আইন-কানুন ইসলামি শরিয়তের সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিষয়াবলীর সাথে সাংঘর্ষিক হবে তা প্রত্যাখ্যাত। এটি মূলত নতুন কোনো ধারা নয়; বরং পূর্বোক্ত কথারই মজবুতকরণ।

সুতরাং গণতন্ত্রের প্রতি আহবান তথা জনগণের শাসন মেনে নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর শাসনের বিকল্প হিসেবে তা গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে না। উভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই।

যদিও এটি গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তথাপিও ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষকদের সুপ্রসিদ্ধ মত হচ্ছে কোনো বিষয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ মূলত মূল বিষয়ের সমপর্যায়ে নয়। তাই মানুষের অনুসৃত কর্মনীতির অবিচ্ছেদ্য বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাকে কাফির বা ফাসিক তথা পাপাচারী ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা যাবে না; কারণ কখনো মানুষ এ সকল অবিচ্ছেদ্য বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না; বরং কখনো একটি বারও এ সকল বিষয়ের প্রতি তাদের মনোযোগ ধাবিত হয় না।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার শাসন কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক?

ইসলামপন্থীদের মধ্যে যারা এ মতের প্রবক্তা এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি যে, গণতন্ত্র হচ্ছে আমদানিকৃত কতিপয় মূলনীতি যার সাথে ইসলামের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠতার শাসননীতির উপর তা প্রতিষ্ঠিত। শাসক নির্বাচন, যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্নকরণ এবং বিতর্কিত বিষয়ে মীমাংসাসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেই ফায়সালাকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট হচ্ছে সকল বিষয়ের শাসক এবং মূল কেন্দ্রবিন্দু। যে কোনো মত বা চিন্তাধারা, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, চাই নিঃশর্ত হোক বা শর্তযুক্ত হোক, তাহলে তাই হয়ে থাকে কার্যকরী এবং বাস্তবায়নযোগ্য, যদিও কখনো কখনো এটি ভুল অথবা মিথ্যা হয়ে থাকে।

এর পাশাপাশি তাদের দৃষ্টিতে ইসলামে এ জাতীয় উপায় বা পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে ইসলাম কোনো মতকে অন্য মতের উপর প্রাধান্য দেয় না; বরং এখানে কোনো মতামতের মূল বক্তব্যই বিবেচ্য, এখানে দেখা হয় মূল মতামতটি সঠিক না ভুল? যদি মূলত এটি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তা বাস্তবায়িত হবে, যদিও এর পক্ষে একাধিক ভোট পাওয়া না যায় অথবা আদৌ কোনো ভোট পাওয়া না যায়। আর যদি মূলত সেটি ভুল হয়ে থাকে তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে যদিও তার পক্ষে ৯৯% ভোট পাওয়া যায়!!

শুধু তাই নয়; বরং কুআনের অধিক সংখ্যক আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সর্বদা বাতিলের সারিতে থাকে এবং তা সর্বদা তাগুতের পক্ষ অবলম্বন করে থাকে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: "আর হে মুহাম্মদ! যদি তুমি দুনিয়ায় বসবাসকারী অধিকাংশ লোকের কথায় চলো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে" (আল আনআম, : ১১৬), "হে মুহাম্মদ! তুমি যতই চাও না কেন অধিকাংশ লোক তা মানবে না" (সুরা ইউসুফ, ১২: ১০৩)। এ জাতীয় বক্তব্য কুআনের অধিক সংখ্যক আয়াতের শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে "কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা সম্পর্কে অবগত নয়" (সুরা আরাফ, ৭: ১৮৭), "বরং অধিক সংখ্যক তা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়" (সুরা আনকাবূত, ২৯: ৬৩), "কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে ইচ্ছুক নয়" (সুরা হূদ, ১১: ১৭), "কিন্তু অধিক সংখ্যক মানুষ কৃতজ্ঞতা পোষণ করে না" (সুরা বাকারা, ২: ২৪৩)। এমনিভাবে কুআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় যে সংশোধন ও কল্যাণের ধারক-বাহকরা সর্বদা সংখ্যায় স্বল্প হয় থাকে। ইরশাদ হয়েছে "আর আমার বান্দাদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ" (সুরা সাবা, ৩৪: ১৩), "তবে যারা ইমান আনে ও সৎ কাজ করে একমাত্র তারাই এতে লিপ্ত হয় না এবং এ ধরনের লোক অতি অল্প" (সুরা সাদ, ৩৮: ২৪)।

উল্লেখিত বক্তব্য সটিক নয়, তা ভুল ও গলদ চিন্তা-ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের আলোচিত বিষয় হওয়া দরকার মুসলিম সমাজে প্রচলিত গণতন্ত্র নিয়ে, যেখানে অধিকাংশ মানুষ জানে, বুঝে, উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। অবিশ্বাসী, কাফির ও নাস্তিকদের সমাজ আমাদের এখানকার আলোচনা বহির্ভূত।

সুপ্রতিষ্ঠিত ও শ্বাশত বিষয়াবলীতে নির্বাচন বা মতামত প্রদানের কোনো সুযোগ নেই

কতিপয় বিষয় এমন রয়েছে যেখানে ভোটপ্রদান বা মতামত প্রদানের কোনো সুযোগ নেই। মতামত গ্রহণের জন্য তা উপস্থাপন করা হয় না; কারণ এগুলো চিরসত্য এবং চির প্রতিষ্ঠিত বিষয় যেখানে কোনো রদবদল করার সুযোগ নেই, তবে যদি সমাজ স্বয়ং পরিবর্তন হয়ে মুসলিম সমাজের পরিচয় হারিয়ে ফেলে তাহলে হয়তবা এ সকল সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়াবলীতে রদবদল আসতে পারে।

সুতরাং শরিয়তের অকাট্য বিষয়াবলী, দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি এবং কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যে সকল বিষয় সহজেই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলে বোধগম্য হয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে মতামত যাচাইয়ের কোনো সুযোগ নেই। মতামত আদান-প্রদান বা

যাচাই করা যেতে পারে যেগুলো ইজতেহাদ তথা চিন্তা-গবেষণাযোগ্য বিষয়, যেখানে একাধিক মত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যেখানে সাধারণত মানুষের দ্বিমত করার সুযোগ রয়েছে, যেমন কোনো পদের জন্য একাধিক প্রার্থী থেকে একজনকে মনোনয়ন করা, যদিও তা রাষ্ট্রপতির পদ হোক না কেন। এমনিভাবে ট্রাফিক আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, শিল্প-কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত ও হাসপাতাল ইত্যাদি পরিচালনার আইন-কানুন যা ইসলামি আইনবিদদের পরিভাষায় "আল মাসাহিল আল মুরসালাহ" অর্থাৎ জনকল্যাণমূলক বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে যুদ্ধ বা যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দেওয়া, ট্যাক্স নির্ধারণ অথবা রহিত করা, জরুরি অবস্থা জারি করা অথবা না করা, রাষ্ট্রপ্রধানের সময়সীমা নির্ধারণ করা এবং পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করা অথবা না করা ইত্যাদি এ জাতীয় বিষয়াবলীতে চিন্তা-ভাবনা ও একাধিক মতামতের অবকাশ রয়েছে।

এ সকল বিষয়াবলীতে যদি বিপরীতধর্মী একাধিক মত পাওয়া যায় তাহলে কি সিদ্ধান্ত ছাড়া তা রেখে দেওয়া হবে, না কোনো একটি মতক অগ্রাধিকার দিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে? যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়া কি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, না অবশ্যই এর জন্য যৌক্তিক কোনো কারণের অনুসন্ধান করতে হবে?

অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যতা নির্ভরযোগ্য একটি কারণ এবং এর যুক্তি-প্রমাণ হচ্ছে

মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, শরিয়তের যৌক্তিকতা এবং বাস্তবতা ইত্যাদির দাবি হচ্ছে অগ্রাধিকার দেওয়ার পেছনে কোনো না কোনো যৌক্তিক কারণ অবশ্যই থাকা প্রয়োজন, আর বিপরীতধর্মী একাধিক মতের উপস্থিতিতে সংখ্যাধিক্যতাই হচ্ছে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য যৌক্তিক কারণ; কারণ একজনের মতামতের তুলনায় দু'জনের মতামত সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অধিক প্রবল।

দু'জনের চেয়ে একজনের সাথে শয়তানের উপস্থিতি বেশি প্রবল

হাদিস শরিফে এসেছে "দু'জনের চেয়ে একজনের সাথে শয়তানের উপস্থিতি বেশি প্রবল"[১০]

---

[১০] ইমাম তিরমিজী 'ফিতান' অধ্যায়ে ওমর থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন, (২, ১৬৬), তিনি বলেন, হাদিসটি হাছান সহিহ গরিব। ইমাম তিরমিজী বলেন, ওমর ছাড়াও এ হাদিসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। হাকিমও এ হাদিসটি বর্ণনা করেন (১/১১৪) এবং তিনি

হাদিস: "তোমরা যদি পরামর্শের ভিত্তিতে ঐকমত্য অবলম্বন করতে"

হাদিস শরিফে এসেছে, রসুল সা. আবু বকর রা. ও ওমর রা.-কে বলেন, তোমরা যদি পরামর্শের ভিত্তিতে ঐকমত্যে পৌছতে তাহলে আমি তোমাদের বিপরীত মত পোষণ করতাম না";[১১] অর্থাৎ দু'জনের মতামত একজনের মতের উপর প্রাধান্য পাবে; যদিও তা নবির সা. মতো হউক না কেন, যতক্ষণ না তা শরিয়তের বিধি-বিধান বহির্ভূত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাবলিগ করা আবশ্যক এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না হয়।

ওহুদ যুদ্ধে সংখ্যাধিক্যের মতামত গ্রহণ

এমনিভাবে আমরা দেখি রসুল সা. ওহুদের ময়দানে সংখ্যাধিক্যের মতামত গ্রহণ করে মদিনার বাইরে গিয়ে দুশমনের মোকাবিলা করেছেন, অথচ তাঁর এবং বিশিষ্ট সাহাবিদের মত ছিল মদিনার অভ্যন্তরে থেকে দুশমনের মোকাবিলা করা।

ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরামর্শ সভা

হজরত ওমর রা. কর্তৃক নির্ধারিত ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরামর্শ সভা এখানে উল্লেখযোগ্য, যাদেরকে তিনি খেলাফতের জন্য মনোনীত করেছিলেন এমর্মে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তাদের মধ্যকার একজনকে খলিফা মনোনয়ন করা হবে এবং অবশিষ্টরা তাঁর হাতে আনুগত্যের বাইয়াত গ্রহণ করবে। যদি কারো ব্যাপারে তিন তিন ভোটে সমান হয়ে যায় তাহলে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য বাইর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের রা. মতামত গ্রহণ করতে হবে। যদি তারা এতে সম্মত না হয় তাহলে তিনজনের যে পক্ষে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রয়েছে তা গ্রহণ করতে হবে।

হাদিস: "আস্ সাওয়াদুল আ'জম" তথা বিশাল সংখ্যক জনমত

হাদিস শরিফে আস্ সাওয়াদুল আ'জমের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। আস্ সাওয়াদুল আ'জম এর অর্থ হচ্ছে: সাধারণ

শাইখাইনের শর্তে এ হাদিসকে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবীও তাকে সমর্থন করেছেন।

[১১] ইমাম আহ্মাদ আবদুর রহমান ইবনে গানাম আমআরী থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন: (৪/২২৭), তার সনদে শাহর ইবনে হাওশাব রয়েছে, ইবনে হাজার তার সম্পর্কে তাক্বরীব গ্রন্থে বলেছেন : সত্যবাদী, কিন্তু বেশি বেশি ভুলের শিকার। শাইখ আহমদ শাকের তার এ মতকে সমর্থন করেন।

জনমত ও জনগণের অধিকাংশের মতামত। এ হাদিসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে, এরমধ্যে কোন কোন সনদ শক্তিশালী[১২] এবং বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে ফায়সালার ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলেম - উলামা কর্তৃক এ হাদিস গ্রহণ করাও উক্ত হাদিসের বিশুদ্ধতার জন্য অন্যতম দলিল। এ হাদিসের আলোকে ইসলামি চিন্তাবিদগণ অধিক সংখ্যক জনশক্তির মতামতকে কোনো বিতর্কিত বিষয়ের একটি দিকের অগ্রাধিকারের জন্য অন্যতম কারণ হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন, যদি অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এর সাথে সাংঘর্ষিক দ্বিতীয় অন্য একটি দিক পাওয়া না যায়।

ইমাম আবু হামিদ গাজালী তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন যখন অন্যান্য দিক থেকে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি সমান পর্যায়ে অবস্থান করে।[১৩]

---

[১২] ইমাম তাবরানী মারফু সনদে আবু উমামা থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন। সেখানে রয়েছে: "বনি ইসরাঈল একাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, অথবা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর এ উম্মতের মধ্যে আরো একটি দলে বেশি হবে, সবাই জাহান্নামী হবে, শুধুমাত্র বিশাল সংখ্যক জনশক্তি যা অনুসরণ করে তা ব্যতীত। আল মু'জাম আল কাবীরঃ ৮/৮০৩৫। ইমাম হাইছামী মাজমায়ুয যাওয়ায়েদ গ্রন্থেও তা উল্লেখ করেন এবং বলেন, ইমাম তাবরানী তা বর্ণনা করেন এবং তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, ৬/২৩৩, ২৩৪। অন্যত্র তিনি বলেন, ইমাম তাবরানী আওসাতে কাবীরেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, এ সনদে আবু গালিব রয়েছেন যাকে ইমাম ইবনে মুয়ীনসহ অনেকেই নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং এছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণও এখানে নির্ভরযোগ্য। এমনিভাবে আওসাতে কাবীরের একটি সনদেও তা উল্লেখ হয়েছে (৭/২৫৮)। তাবরানী ও আহমদ তার মুসনাদ গ্রন্থে আল ইবনে আবী আওফা থেকে মাওকুফ সনদে এ হাদিস বর্ণনা করেন, রসুল সা. বলেন, "হে ইবনে জাহমান, তোমাকে অধিক সংখ্যক জনশক্তির মতামতকে অনুসরণ করতে হবে", হাইছামী বলেন, আহমদের সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য ৬৫/২৩২, এমনিভাবে ইবনে ওমর থেকে ইবনে আবি আসেম (৮০) তা বর্ণনা করেন যার শব্দ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা কখানো ও উম্মতকে গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না, আল্লাহর সাহায্য ও রহমত সর্বদা সংঘবদ্ধ জীবনের উপর, তাই তোমরা অধিক সংখ্যক জনশক্তির মতামতকে অনুসরণ করো; কারণ যে দলচ্যুত হবে একাকীত্ব তাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাবে"। আলবানী বলেন, এর সনদ দুর্বল। একজন উল্লেখযোগ্য ইমাম, তাই তার থেকে বর্ণিত এ সকল সনদের অবশ্যই গ্রহণযোগ্য ভিত্তি থাকবে।

[১৩] দেখুন : শুরা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর কার্যকারিতা - ড. আবদুল হামিদ আল আনসারী।

যারা বলে যা শুদ্ধ ও সঠিক তাই অগ্রাধিকারযোগ্য হবে যদিও তার সাথে একজনও না থাকে, অপরদিকে যা ভুল তা প্রত্যাখ্যাত হবে যদিও তার সাথে ৯৯% জনশক্তি পাওয়া যায়, এ ধরনের বক্তব্য ওইসকল বিষয়াবলীর ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে যেখানে শরিয়তের সুস্পষ্ট বিধান সম্বলিত ভাষ্য রয়েছে যাতে সন্দেহ, মতানৈক্য ও বিরোধীতার কোনো সুযোগ নেই। এ ধরনের বিষয় খুবই স্বল্প ও নগণ্য। এ সকল বিষয়ে বলা হয়ে থাকে "যা সত্য ও ন্যায়ানুযায়ী হয়ে থাকে তাই সংঘবদ্ধ শক্তি যদিও সেখানে তুমি একাকী হও"।

অপরদিকে ইজতিহাদ তথা চিন্তা-গবেষণাযোগ্য বিষয় যেখানে শরিয়তের সুস্পষ্ট কোনো ভাষ্য নেই, অথবা এমন ভাষ্য রয়েছে যা একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে, অথবা এর বিপরীত সমপর্যায়ের বা এর থেকে শক্তিশালী ভাষ্য পাওয়া যায়, এমতাবস্থায় পারস্পরিক বৈপরীত্য দূরীকরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের দাবিদার কোনো বিষয়ের প্রতি আশ্রয় নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। আর মতামত যাচাই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি পদ্ধতি যার সাথে মানুষ দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত এবং যা জ্ঞানী-গুণীদের কাছে পছন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য। আর মুসলিম জনশক্তি এবং মুসলিম সমাজও এর আওতাধীন। মুসলমানদের বিধি-বিধানে এর সাথে সাংঘর্ষিক কিছু পাওয়া যায় না; বরং ভাষ্যসহ এমন কিছু পাওয়া যায় যা এর প্রতি সমর্থন যোগায়।

সমসাময়িক এবং অতীত ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহর যে দুর্দশা তার প্রধান কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের সর্বপ্রথম দুর্দশা হচ্ছে শুরা তথা পরামর্শ ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন। যার ফলশ্রুতিতে "খেলাফাতে রাশেদাহ" পরিণত হলো "লোভনীয় ও ক্ষমতা আকড়ে ধরা সাম্রাজ্যে" যাকে কতিপয় সাহাবি 'কিসরা' বা 'কায়সার' এর সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের স্বেচ্ছাচারিতার ছোঁয়াচে রোগ মুসলমানদের মধ্যে সংক্রমিতি হয়েছিল ওই সকল সাম্রাজ্য থেকেই যাদের উপর আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। অথচ মুসলমানদের উচিত ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত ওই সকল জাতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং যে সকল গুনাহ্ ও অপরাধ তাদের সাম্রাজ্যের পতনকে তরান্বিত করেছিল তা থেকে বিরত থাকা। কিন্তু হায় আফসোস! তাদের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে খারাপ বিষয়টিই মুসলমানরা তাদের রাষ্ট্রের জন্য গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা ও পৃথিবীতে গর্ব-অহংকার ও দম্ভভরে শাসনকার্য পরিচালনা করা। অথচ আল্লাহর এ জমিন পরিচালনা তো তারাই করবে যারা জমিনে গর্ব-অহংকার করে না এবং যাবতীয় ফিতনা-ফাসাদ থেকে নিজেদের নিরাপদে রাখে।

ইসলাম, মুসলমান, মুসলিম জাতি এবং মুসলিম দাওয়াতের বর্তমান সময়ের যে পতনোম্মুখ অবস্থা তা স্বৈরশাসনের ফলাফল বৈ কিছু নয়, যা খলিফা মুয়েজের তরবারির মাধ্যমে জনগণের উপর চেপে বসেছে। স্বৈরাচার জেল-জুলুম, নির্যাতন-নিপীড়ন ও লৌহ-ডাণ্ডা ইত্যাদি আল্লাহর শরিয়াহকে অকেজো করে রেখেছে, মানুষের উপর সেক্যুলারিজম চাপিয়ে দিয়েছে এবং মানুষকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। স্বৈরশাসনের তত্ত্বাবধানেই ইসলামি দাওয়াত, ইসলামি আন্দোলন ও এর ধারক-বাহকদের জেল-জুলুম, নির্যাতন ও দেশান্তর প্রভৃতির মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেওয়ার রীতিমতো প্রয়াস চলছে। কখনো স্বৈরাচার প্রকাশ্যে এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আবার কখনো তা গণতন্ত্রের মিথ্যা বুলির আশ্রয় অবলম্বন করে তার কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে, আর ইসলাম বিরোধী শক্তি প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তার গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

আমাদের সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা

ইসলাম মানুষকে সীমিত ও শর্তযুক্ত যে স্বাধীনতা দিয়েছে তা ব্যতীত তা কখনো ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়নি, ইসলামি দাওয়াত কখনো প্রসার লাভ করেনি, দাওয়াতের ধ্বনি কখনো সুউচ্চ হয়নি এবং এর পুর্নজাগরণ কখনো বিস্ফোরিত হয়নি। এ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে মানুষ তার ফিতরাত তথা স্বভাবের সাথে বোঝাপড়া করার সুযোগ পেয়েছে, দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার পর মানুষের কর্ণকুহরকে তা বিদীর্ণ করতে এবং তার বিবেক-বুদ্ধিকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমান সময়ে ইসলামি দাওয়াত, ইসলামি পুনর্জাগরণ ও ইসলামি আন্দোলনগুলোরে সামনে সর্বপ্রথম যে চ্যালেঞ্জ তা হচ্ছে স্বাধীনতার চ্যালেঞ্জ। তাই ইসলামের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত সমবেত কণ্ঠে স্বাধীনতার প্রতি আহবান করা, এর সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট থাকা। স্বাধীনতার প্রতি মানুষ সর্বদা মুখাপেক্ষি এবং বিকল্প হিসেবে এর মোকাবিলা দ্বিতীয় একটি নেই।

এখানে আমি একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজনবোধ করছি যে, ইসলামি ভাবধারা ফুটিয়ে তোলার জন্য মৌলিকভাবে আমদানিকৃত শব্দ যেমন গণতন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করার প্রতি আমার আসক্তি নেই; বরং ইসলামি ভাবধারা ও মূল্যবোধ বুঝানোর ক্ষেত্রে আমি সর্বদা ইসলামিক পরিভাষা ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আমাদের ব্যক্তিত্ববোধ এবং আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রাখতে এটাই হচ্ছে সর্বোপযুক্ত পদ্ধতি।

কিন্তু যখন কোনো পরিভাষা মানুষের মধ্যে বহুলাংশে প্রচলিত হয়ে যায় এবং মানুষ তা ব্যবহার করতে শুরু করে এমতাবস্থায় তো কানে আঙুল দিয়ে বধির হয়ে বসে

থাকার কোনো যৌক্তিকতা নেই; বরং আমাদের উচিত এর অর্থ, ভাব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া, যাতে আমরা এর ভুল অর্থ না বুঝি এবং এর দ্বারা যে অর্থ গ্রহণের কোনো সম্ভাবনা নেই অথবা এর প্রবক্তাগণ যে অর্থ গ্রহণ করেন না আমরা তা গ্রহণ করি। তাহলেই তো আমরা এর সম্পর্কে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান প্রদানে সক্ষম হব। অন্য জাতি থেকে আমদানিকৃত, নিছক এ যুক্তিতে কোনো শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করতে আমাদের কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। নাম, পরিভাষা ও ঠিকানার উপর শরিয়তের কোনো হুকুম আরোপিত হয় না; বরং মূল ভাব ও এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের আলোকে শরিয়তের হুকুম দেওয়া হয়।

এছাড়াও অনেক লেখক, বুদ্ধিজীবী ও আল্লাহর পথের আহ্বায়কগণ 'গণতন্ত্র' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন এবং এর ব্যবহারে তারা কোনো সমস্যা অনুভব করেন নি। উস্তাদ আব্বাসুল মাহমুদ আক্কাদ 'ইসলামিক গণতন্ত্র' শীর্ষক একটি গ্রন্থও লিখেছেন। উস্তাদ খালেদ মুহাম্মদ এ ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে আছেন, তিনি গণতন্ত্রই স্বয়ং ইসলাম বলে আখ্যায়িত করেছেন!

এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমার রচনা 'ইসলামিক পুনর্জাগরণ এবং আরব ও মুসলিম দু'বিশ্বের দুঃচিন্তা' (لصحوة الإسلامية وهموم الوطنين العربي والإسلامي) শীর্ষক গ্রন্থে। আগ্রহী পাঠকগণ তা থেকে পড়ে নিতে পারেন।
অধিকাংশ ইসলামপন্থীরা শাসন পদ্ধতির অবকাঠামো, স্বাধীনতার গ্যারান্টি ও জালিম শাসকের জুলুম থেকে পরিত্রাণের রক্ষাকবচ হিসেবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে থাকেন এবং গণতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান, যেখানে গণতন্ত্র শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের পা চাটা তলপিবাহকদের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব না করে জাতির সকল জনশক্তির ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে। যেখানে স্বাধীন নাগরিকদের আবদ্ধ করার জন্য নিত্য নতুন কারাগার খোলা হয়, যেখানে নিরপরাধ জনগণের পিঠের উপর চাবুক উঠানামা করে, সামরিক আদালতের মাধ্যমে মানুষের জান, মাল, স্বাধীনতা ও জীবন সকল কিছুই কেড়ে নেওয়া হয়, জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে চিন্তাশীল স্বাধীন প্রতিটি বিবেককে পাকড়াও করা হয় এবং প্রত্যেক ওই ব্যক্তির টুটি চেপে ধরা হয় যে শাসকের কর্মকাণ্ডে 'না' বলা তো দূরের কথা শুধুমাত্র 'কেন' প্রশ্ন রাখতে পারে, ইত্যাদি যাবতীয় কৌশল (?) অবলম্বন করার মাধ্যমে যেখানে গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরা হয় এবং এর মূল সত্তা ও প্রাণ ধ্বংস করে দেওয়া হয় সেখানে শুধুমাত্র গণতন্ত্রের শ্লোগান নিয়ে ক্ষান্ত থাকা যথেষ্ট হতে পারে না।

সহজ ও সুনিয়ন্ত্রিত উপায় হিসেবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহবায়কদের মধ্যে আমিও অন্যতম, যা সম্মানজনক জীবনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের সহযোগিতা

করবে, যেখানে আমরা মানুষকে আল্লাহর দিকে, ইসলামের দিকে আহ্বান করতে পারব, যেমনিভাবে আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। এমতাবস্থায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না কারাগারের অন্ধকার কোনো প্রকোষ্ঠ, তৈরি হবে না ফাঁসির কোনো মঞ্চ। এমনিভাবে যা আমাদের জাতির জন্য স্বাধীন ও সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করবে এবং শাসক নির্বাচনে তাদের অধিকার, শাসকের কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা এবং শাসকগোষ্ঠী সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হলে কোনো বিপ্লব, গুপ্তহত্যা ইত্যাদি ব্যতীত তাকে পরিবর্তন করার অধিকারের নিশ্চয়তা দিবে প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র।

শুরা তথা পরামর্শসভা শুধুমাত্র দিকনির্দেশক নয়; বরং তা মেনে চলা আবশ্যক

অপর একটি বিষয় যা এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, এখনো পর্যন্ত কতিপয় আলেম-উলামা বলে থাকেন যে, শুরা কেবল দিকনির্দেশক মাত্র, এটি আবশ্যক নয়। শাসক ইচ্ছে করলে পরামর্শ তলব করতে পারেন; কিন্তু তিনি শুরার সদস্য তথা নীতি নির্ধারক ও চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য নন।

অপর এক স্থানে এর উত্তর দিতে গিয়ে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, শাসক যদি পারামর্শ তলব করার পর ইচ্ছে করলে তা উপেক্ষা করে নিজের খেয়াল-খুশিমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাহলে শুরার সার্থকতা এবং প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আর শুরার সদস্যদের কিভাবে নীতি-নির্ধারক বলে নামকরণ করা যাবে যদি তাদের অনুসৃত নীতির সামান্যতমও বাস্তবায়ন না হয়?

ইমাম ইবনে কাছীর ইবনে মারদুয়াই এর সূত্রে হজরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেন যে তাঁকে কুরআনের আয়াতস্থ "তোমরা পরামর্শ গ্রহণ করো, অতঃপর যখন (আ'যম) সিদ্ধান্তে উপনীত হও তখন আল্লাহর উপর ভরসা রাখো" (সুরা ইমরান, ৩: ১৫৯)। এখানে 'আ'যম' শব্দের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেন জ্ঞানবানদের পরামর্শ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন।

এবিষয়ে বিপরীতধর্মী মত রয়েছে; কিন্তু স্বৈরশাসনের ফলশ্রুতিতে মুসলিম উম্মাহর উপর যে দুর্যোগের ঘনঘটা অতিবাহিত হয়েছে এবং যার ধারাবাহিকতা এখানো বিরাজমান, তা শুরা তথা পরামর্শ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলী মেনে চলার আবশ্যকতাকেই জোরালোভাবে সমর্থন করে চলছে।

যতই বিপরীতধর্মী মত থাকুক না কেন, যখন মুসলিম উম্মাহ বা এর কোনো জনগোষ্ঠী শুরার সিদ্ধান্ত মেনে চলার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে তখন যাবতীয়

মতানৈক্য দূর করে তা আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং শুরার সিদ্ধান্ত মেনে চলা তখন শরিয়াহ কর্তৃক ওয়াজিব তথা আবশ্যক হয়ে পড়ে; কারণ মুসলমানরা পরস্পরে যদি কোনো শর্তের বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে তা পালন করা আবশ্যক। তাই শুরার সিদ্ধান্ত মেনে চলার শর্তের ভিত্তিতে যদি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা আমির নির্বাচিত হয়, তাহলে তার জন্য শুরার সিদ্ধান্ত পদদলিত করে অপর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উল্লেখিত শর্ত বা চুক্তি ভঙ্গ করা বৈধ হবে না। কারণ হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী মুসলমানরা পরস্পরে যে শর্তের ভিত্তিতে ঐকমত্যে পৌছে তা মেনে চলা তাদের উপর আবশ্যক এবং সে শর্ত বা চুক্তি ভঙ্গ করা কখনো বৈধ নয়। "আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখনই তোমরা তার সাথে কোনো অঙ্গীকারে আবদ্ধ হও এবং নিজেদের শপথকে মজবুত করার পর আবার তা ভেঙে ফেলরা পর আবার তা ভেঙে ফেলো না যখন তোমরা আল্লাহকে নিজের উপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছো" (সুরা নাহল, ১৬: ৯১)।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ যখন হজরত আলীর রা. কাছে প্রস্তাব রাখলেন যে তারা কিতাব, সুন্নাহ এবং শাইখাইন তথা আবু বকর ও উমরের রা. অনুসৃত নীতির ভিত্তিতে তাঁর হাতে বাইয়াত করবে; তখন তিনি শেষাংশের ব্যাপারে আপত্তি প্রকাশ করলেন অর্থাৎ আবু বকর ও উমরের রা. অনুসৃত নীতি অনুসরণের ব্যাপারে। কারণ যদি তিনি এ শর্তে বাইয়াত গ্রহণ করেন তাহলে তা মেনে চলা তার উপর আবশ্যক হয়ে পড়ে। হজরত আলী রা. এখানে আপত্তি করলেন কারণ তিনিও ছিলেন শরিয়তের একজন ইমাম, যার রয়েছে নিজস্ব ইজতেহাদ ও স্বতন্ত্র চিন্তা-ভাবনা যা আবু বকর ও উমর থেকে ভিন্ন হতে পারে। অপরদিকে স্থান, কাল ও পাত্রের ভিন্নতাও রয়েছে। কিন্তু হজরত উসমান রা. তা গ্রহণ করেছিলেন এবং এর উপর বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে শর্তের ভিত্তিতে উম্মাত থেকে বাইয়াত গ্রহণ করা হবে যথাসাধ্য তা মেনে চলা এবং তা বাস্তবায়নের উপর সচেষ্ট থাকতে হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এ উপসংহারে আসতে পারি যে, ইসলামের শুরা পদ্ধতি গণতন্ত্রের মূল সত্তার অনেকটা কাছাকাছি। অথবা অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রাণসত্তা এবং ইসলামের শুরা তাৎপর্যের বিচার অনেকটা এক ও অভিন্ন।

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামিনের জন্যই নিবেদিত।

ইসলামি রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় বহুদলীয় গণতন্ত্র

প্রশ্ন: বিভিন্ন সভা-সেমিনারে, গোলটেবিল বৈঠকে বা ব্যক্তিগত মজলিসের আড্ডায় কখনো ইসলামপন্থীদের অভ্যন্তরে, আবার কখনো ইসলামপন্থী এবং অন্যান্যদের মাঝে বিভিন্ন ইস্যুতে সময়ে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক এবং আলোচনা-সমালোচনা ইত্যাদি হয়ে থাকে। কতিপয় ইসলামি দলের মাঝে একটি কথা বহুলাংশে প্রচলিত হয়ে পড়েছে যে, ইসলামে একতাবদ্ধ হয়ে থাকা আবশ্যক, এখানে দলাদলি বা মতপার্থক্যে লিপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, আর বহুদলীয় গণতন্ত্র মানে পারস্পরিক মতপার্থক্য, জাতির মধ্যে বিবাদ-বিচ্ছেদ বৈ অন্য কিছু নয়। ইমাম শহীদ হাসানুল বান্না বলেন, ইসলামে দলাদলির কোনো সুযোগ নেই। অনেকেই এ কথাকে পুঁজি করে বহুদলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। এ ক্ষেত্রে তাদের অনেক সন্দেহ-সংশয় এবং অনেক যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে যা তারা এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে পেশ করে থাকেন। এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আপনার মূল্যবান মতামত কামনা করছি যা এখন আরব ও মুসলিম বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে যে সকল ভূখণ্ডে বহুদলীয় রাজনীতির সুযোগ রয়েছে এবং যেখানে গণতন্ত্রের সুদিন চলছে। তারা বলেন ইসলামি শক্তি স্বাধীনতা এবং বহুদলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী, কিন্তু ক্ষমতার বাগডোর যখনি তাদের হাতে চলে আসবে, তখনি তারা এককভাবে গণতন্ত্রের ধারক-বাহক বনে যাবে এবং বাকি সকল কিছুকে স্তব্ধ করে দেবে। তারা শুধু নিজেদেরকেই সত্যপন্থী বলে মনে করবে যেখানে বাতিলের কোনো সম্ভাবনা নেই, আর অপরদিকে তারা ব্যতীত অন্যদেরকে বাতিলপন্থী বলে মনে করবে যেখানে সত্যের লেশমাত্র নেই। তাই এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে যুক্তি-প্রমাণসহ শরিয়তের সমাধান কামনা করছি। আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

জবাব: এ বিষয়ে আমার মতামত হচ্ছে, যা আমি দীর্ঘকাল ধরে উন্মুক্ত আলোচনায়, বিশেষ মজলিসে বলে আসছি ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকতে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই; কারণ কোনো বিষয়ে শরিয়তের নিষেধাজ্ঞার জন্য সুস্পষ্ট ভাষ্য থাকা আবশ্যক, অথচ এ মর্মে কোনো ভাষ্য পাওয়া যায় না।

বরং বর্তমান সময়ে বহুদলীয় রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ এটি জাতির ঘাড়ে জগদ্দল পাথরের মতো অন্যায়ভাবে চেপে বসা স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের অন্যতম একটি উপায়। শাসকগোষ্ঠীর

কর্মকাণ্ডে 'না' কিংবা 'কেন' বলার মতো যদি কোনো শক্তি বা দলের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে জুলুম-অত্যাচার আরো বেগবান হবে। ইতিহাস অধ্যায়ন এবং বাস্তবিক পরিবেশ-পরিস্থিতি অবলোকনকালে এমনটি দেখা যায়।

এ সকল দলের অস্তিত্বের বৈধতার জন্য দু'টি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ :

১. আকিদা বিশ্বাস ও বিধি-বিধান হিসেবে ইসলামকে দ্বীন বলে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এর সাথে বৈরীভাব এবং এর কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা যাবে না, যদিও ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে তার স্বতন্ত্র ইজতেহাদ তথা চিন্তা-ভাবনা থাকতে পারে; কিন্তু তাও সর্বজন স্বীকৃত শরিয়তের বিভিন্ন মূলনীতির আলোকে হতে হবে।

২. ইসলাম বিরোধী কোনো শক্তি বা জাতির এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারবে না এবং তা যে নামেই হোক না কেন।

তাই নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদির দিকে আহ্বান করে এমন দল গঠন করা যাবে না। কিংবা আসমানী ধর্মগুলোর প্রতি বিষেদাগার করে, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের প্রতি এবং এর পবিত্র বিষয়াবলী যেমন আকিদা-বিশ্বাস, শরিয়াহ, কুরআন ও এর নবি সা. ইত্যাদিকে হালকাজ্ঞান করে অথবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এমন দলও গঠন করা যাবে না।

শাসককে নাসিহাত করা ও সংশোধন করে দেওয়ার আবশ্যকতা

ইসলামে মানুষের এ অধিকার রয়েছে; বরং তাদের উপর আবশ্যকও বটে যে তারা শাসককে সুপরামর্শদান করবে, শাসক বক্র পথ ধরলে তাকে সোজা করে দিবে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে তাকে বারণ করবে। সে মুসলমানদের একজন বৈ কিছু নয়। পরামর্শ ও আদেশ-নিষেদের উর্ধ্বে সে নয়, আর জনসাধারণও এমন নিম্ন পর্যায়ের নয় যে তারা তাকে পরামর্শ ও আদেশ-নিষেধ করতে পারবে না।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ এ কাজটি যদি কোনো জাতির জীবন থেকে হারিয়ে যায়, তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের যাবতীয় চাবিকাঠি যেন সে জাতি হারিয়ে ফেলে। তখন পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীর অইমান, লাঞ্ছনা ও অভিশাপ ছাড়া অন্য কিছুই তাদের জন্য বরাদ্দ হবে না। এ ধরনের একটি জাতির কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন, "তারা পরস্পরকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল, তাদের গৃহীত সেই কর্মপদ্ধতি বড়ই জঘন্য ছিল" (সুরা মায়েদা, ৫: ৭৯)।

হাদিস শরিফে এসেছে: "যখন আমার উম্মতকে দেখবে জালেমকে জালেম বলে সম্বোধন করতে ভয় পাচ্ছে তখন বুঝতে হবে যে, তারা জালেমের উপর আরোপিত শাস্তি নিজেরাও বরণ করে নিতে প্রস্তুত হয়ে আছে।[১৪]

অপর এক হাদিসে এসেছে: "মানুষ যখন জালেমকে জুলুম করতে দেখেও তার হাত চেপে ধরতে অর্থাৎ তাকে বারণ করতে এগিয়ে আসে না, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সকলের জন্য শাস্তি বা গজব নেমে আসার সময় নিকটবর্তী হয়ে আসে"।[১৫]

খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হজরত আবু বকর রা. তাঁর প্রথম ভাষণে বলেন "ওহে মানব সকল! আমি যদি ভালো কাজ করি তাহলে আমাকে সহযোগিতা করবে, যদি আমি খারাপ কাজ করি আমাকে সোজা করে দিবে ... যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্যের উপর থাকি ততক্ষণ আমার আনুগত্য করবে, যদি আল্লাহর অবাধ্য হই তাহলে আমার উপর তোমাদের কোনো আনুগত্য নেই"।

একই ধারাবাহিকতায় হজরত উমর রা. বলেন "হে মানব সকল তোমরা যদি আমার মধ্যে কোনো বক্রতা দেখতে পাও তাহলে তা সোজা করে দিবে", তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল আল্লাহর শপথ! আমরা যদি আপনার মধ্যে কোনো বক্রতা দেখতে পাই তাহলে আমাদের তরবারির প্রান্ত দিয়ে তা সোজা করে দিব! হজরত উমর তা শুনে বললেন: "সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি মুসলমানদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও সৃষ্টি করেছেন যে তার তরবারির ধারপ্রান্ত দিয়ে উমরের বক্রতাকে সোজা করে দিতে পারে!"

কিন্তু ইতিহাস অধ্যয়ন, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও মুসলমানদের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণে এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শাসকের বক্রতা সোজা করে দেওয়া সহজ ও হালকা কোনো কাজ নয়। আর মানুষের হাতে এমন তরবারিও থাকে না যা দিয়ে তারা শাসকের বক্রতা সোজা করে দিতে পারে; বরং তরবারি সর্বদা শাসকগোষ্ঠীর হাতেই কুক্ষিগত থাকে!

---

[১৪] আহমদ ইবনে তার মুসনাদ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন, শাইখ একে সহিহ বলেছেন। হাকেমও তা বর্ণনা করেন এবং তিনিও একে সহিহ বলেছেন আর ইমাম যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন : ৪/৯৬।

[১৫] আবু সাউদ তার সূনান গ্রন্থে আবু বকর থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেন, এমনিভাবে আহমদ ও অন্যান্য সুনান প্রণেতারাও প্রণেতারাও এটি বর্ণনা করেন, ইমাম তিরমিজী বলেন, উক্ত হাদিস হাসান ও সহিহ।

রাজনৈতিক শক্তির মাধ্যমে নসিহত ও সংশোধন কাজ সম্পাদন

শাসকগোষ্ঠীকে নসিহত ও সংশোধনের কাজ অবশ্যই তরবারির ধারপ্রান্ত দিয়েও নয়, কিংবা অস্ত্রের ঝনঝনানির মাধ্যমেও নয়; বরং তা ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিতে সম্পাদন করতে হবে।

দীর্ঘ সংগ্রাম ও মরণপণ তিক্ত লড়াইয়ের মাধ্যমে মানবতা অবশেষে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধান এবং শাসকগোষ্ঠীর বক্রতা সংশোধনের লক্ষ্যে রক্তপাত এড়িয়ে বিকল্প একটি অবকাঠামো দাঁড় করাতে এবং দ্বিতীয় একটি উপায় খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে। তা হচ্ছে রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব, শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে যাকে সহজেই হজম করে ফেলা সম্ভব নয়। আর এটাকেই এখন বলা হয়েছে "বহুদলীয় রাজনীতি"।

শাসকগোষ্ঠী ইচ্ছে করলে বাহুবলের মাধ্যমে, কিংবা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় সদস্য সম্বলিত কোনো দলকে ঘায়েল করে সহজেই তাদের উপর জয়ী হতে পারে। কিন্তু সুসংগঠিত বিশাল কোনো দলের উপর জয়ী হওয়া আপাতদৃষ্টিতে তার জন্য অত সহজ বিষয় নয়, যেখানে জগত-সংসারের প্রতিটি স্তরে থাকবে তার সরব পদচারণা, জন-জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে থাকবে তার সুগভীর শিকড় এবং ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়াসহ তার আরো অনেক উপায়-উপকরণ থাকবে যার মাধ্যমে সে সহজেই তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে এবং জনজীবনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

আমরা যদি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিবিধানকে জনজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী সচল একটি আবশ্যক দায়িত্ব হিসেবে দেখতে চাই তাহলে একে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, স্বল্প আয়োজনে এবং সীমিত পরিসরে সীমবদ্ধ রাখলে যথেষ্ট হবে না। এর আকৃতি, ধরন ও কাঠামোতে অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে এমন একটি শক্তি এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে যে চাইলে আদেশ-নিষেধ করতে পারবে, ইচ্ছে করলে ভয় দেখিয়ে ও সাবধান করার মাধ্যমে খারাপ কাজ থেকে কাউকে নিবৃত্ত করতে পারবে এবং কোনো পাপকার্যের দিকে আদেশ করা হলে সাহসের সাথে বলতে পারবে 'কোনো আনুগত্য নেই'। এছাড়াও শাসকগোষ্ঠী জুলুম-অত্যাচারে মেতে উঠলে রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে তার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে এবং এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হবে যাতে কোনো রক্তপাত কিংবা বাহুবল ব্যতীত সহজেই শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতার বাগডোর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

বর্তমান সময়ে শাসক গোষ্ঠীর জুলুমের প্রতিরোধে, তাদের কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনাকল্পে এবং তাদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কিংবা তাদেরকে বাদ

দিয়ে অন্যজনকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য দলগঠন বা বহুমুখী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব আবশ্যক একটি উপায়-উপকরণে পরিণত হয়েছে। সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করা, সরকারকে সুপরামর্শ দানে এগিয়ে আসা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা ইত্যাদি বর্তমান সময়ে একমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষেই সম্ভব। আর যা ব্যতীত কোনো আবশ্যক কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয় না তাও করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে ভুল চিন্তাধারা

হয়তবা আল্লাহর অনেক একনিষ্ঠ বান্দা এমনও আছেন যারা চিন্তা করতে পারেন, যে রাষ্ট্র আল্লাহর শরিয়ত অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করে থাকে এবং প্রতিটি কর্মকাণ্ডে আল্লাহর ফায়সালার দিকেই ধাবিত হয়ে থাকে, এমন একটি রাষ্ট্রে এসবের কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় সীমারেখা মেনে চলাই হচ্ছে এ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য।

যারা এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে তাদের উচিত এ ধরনের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। যদি এ ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহলে তাই হবে কুরআনে অঙ্কিত রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি। "এরা এমন সব লোক যাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে এরা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দিবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে" (সুরা হাজ, ২২: ৪১)। তখনি তাদের উচিত এ রাষ্ট্রের হাতে নিজেদের বাগডোর সমর্পণ করা এবং একে পরিপূর্ণ আনুগত্য, মৈত্রী, বন্ধুত্ব ও সমর্থন দানে এগিয়ে আসা।

এ জাতীয় লোকদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই; 'ইসলামি রাষ্ট্র' অপরাপর জনসমাজে প্রচলিত 'ধর্মীয় পুরোহিত রাষ্ট্র' তুল্য নয়। বরং এটি একটি বেসামরিক ও নাগরিক রাষ্ট্র যা ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধানের আলোকে পরিচালিত। এর প্রধান কোনো 'নিষ্পাপ ইমাম' নয় এবং এর কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দও 'মুকাদ্দাস পবিত্র' তুল্য নয়; বরং তারা মানুষ, সাধারণ মানুষের ন্যায় তারাও যেমনিভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তেমনি ভুলও করতে পারেন, তারা যেমনি ভালো করতে পারেন তেমনিভাবে খারাপও করতে পারেন, তারা যেমনি ইনসাফ করতে পারেন তেমনি তাদের থেকে বাড়াবাড়িও হয়ে যেতে পারে এবং তারা আল্লাহর অনুগতও হতে পারেন, আবার তাঁর অবাধ্যও হতে পারেন। জনসাধারণের উচিত ভালো কাজে এবং আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় তাদের সহযোগিতা করা, বাঁকা পথ ধরলে তাদেরকে সোজা করে দেওয়া এবং যদি তারা অপরাধ কর্মের প্রতি নির্দেশ করে তাহলে তা মেনে নিতে অস্বীকার করা। যেমনটি হজরত বকর রা. তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন; বরং যেমনটি স্বয়ং রসুল সা. বলেছেন "পছন্দ-অপছন্দ, সন্তুষ্টি

সর্বাবস্থায় মুসলিম ব্যক্তিকে তার নেতার আনুগত্য করে যেতে হবে যতক্ষণ না কোনো পাপকার্যের আদেশ দেওয়া হয়, যদি কোনো পাপকর্মের আদেশ দেওয়া হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে কোনো আনুগত্য নেই"।[১৬]

যখন পাপমুক্তি এব ং পবিত্রতার গুণ তাদের থেকে বাদ হয়ে গেল তখন সকলেই মানুষের কাতারে শামিল হয়ে গেল। আর পার্থিব এ জীবনের ধোঁকা থেকে কোনো মানুষই নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে না, তাই জীবনের ধোঁকায় পড়ে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং জুলুম-অত্যাচারে মেতে ওঠে। আর ধর্মের নামে স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরশাসন চালানো হলে তা সবচেয়ে কঠিন রূপ ধারণ করে থাকে। তাই এর লাগাম টেনে ধরার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন যদি না থাকে তাহলে পুরো জাতিই ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং দ্বীন-ধর্মও এর ক্ষতি থেকে বাদ যাবে না।

তাই সুসংগঠিত এমন কোনো শক্তির যদি অস্তিত্ব থাকে যে প্রকাশ্যে দিবালোকে কাজ করবে, ভালোকে সহযোগিতা দিতে এবং খারাপকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে, ইসলামি শরিয়ত সর্বদা এমন শক্তিকে স্বাগতম জানাবে এবং এর সমর্থন দিয়ে যাবে; কারণ তা মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এবং যাবতীয় অকল্যাণকে প্রতিহত করবে যা ইসলামি শরিয়তের মৌলিক উদ্দেশ্য।

কোনো রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রের শুভাকাঙ্খী কর্তৃক এমনটি ধারণা করা সবচেয়ে বড় ভুল হবে যে, তারাই শুধুমাত্র সত্যের উপর আছে এবং সঠিক ও শুদ্ধ সিদ্ধান্ত সর্বদা তাদের কপালেই জোটে, আর তাদের বিরোধীরা সর্বদা ভুলের উপর; বরং বাতিলের উপর।

একটু পেছনে তাকিয়ে আমরা দেখি যে খলিফা হারুনুর রাশীদের মা'মুনের যুগে এবং পরবর্তীতে ওয়াসিক ও মু'তাসিমের যুগে মু'তাযিলা সম্প্রদায় যখন এককভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল, স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে শাসন ক্ষমতার মালিক হয়েছিল তখন তারা সর্বসাধারণের উপর তাদের মত ও চিন্তাধারা চাপিয়ে দিয়ে অন্যান্য সকল মতামতের চিন্তা-ভাবনার মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার প্রয়াসে মেতে উঠেছিল। তাদের থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়কে, বিশেষ করে যে একটি ঘটনা সে সময়ের খুব আলোচিত বিষয় ছিল, যা আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তার জগতে 'খালকুল কুরআন' (কুরআন সৃষ্টি) নামে পরিচিত, এ বিষয়ে তারা কোড়া-তরবারি ও লৌহ-দণ্ড নিয়ে তাদের ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হয়েছিল।

---

[১৬] মুত্তাফাকুন আলাইহি, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, দেখুন: আল লু'লু ওয়াল মারজান: (১২০৫)।

মানবতা তখন কঠিন এক মসিবতের সময় অতিবাহিত করেছিল, যে মসিবতের আগুন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বড় বড় ইমামদেরকেও দগ্ধ করেছিল, যাদের অগ্রভাগে ছিলেন বিশিষ্ট ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রা.।

যারা নিজেদেরকে জ্ঞানবান ও মুক্ত চিন্তার ধারক-বাহক বলে পরিচয় দেয় তাদের এ অপরাধকে ইতিহাস এখনো ঘৃণাভরে স্মরণ করে থাকে, যে অপরাধের সামনে কপাল হেট হয়ে আসে। এটি চিন্তার জগতে ভিন্ন মতাবলম্বীদের কণ্ঠ চেপে ধরার অপরাধ, যা গড়িয়ে নির্যাতন-নিষ্পেষণ, মার-পিট ও জেল-জুলুম পর্যন্ত পৌঁছেও ক্ষান্ত হয়নি, যদিও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বড় বড় ইমাম হউক না কেন!

রাজনীতিতে একাধিক দল ইসলামি ফিক্হর একাধিক মাজহাবতুল্য

আমরা যখন ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একাধিক দলের অস্তিত্বের বৈধতা নিয়ে কথা বলি তখন আমরা এর দ্বারা এটি উদ্দেশ্য গ্রহণ করি না যে, নির্ধারিত কতিপয় ব্যক্তির মাধ্যমেই গঠিত হওয়া একাধিক দল যারা নিরেট ব্যক্তি স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পরস্পরের বিরোধিতায় লিপ্ত। যেমন এটি উমুকের দল, ওটি তার দল এবং অপরটি তৃতীয় আরেক জনের দল ইত্যাদি, যারা নিজের স্বার্থের খাতিরেই কতিপয় মানুষকে এক স্থানে জমায়েত করেছে এবং ব্যক্তি স্বার্থের পরিধির অভ্যন্তরেই তাদেরকে পরিচালনা করে চলেছে।

যেমন- বর্ণ, দেশ, মহাদেশ ও শ্রেণি বিভেদ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন দলসমূহ। এগুলো হচ্ছে পক্ষপাতিত্বের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফসল যা থেকে যোজন যোজন দূরে ইসলামের অবস্থান।

এখানে যে ধরনের বহুমুখী দলের কথা বলা হচ্ছে তা হচ্ছে চিন্তা-ভাবনা, কর্মনীতি ও রাজনৈতিক পলিসি ইত্যাদির ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন দলসমূহ। যেখানে প্রত্যেক দল যুক্তি-প্রমাণ সহকারে তার কর্মনীতি ও চিন্তা-ভাবনা পেশ করবে, অতঃপর যারা এর প্রতি আস্থা পোষণ করবে এবং জাতির সংশোধন, সংস্কার ও কল্যাণের জন্য একই উপযুক্ত মনে করবে তারা তা গ্রহণ করবে অপর দিকে যারা এর বিপরীত কর্মনীতিতে জাতির জন্য কল্যাণ খুঁজে পাবে তারা এটি প্রত্যাখ্যান করে অপর একটি কর্মনীতি গ্রহণ করবে।

রাজনৈতিক ময়দানের একাধিক দল ফিক্হর ময়দানের একাধিক মাজহাবতুল্য।

ফিক্হর মাজহাব হচ্ছে শরিয়তের বিধি-বিধান বুঝার জন্য এবং খুঁটি-নাটি সকল বিষয়ে শরিয়তের সমাধান জানার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কতিপয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আদর্শিক ও চিন্তাশীল একটি প্রতিষ্ঠান। আর মাজহাবের অনুসারীরা মূলত

এর প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। তারা মনে করে এখানকার সমাধানগুলো তুলনামূলকভাবে অপরের তুলনায় বিশুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী এবং অধিক সুপথপ্রাপ্ত। তারা রাজনীতির ময়দানের আদর্শিক দলের ন্যায় যার অনুসারীরা এ ধরনের মূলনীতির উপর এক প্লাটফর্মে মিলিত হয়েছে, এবং এ দল অপরের তুলনায় অধিকতর পছন্দনীয় ও উত্তম, এ ধরনের আস্থা-বিশ্বাসকে সামনে রেখেই তারা এ দলকে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে, যদিও এর দ্বারা অপর দলগুলো বাতিল বা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এমনটি মনে করা হয় না।

এ জাতীয় দল মূলত রাজনীতির মাজহাব, এর রয়েছে নিজস্ব দর্শন, মূলনীতি এবং স্বীয় কর্মপদ্ধতি যা ইসলামের প্রশস্ত ময়দান থেকে চয়নকৃত। দলের সদস্যবৃন্দ ফিক্হি মাজহাবের অনুসারীদের মত, প্রত্যেকেই তার কাছে অধিকতর বিশুদ্ধ এবং অপরটির তুলনায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়টিকে সমর্থন দিয়ে যাবে।

কখনো একদল মানুষ একই প্লাটফর্মে মিলিত হয় যারা মনে করে থাকে যে, শুরার সিদ্ধান্ত মেনে চলা আবশ্যক, খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে, রাষ্ট্রপতির সময়সীমা নির্ধারিত থাকবে, সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় নির্বাচন হতে হবে, মানুষের সন্তুষ্টিতে নির্বাচনের মাধ্যমে শুরার সদস্য নির্বাচন করতে হবে, মহিলাদেরও নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং পার্লামেন্ট সদস্য হওয়ার জন্য প্রার্থী হওয়ার অধিকার রয়েছে, পণ্য-দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ, ঘর-বাড়ি, বাস্তু-ভিটে ভাড়ায় খাটানো, শ্রমিকদের মজুরি নিশ্চিতকরণ এবং ব্যবসায়ী লাভের অঙ্ক নির্ধারণ ইত্যাদিতে সরকারের হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে। চাষাবাদযোগ্য জমি ভাড়ায় নয়; বরং বর্গা চাষের চুক্তিতে ছেড়ে দিতে হবে, মানুষের ধন সম্পদে জাকাত ছাড়াও আরো দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদির নিমিত্তে ট্যাক্স আদায় করে থাকে যা মুসলিম থেকে নেওয়া জাকাততুল্য, তাহলে তাদের জন্য নির্ধারিত জিযিয়া করা মওকুফ করে দেওয়া হবে... পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধি থাকতে হবে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর বিপরীতে অপর এক দল দ্বিতীয় একটি প্লাটফর্মে মিলিত হয় যারা 'রক্ষণশীল' নামে পরিচিত এবং যারা উপরোল্লিখিত দলকে 'প্রগতিবাদ' বা সংস্কারপন্থী বলে নামকরণ করে থাকে। এ দলের সদস্যবৃন্দ যে সকল মূলনীতির ভিত্তিতে মিলিত হয়ে থাকে তা হচ্ছে শুরার সিদ্ধান্ত আবশ্যক নয়; বরং তা দিকনির্দেশক মাত্র, রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের মাধ্যমে নয়; বরং নীতি নির্ধারকরাই তা মনোনয়ন করবে এবং তার সময়সীমা আমরণ বলবৎ থাকবে, অপরদিকে রাষ্ট্রপ্রধানই নীতিনির্ধারক ও কার্যনির্বাহী সদস্য নির্ধারণ করবে! নির্বাচন শরিয়তসম্মত কোনো পদ্ধতি নয়, মহিলাদের ভোট দেওয়ার কিংবা দেওয়ার কিংবা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অর্থনীতি তার নিজস্ব স্বাধীন গতিতে চলবে, ব্যক্তিমালিকানা নিঃশর্ত

থাকবে, পররাষ্ট্রনীতির মূল হচ্ছে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ, যুদ্ধ ঘোষণা করা কিংবা যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দেওয়ার অধিকার একমাত্র খলিফা বা সরকার প্রধানের রয়েছে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মনীতি যা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক দিক থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি দিককে ফিরে আছে।

এছাড়াও কখনো তৃতীয় অপর একটি দলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে যারা প্রথম দলের সাথেও নয়, দ্বিতীয় দলের সাথেও নয়; বরং এরা কতিপয় বিষয়ে প্রথম দলের সাথে আবার কিছু বিষয়ে দ্বিতীয় দলের সাথে একাত্মতা পোষণ করে থাকে।

এ সকল দলের মধ্যে কোনো একটি দল যদি বিজয় লাভ করে এবং ক্ষমতার বাগডোর যদি তাদের হাতে আসে তাহলে কি এরা অপর দলগুলোর অস্তিত্ব মুছে দিবে এবং শুধুমাত্র ক্ষমতার মালিক হওয়ার কারণে কি তারা অপর দলগুলোর চিন্তাধারা ও মূলনীতিগুলোকে মাটি চাপা দিয়ে দিবে? শুধুমাত্র ক্ষমতা অর্জনই কি এ সকল চিন্তাধারার অস্তিত্বের রক্ষাকবচ? আবার ক্ষমতা হারানোই কি এগুলোর ধ্বংসের কারণ?

সঠিক সিদ্ধান্ত ও চিন্তা-ভাবনা বলে না; বরং প্রতিটি আদর্শ ও চিন্তাধারার বেঁচে থাকার এবং নিজেকে প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে যতক্ষণ না তাদের সাথে যৌক্তিক কারণ ও উল্লেখযোগ্য ভিত্তি থাকবে এবং তাদের সহযোগী থাকবে যারা তাদেরকে সমর্থন দিয়ে যাবে।

বহুদল হচ্ছে রাজনৈতিক ময়দানের একাধিক মাজহাবতুল্য এবং মাজহাব হচ্ছে ফিক্‌হ'র ময়দানের বহুদলতুল্য

রাজনৈতিক ময়দানে আমরা ওই সকল বিষয়াবলীর অনুপস্থিতি কামনা করছি যেগুলোর অনুপস্থিতি আমরা ফিক্‌হ'র ময়দানেও কামনা করে থাকি অন্ধ অনুসরণ, যুক্তিহীন পক্ষপাতিত্ব এবং নেতৃস্থানীয় কোনো কোনো ব্যক্তিত্বকে নবিদের ন্যায় পবিত্রজ্ঞান মনে করা, আর এটাই হচ্ছে যাবতীয় অনিষ্টতা ও ফিতনা-ফাসাদের মূল কারণ।

তাই এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও আলাপ-আলোচনায় আমি বলে থাকি: বহুদল হচ্ছে রাজনৈতিক ময়দানের একাধিক মাজহাবতুল্য, যেমনিভাবে মাজহাব হচ্ছে ফিক্‌হ'র ময়দানের বহুদলতুল্য!

সংখ্যাধিক্যতা ও মতানৈক্য

এখানে সবাই যে সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে থাকে তা হচ্ছে যে 'সংখ্যাধিক্যতা' অথবা 'বহুদলীয়' মূলনীতি একতা বা ঐক্যবদ্ধতার বিপরীত যা

ইসলামে আবশ্যক করা হয়েছে এবং এক ঈমানের সমতুল্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে যেমনিভাবে মতানৈক্যে লিপ্ত হওয়া বা দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পথে চলাকে কুফরি এবং জাহেলিয়াতের পথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন "তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না" (সুরা আলে ইমরান, ৩: ১০৩)। অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে "তোমরা তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হিদায়াত পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, যারা এ নীতি অবলম্বন করেছে তারা সেদিন কঠিন শাস্তি পাবে" (সুরা আলে ইমরান, ৩: ১০৫)।

হাদিস শরিফে এসেছে "তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়ো না, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠী মতবিরোধে লিপ্ত হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে"।[১৭]

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হচ্ছে সংখ্যাধিক্যতা বা একাধিক দল সর্বদা নিশ্চিত মতবিরোধ বা দ্বন্দ্ব-সংগ্রামকে আহবান করে না। যেমনিভাবে কোনো কোনো মতবিরোধ বা মতানৈক্য নিন্দিত নয়। যেমন মতের অনৈক্য যা ইজতিহাদ তথা চিন্তা-ভাবনার ভিন্নতার কারণে হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় সাহাবায়ে কেরামগণ অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের একতার মধ্যে সামান্যতমও ফাটল ধরেনি। শুধু একটি নয়; বরং স্বয়ং নবির সা. উপস্থিতিতে কোনো কোনো বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছেন, যেমন বনী কুরাইজা যাওয়ার পথে আসরের নামাজ সংক্রান্ত ঘটনা এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য। অপর দিকে রসুল সা. মতবিরোধে লিপ্ত কোনো দলকেই কোনো প্রকার নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেননি।

কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম এ ধরনের মতবিরোধকে রহমত স্বরূপ বিবেচনা করেছেন, যা শরিয়তের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে উম্মতের জন্য প্রশস্ততা ও সহজ-সরলতাকে নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলা হয়ে থাকে "আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমতস্বরূপ", আর এর ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে "ইমামদের মতবিরোধেই রয়েছে উম্মতের জন্য রহমত" শীর্ষক গ্রন্থ।

খলিফাতুর রাশেদ হজরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরামের মতবিরোধ বন্ধ হয়ে যাক এমনটি তিনি কখনো কামনা করতেন না; কারণ তাদের মতবিরোধ পরবর্তী ইমামদের ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা, সহজ-সরলতা ও গতিশীলতা এনে দিয়েছে। কোনো বিষয়ে একাধিক মত থাকার

---

[১৭] মুত্তাফাকুন আলাইহি।

কারণে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে যখন যা প্রযোজ্য সে আলোকেই পরবর্তী ইমামগণ ইজতিহাদ করার সুযোগ পেয়েছেন।

মতবিরোধের রহমত বলতে অনেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাজ-কর্ম ও পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষের মেজাজের ভিন্নতাকেই নির্দেশ করেছেন; কারণ এর মাধ্যমে মানব সমাজের বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

কুরআনে মানুষের বর্ণ ও ভাষার ভিন্নতাকে সৃষ্টিকুলের মধ্যে কুদরতের এক মহানিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা একমাত্র জ্ঞানবানদের পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব। ইরশাদ হয়েছে "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য। অবশ্যই তার মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য" (সূরা রূম, ৩০: ২২)।

সুতরাং সকল প্রকারের মতবিরোধ খারাপ বা নিন্দনীয় নয়; বরং এখানে দু'ধরনের মতবিরোধ রয়েছে। বৈচিত্র্যময়ী মতবিরোধ (যা একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক নয়) এবং বিপরীতধর্ম মতবিরোধ (যা পরস্পরে সাংঘর্ষিক), এরমধ্যে প্রথমটি নন্দিত এবং অপরটি নিন্দিত।[১৮]

ইসলামিক দলের সংখ্যাধিক্যতা

বিভিন্ন বই-পুস্তক ও আলোচনায় আমি বারংবার এটি বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, যেহেতু চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ভিন্নতা এবং পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাসের ঘাটতি থাকার কারণে ইসলামিক দলগুলোর মধ্যে একতা অনেকটা অসম্ভব, তাই কর্মক্ষেত্রে একাধিক ইসলামিক দলের অস্তিত্ব মেনে নিতে কোনো অসুবিধা নেই।

তবে এ সংখ্যাধিক্যতা হবে বৈচিত্র্যময়ী ও বিভিন্ন প্রকারের, অর্থাৎ এটি পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক ও দ্বন্দ্বমুখর হবে না। মৌলিক ইস্যুগুলোতে যেখানে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা, ইসলামি শরিয়াহ এবং মুসলিম উম্মাহ ইত্যাদি অস্তিত্বের বিষয় থাকবে এবং এগুলোর বাঁচা-মরার প্রশ্ন থাকবে সেখানে প্রত্যেকটি ইসলামিক দলকেই একই সারিতে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমবেতভাবে কাজ করে যেতে হবে।

সর্বোপরি, পরস্পরের প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং অপরের সমস্যা ও ওজর-আপত্তি কবুল করে নেওয়া ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর অন্যতম প্রতিটি ইসলামিক

---

[১৮] দেখুন : আমাদের রচনা : "নন্দিত মতবিরোধ এবং নিন্দিত মতানৈক্যের মাঝে ইসলামিক পুনর্জাগরণ", দারুল ওয়াফা থেকে মুদ্রিত।

দলের মধ্যে থাকা একান্তই জরুরি। পারস্পরিক কোনো প্রকারের গালি-গালাজ কিংবা পরস্পরকে পথভ্রষ্ট ও কাফির ইত্যাদি কিছুই নয়; বরং হিকমাত, সৎ উপদেশ এবং উত্তম বিষয় নিয়ে মতবিরোধ ইত্যাদি মূলনীতিকে আঁকড়ে ধরে, শুভাকাঙ্ক্ষী কণ্ঠে একে অপরকে ন্যায়ের, সবরের ও ভালো কাজের আদেশ-নিষেধ ও পরামর্শ দিয়ে যেতে হবে।

এ জাতীয় সংখ্যাধিক্যতা বা মতবিরোধ কখনো পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা এবং শত্রুতার সূচনা করে না এবং এর ফলশ্রুতিতে উম্মাত একাধিক দলের বিভক্ত হয়ে একে অপরের রক্তপানে লিপ্ত হয়ে পড়ে না; বরং আকিদা-বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ছত্রছায়ায় এ ধরনের সংখ্যাধিক্যতা ও মতবিরোধ হয়ে থাকে, যেখানে কোনো ভয় নেই, নেই কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আশঙ্কা; বরং –এটা হচ্ছে এক ধরনের স্বাভাবিক বাস্তবতা।

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে আমরা এ কথা বলছি এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেও তাই বলব। এটি এমন একটি রাষ্ট্র যা মতবিরোধের জগতকে সংকীর্ণ করে দেয় না এবং অপরাপর সকল চিন্তাধারার কবরস্থ করার ফায়সালা দেয় না; কারণ দ্বিতীয় একটি শক্তিশালী চিন্তাধারার জন্ম নেওয়ার কারণে স্বাভাবিক মৃত্যু ব্যতীত কোনো চিন্তাধারাকে জোরপূর্বক ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে স্তব্দ করে দেওয়া যায় না।

সংখ্যাধিক্যতা আমদানিকৃত মূলনীতি

এখানে অপর যে একটি সন্দেহ ঘুরপাক খায়, তা হচ্ছে বহুদলীয় রাজনীতি পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে আমদানিকৃত একটি মূলনীতি। এটি কোনো ইসলামিক মূলনীতি নয়, কিংবা নয় ইসলামিক মূলনীতি থেকে উৎসরিত কোন নীতি। অথচ আমাদেরকে অপর জাতির অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যাতে আমরা তা করতে গিয়ে নিজেদের পরিচয় ও ব্যক্তিসত্তা ভুলতে না বসি। "যে ব্যক্তি অপর কোনো জাতির অনুসরণ করবে সে তাদের দলভুক্ত হবে"।

তাই আমাদের রাজনীতি, আমাদের চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদিতে আমাদেরকে অপর জাতি থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে। একটু একটু অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা যাতে নিজেদেরকে হারিয়ে না ফেলি, এ বিষয়ে আমাদেরকে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে।

এ সন্দেহের অপনোদনে আমরা বলব আমাদেরকে যা থেকে সাবধান করা হয়েছে এবং যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা হচ্ছে অপরের অন্ধ অনুসরণ, যাতে আমরা অপরের তলপিবাহক ও আজ্ঞাবাহ পরিণত না হয় পড়ি, যে শুধু অনুসরণ করতেই জানে অথচ তাকে কখনো অনুসরণ করা হয় না এবং সকল কিছুতে যে অপরের পেছনে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে "এমনকি তারা যদি গুই সাপের গুহায় প্রবেশ করে

থাকে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে"। যেমনিভাবে এটি হাদিস শরিফে চিত্রায়িত হয়েছে।

মূলত অমুসলিমদের অনুসরণের ব্যাপারে নিষিদ্ধ হচ্ছে যা একান্ত তাদের ধর্মীয় নিদর্শন, যার মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় পরিচয় ফুটে ওঠে, এ জাতীয় বিষয়াবলীতে তাদের অনুসরণ থেকে সাবধান করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে তাদের দলভুক্ত হয়ে যাওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। যেমন খ্রিস্টানদের ক্রুশ ঝুলানো, অগ্নি উপাসকদের পৈতা বা ব্যান্ড বাঁধা ইত্যাদি।

কিন্তু এছাড়া অন্যান্য বিষয়াবলী যেগুলো পরিবর্তনশীল জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যেগুলো ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ নয় এ সকল ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণে কোনো অসুবিধা নেই এবং এ জাতীয় কাজগুলো তারা করলেও মুসলমানরা তা করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। হিকমাত তথা প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা ও কাজ মুমিনের হারানো ধন, যেখানেই তা পাবে সেখান থেকেই সে তা কুড়িয়ে নিবে।

রসুল সা. মদিনার চর্তুপাশ্বে পরিখা খনন করেছিলেন, অথচ আরবরা এ কৌশলের সাথে পরিচিত ছিল না, এটি ছিল মূলত পারসিকদের কৌশল। বলা হয়ে থাকে হজরত সালমান রা. এ বিষয়ে রসুলের সা. দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

যখন রসুলকে সা. বলা হলো: রাজা-বাদশাহগণ সিলমোহর ব্যতীত কোনো চিঠি গ্রহণ করেন না তখন তিনি সা. সিল ব্যবহার করতে শুরু করলেন, যা দিয়ে তিনি বিভিন্ন চিঠি-পত্র সিলমোহর করতেন।

হজরত উমর রা. দেওয়ানী প্রথা ও খারাজের ব্যবস্থাপনা তাদের থেকে গ্রহণ করেন।

হজরত মুয়াবিয়া রা. ডাকব্যবস্থা তাদের থেকে গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে আরো অনেক ব্যবস্থাপনা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর জীবনাচরণ থেকে গ্রহণ করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় বহুদলীয় রাজনীতি যদি পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এতে সমস্যা বা ত্রুটির কিছু থাকতে পারে না। তবে এখানে দু'টি শর্ত রয়েছে :

প্রথমত: এতে আমাদের সত্যিকার কল্যাণ থাকতে হবে এবং তা অর্জন করতে গিয়ে যদি কিছু ক্ষতিও হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে অকল্যাণের তুলনায় কল্যাণের পাল্লা অবশ্যই ভারী হতে হবে; কারণ নিরেট বা সম্ভাব্য ক্ষতিকে এড়িয়ে অনুরূপ নিরেট বা সম্ভাব্য কল্যাণ অর্জনের মধ্যেই শরিয়তের বিধি-বিধানের মূল উদ্দেশ্য নিহিত

রয়েছে। মদ ও জুয়া সংক্রান্ত আল্লাহর বাণী "হে নবি (সা.) আপনি বলে দিন ওই দুটির মধ্যে বিরাট ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে যদিও লোকদের জন্য তাতে কিছুটা উপকারিতাও আছে, কিন্তু তাদের উপকারিতার চেয়ে গোনাহ অনেক বেশি" (সুরা বাকারা, ২: ২১৯)। এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মৌলিক দলিল বা প্রমাণ।

দ্বিতীয়ত: আমরা যা গ্রহণ করব তাতে আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, চারিত্রিক মাপকাঠি, শরিয়তের বিধি-বিধান ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং যোজন-বিয়োজন করে নিতে হবে।

অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর কোনো বিধান বা কোনো ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির পুরোটাই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে, এখানে এমনটি ভাবার কোনো সুযোগ নেই এবং তা করতে আমরা বাধ্যও নই। যেমন সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাচাই না করে অন্ধভাবে কোনো দলের পক্ষ অবলম্বন করা এবং জালিম কিংবা মজলুম সর্বাবস্থায় তাতে সহযোগিতা দিয়ে যাওয়া, যা ছিল জাহেলি যুগের প্রচলিত রীতি এবং জাহেলি যুগে আরবরা এ উক্তির বাহ্যিক ও স্বাভাবিক অর্থই গ্রহণ করত। কিন্তু রসুল সা. তাঁর অর্থের মধ্যে পরিবর্তন করেন এবং এর অপর একটি ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদেরকে তা গ্রহণ করতে বললেন। তা হচ্ছে মজলুমের সহযোগিতার বিষয়টিতো সুস্পষ্ট, কিন্তু জালিমকে সহযোগিতার অর্থ হচ্ছে, তা জুলুমের হাতকে থামিয়ে দেওয়া এবং তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করা, আর এভাবেই শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং তার কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তাকে সহযোগিতা করা হয়।

আনুগত্য কার জন্য

যে সকল সন্দেহাবলী এখানে ঘুরপাক খায় তার মধ্যে অপর একটি হচ্ছে যা বলা হয়ে থাকে, ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বহুদলের অস্তিত্ব ব্যক্তির আনুগত্যকে দ্বিধা-বিভক্ত করে ফেলে। একটি হচ্ছে তার পছন্দনীয় দলের প্রতি এবং অপরটি হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি যার আনুগত্য করতে এবং যাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে সে শপথবদ্ধ।

উপর্যুক্ত কথা তখনি সঠিক হবে যখন কোনো ব্যক্তি প্রতিটি কাজ-কর্মেই সরকার বা রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থান নিয়ে থাকে এবং প্রতিটি বিষয়েই নিজের পছন্দনীয় দলের সমর্থন দিয়ে যায়। আমরা এ ধরনের কথার প্রবক্তা নই।

একজন মুসলিমের আনুগত্য হবে মূলত আল্লাহ ও তাঁর রসুল সা. এবং মুমিনদের দলের প্রতি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "আসলে তোমাদের বন্ধু হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং সেই ইমানদাররা যারা নামাজ কায়েম করে,

জাকাত দেয় এবং আল্লাহর সামনে বিনত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে, তাঁর রসুলকে সা. ও মুমিনদেরকে নিজের বন্ধু রূপে গ্রহণ করে তার জেনে রাখা দরকার, আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে (সুরা মায়েদা, ৫ঃ ৫৫-৫৬)।

কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো গোত্র, দল, মহাদেশ, সমিতি, সংস্থা এবং ইউনিয়ন ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত থাকা দেশ ও রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পৃক্ততা এবং এর প্রতি তার আনুগত্যের সাথে সাংঘর্ষিক ও দ্বন্দ্বমুখর নয়।

কারণ এ সকল সম্পৃক্ততা ও আনুগত্য মূলত মৌলিক সূত্রে গাঁথা, আর তা হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর রসুল ও মুমিনদের প্রতি আনুগত্য। কিন্তু যে বিষয়টি এখানে জোরালোভাবে নিষেধ করা হয়েছে তা হচ্ছে মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা। ইরশাদ হচ্ছে "আর যেসব মুনাফিক ইমানদারদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে, এ 'সুসংবাদটি' তাদেরকে জানিয়ে দাও। এরা কি মর্যাদা লাভের জন্য তাদের কাছে যায়? অথচ সমস্ত মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত" (সুরা নিসা, ৪ঃ ১৩৮-১৩৯)। "হে ইমানদারগণ! তোমরা আমার দুশমন এবং তোমাদের দুশমনকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না" (সুরা মুমতাহিনা, ৬০ঃ ১)।

কোনো দলের মূলনীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি যদি এমন হয়ে থাকে যে, কোনো ব্যক্তি প্রতিটি কাজে তার দলের সমর্থন দিয়ে যাবে যদিও তা নিশ্চিতভাবে মিথ্যা হয় এবং এর বিপরীতে প্রতিটি কাজে সরকার ও রাষ্ট্রের বিরোধীতা করে যাবে যদিও তা নিশ্চিতভাবে সত্য হয়, এমনটি আমরা সমর্থন করি না। আমাদের কাছে এরূপ দলের স্বীকৃতি নেই এবং আমরা কাউকে এ জাতীয় আহ্বানও করি না। কোনো দলের গঠনতন্ত্র এরূপ হলে তা অবশ্যই পরিবর্তন করে এমন গঠনতন্ত্র তৈরি করতে হবে যা ইসলামি মূল্যবোধ, ব্যবস্থাপনা এবং বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

হজরত আলী রা. কর্তৃক খারেজি সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের স্বীকৃতি

আমার যদি একটু পেছনে ফিরে আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি, বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মনীতির দিকে আলোকপাত করি, যাদেরকে অনুসরণের ব্যাপারে এবং যাদের অনুসৃত কর্মনীতিকে আঁকড়ে ধরতে আমরা আর্দিষ্ট হয়েছি, তাহলে দেখব হজরত আলী রা. এমন একটি দলের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছিলেন যারা তার রাজনীতি, পলিসি ও কর্মপদ্ধতির প্রবল বিরোধিতা করেছিল, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে কুফরির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল অথচ তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম সারির সন্তান। তাত্ত্বিক ও চিন্তাগতভাবে এ অবস্থান

নিয়ে তারা থেমে থাকে নি; তার বিরুদ্ধে তাদের তরবারি কোষমুক্ত হয়েছিল, তারা হজরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দিয়েছিল এবং তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের রক্ত হালাল করে নিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তাদের দাবি ছিল তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে ফায়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, অথচ কুরআনের বাণী অনুযায়ী আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ফায়সালা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না : "হুকুম দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা" (সুরা ইউসুফ, ১২: ৪০)।

হজরত আলী রা. তাদের এ বক্তব্য শোনার পর যে বাক্য দিয়ে তার উত্তর দিয়েছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় এখনো স্মরণীয় হয়ে আছে, তিনি বলেছিলেন, বাস্তব ও সত্য কথা, কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করা হয়েছে!

তা সত্ত্বেও তিনি তাদের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেননি। তাদেরকে ধাওয়া করতে এবং বিতাড়িত করতে, যাতে তাদের কোনো চিহ্নও অবশিষ্ট না থাকে, এমনটি নির্দেশ দেননি। বরং তিনি সুস্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন আমাদের কাছে তাদের তিনটি অধিকার পাওনা রয়েছে : আমরা তাদেরকে আল্লাহর ঘর তথা মসজিদ যেতে বাধা দিতে পারবো না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করতে পারবো না এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবো না।

এরাই হচ্ছে খারেজি সম্প্রদায়, যারা সশস্ত্রভাবে বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এটি এমন শক্তি যার সাহসিকতা শেষ পর্যন্ত তার ধ্বংস ও পতনের পথ সুগম করেছিল।

হাসানুল বান্না এবং একাধিক দলের অস্তিত্ব

এ বিষয়টি আমারও জানা আছে যে শহীদ হাসানুল বান্না দলাদলি এবং ইসলামে একাধিক দলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলেন।

এটি ছিল তার নিজস্ব ইজতেহাদ তথা চিন্তা-ভাবনা, সে সময় তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে, দুশমনের মোকাবিলায় উম্মাত শতধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, এমন কতিপয় দলের সৃষ্টি হয়েছিল যেগুলো কোনো বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং সুনির্ধারিত কোনো কর্মপদ্ধতি নিয়ে একত্রিত হয়নি; বরং ব্যক্তি বিশেষের পেছনে সবাই একত্রিত হয়েছিল। বিভিন্ন দলের জনশক্তি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় বলেন, উপনিবেশই এদের পরস্পরের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে এবং একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে।

আমাদের ইজতেহাদ ইমামের ইজতেহাদ থেকে ভিন্ন হতেই পারে, এতে অসুবিধার কোনো কারণ নেই। ইমাম তো তাঁর পরবর্তী লোকদের ইজতিহাদের ব্যাপারে বিধি-

নিষেধ জারি করেননি; বরং তিনি যেরূপ ইজতেহাদ করেছেন তারাও ইজতেহাদ করতে পারে, বিশেষ করে যেখানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, চিন্তাধারার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সম্ভবত তিনি আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকলে আমরা এখন যা চিন্তা-ভাবনা করছি তার সাথে তিনিও একাত্মতা পোষণ করতেন। শরিয়তের বিধি-বিধান স্থান, কাল ও পাত্রের ভিন্নতার আলোকে ভিন্ন হয়ে থাকে, বিশেষ করে তা যদি হয় রাজনৈতিক বিষয়াদিতে যেখানে পরিবর্তনের মাত্রা সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

শহীদ হাসানুল বান্নাকে যারা চিনতেন তারা সবাই জানেন যে, তিনি চিন্তাধারার ক্ষেত্রে স্থবির ছিলেন না; বরং পরিবেশ-পরিস্থিতি ও উপযুক্ত দলিল-প্রমাণের আলোকে তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে হালনাগাদ (আপডেট) করে দিতেন।

সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারীরা ইসলামি রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করে থাকে যে, এটি এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে বিরোধীদের কোনো কণ্ঠ ধ্বনিত হবে না, বিরোধী কোনো মতামত বা চিন্তাধারা জীবনের আলো দেখতে পাবে না এবং 'না' বলতো দূরের কথা, 'কেন' বলে কোনো প্রশ্ন রাখতে পারে এরূপ কোনো দলের অস্তিত্ব এ রাষ্ট্রের বরদাশত করা হবে না!

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রের ছায়ায় বিভিন্ন রকমের শক্তি এবং নানাবিধ দলের অস্তিত্ব সরবে বজায় থাকবে। সব কয়টি দলই ধর্ম হিসেবে ইসলামের ব্যাপারে ইতিবাচক এবং এর বিধি-বিধানের অনুগত থাকবে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি, কর্মসূচি এবং প্ল্যান-প্রোগ্রাম ইত্যাদিতে সবাই ভিন্ন হতে পারে। কোনো দল যদি কোনো উপায়ে ক্ষমতার নাগাল পেয়ে থাকে তাহলে সে কি বাকি দলগুলোকে বেঁচে থাকার এবং তাদের কাজ-কর্ম চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ না দিয়ে, তাদেরকে জীবনের মঞ্চ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিতে সচেষ্ট হবে?

সঠিক চিন্তা এবং সু-বুদ্ধির কথা হচ্ছে এ সকল দলগুলো ময়দানে অবশ্যই সরব থাকবে, মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহ, তাঁর রসুল, মুসলিম জাতির ইমাম এবং তাদের সর্বসাধারণ ইত্যাদির শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে কাজ করবে।

রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে বহুদলের অস্তিত্ব

ইসলামের বিধি-বিধান পালনে সিদ্ধহস্ত একাধিক রাজনৈতিক শক্তি এবং বহুদলের অস্তিত্ব যদি ইসলামি রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় সঠিক ও সম্ভবপর হয় তাহলে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে তা অবশ্যই সঠিক ও সম্ভবপর হবে। সুতরাং ময়দানে একাধিক ইসলামিক দলের বর্তমান থাকাতে সমস্যার কিছু নেই যেখানে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে

ইসলামি সমাজ ও ইসলামি রাষ্ট্র গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে এবং সম্ভাব্য ও শরিয়ত সম্মত সকল উপায়ে দ্বীনের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাবে।

'ইসলামিক কাজে দল গঠন করা হারাম' শীর্ষক দুঃসাহসিক ফতোয়া

যে বিষয়টি এখানে লক্ষ্যণীয় এবং যার ব্যাপারে নীরব থাকা আদৌ সঠিক হবে না তা হচ্ছে ইসলামের পরিচয় বহনকারী এবং ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততার দাবিদার কতিপয় ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী সর্বদা ইসলাম সম্পর্কিত কিছু অযৌক্তিক, অমূলক ও মিথ্যা চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গি জনসম্মুখে প্রচার করে থাকে।

এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এ জাতীয় লোকদের থেকে যে ফায়সালা কিংবা ফতোয়া প্রচার হয়ে আসছে যে, কোনো দল গঠন করা কিংবা কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম এবং তা দ্বীনের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিষয় যে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অনুমতি বা বৈধতা দেওয়া হয়নি, তা যে দলই হোক না কেন এবং তা দল, সমিতি, সংস্থা ইত্যাদি যে পরিচয় বহন করুক না কেন।

আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে এটি আশ্চার্যজনক দুঃসাহসিকতা, শরিয়তের উপর যুক্তি-প্রমাণহীন আক্রমণ এবং আল্লাহ যা বৈধ করেছেন কোনো দলিল-প্রমাণ ব্যতিরেকে তা অবৈধকরণের পদক্ষেপ। মানুষের অভ্যাস, আচার-আচরণ এবং যাবতীয় লেনদেনের বিষয়াবলীতে মৌলিক বিধান হচ্ছে বৈধতা যতক্ষণ না অবৈধ প্রমাণিত হওয়ার সুস্পষ্ট কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায়। আর দল গঠন করে বা সংঘবদ্ধভাবে ইসলামের কাজ চালিয়ে যাওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তা অবৈধ হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

বরং শরিয়তের মৌলিক দিকনির্দেশনার দাবি হচ্ছে এরূপ দল গঠন বা সংঘবদ্ধ তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "ন্যায় ও তাকওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরে সহযোগিতা করো" (সুরা মায়েদা, ৫: ২), অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরো এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (সুরা ইমরান, ৩: ১০৩)।

রসুল সা. বলেন "মুমিন মুমিনের উদাহরণ প্রাচীর স্বরূপ, একে অপরের ভিতকে মজবুত করবে[১৯] "সংঘবদ্ধ জীবনেই রয়েছে আল্লাহর রহমত ও সহযোগিতা, যে ব্যক্তি দলচ্যুত জীবনযাপন করবে তার ধ্বংস অনিবার্য"।[২০]

---

[১৯] মুত্তাফাকুন আলাইহি, আবু মুসা থেকে বর্ণিত, তিরমিজি ও নাসায়িও এ হাদিস বর্ণনা করেন, দেখুন সহিহ জামে' সগীর (৬৬৫৪)।

ইসলামি আইনের মৌলিক একটি ধারা হচ্ছে "যা ব্যতীত কোনো আবশ্যক কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায় না তাও আবশ্যক হয়ে পড়ে"। এ বিষয়ে দ্বিমত করার কোনো অবকাশ নেই যে, বর্তমান সময়ে ইসলামিক মিশনের কাজ চালিয়ে যাওয়া, মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের হেফাজত করা এবং সর্বোপরি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ আঞ্জাম দেওয়া এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা সম্ভব নয়, বরং এর জন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধ আয়োজন, যেখানে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলো একই কাতারে মিলিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় মশগুল থাকবে।

ইসলাম বিরোধী শিবিরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এ সংঘবদ্ধ আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আরো বেশি অনুধাবন করা সম্ভব হবে। বর্তমান সময়ে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো আমাদের আয়োজনকে নস্যাৎ করে দেওয়ার লক্ষ্যে সম্মিলিত চক্রান্তে মেতে উঠেছে। তারা এখন বিক্ষিপ্তভাবে নয়, বরং শক্তিশালী বিভিন্ন ব্লকে এবং বড় বড় বিভিন্ন সংস্থায় পরিণত হয়ে আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিরোধী কাজ করে যাচ্ছে। পার্থিব ও মানব সম্পদের এক বিশাল অংশ বর্তমানে তাদেরই করায়ত্তে রয়েছে, যা দিয়ে অতি সহজেই তারাই তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে কিভাবে আমরা সফলতা আশা করতে পারি? বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি দাবি করছে আমরা যেন সম্মিলিতভাবে কাতারবন্দী হয়ে সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো আমাদের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাই। "নিশ্চয় আল্লাহ সেই সব লোকদের ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সীসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত দেওয়াল" (সূরা আস সফ, ৬১: ৪)।

ইসলামের কাজে, মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধতা আনয়নে, জবর দখলকৃত মুসলিম ভূখণ্ড উদ্ধারকল্পে এবং সর্বোপরি কালেমার পতাকা উড্ডীন রাখতে সংঘবদ্ধ তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। এটি দ্বীন কর্তৃক আবশ্যকীয় এবং বাস্তবতার মৌলিক প্রয়োজন ও দাবিও বটে! আর সংঘবদ্ধ কাজ অর্থাৎ বিভিন্ন দল-উপদল, সংগঠন, সমিতি-সংস্থা ইত্যাদির অস্তিত্ব লাভ, যারা উল্লেখিত আবশ্যকীয় কাজগুলো আঞ্জাম দিয়ে যাবে।

---

[২০] তিরমিজি, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত।

মুসলিম দল নয়, বরং মুসলমানদের কতিপয় দল

উল্লেখিত চিন্তাধারার বিপরীতে অপর একটি চিন্তা লালিত হয়ে থাকে যেখানে মনে করা হয় সংঘবদ্ধ কাজকর্ম আবশ্যক, কিন্তু এ ধরনের কাজ একটি দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, যারা মনে করে তারাই একমাত্র নিরেট সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে এবং তারা ব্যতীত অপর দলগুলো বাতিল ও মিথ্যা নির্ভর। "কাজেই সত্যের পরে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি বাকি আছে?" (সূরা ইউনুস, ১০: ৩২)।

অন্য ভাষয় উল্লেখিত দল নিজেদের মনে করে থাকে যে তারা শুধু মাত্র 'মুসলমানদের একটি দলই' বরং তারাই হচ্ছে একমাত্র 'মুসলিম দল'। যেহেতু তারাই একমাত্র মুসলিম দল, সুতরাং যারা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে তারা মুসলিম জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে। আর যারা তাদের দলে প্রবেশ করবে না তারা মুসলিম জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

তারা মনে করে থাকে হাদিসে নববীতে যে সকল শব্দগুলো এসেছে, যেমন 'জামায়াত', 'জমায়াতকে আঁকড়ে ধরা' 'জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া' ইত্যাদি শুধুমাত্র তাদের দলের জন্যই প্রযোজ্য।

এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা এবং শরিয়তের ভাষ্য থেকে নিজের পছন্দসই অর্থ বের করা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফিতনা-ফাসাদের দ্বার উম্মুক্ত করে দিবে; কারণ এর মাধ্যমে শরিয়তের দলিল-প্রমাণগুলো অপাত্রে রাখা এবং ভুল স্থানে প্রয়োগ করা হয়।

এদের মধ্যে এমনও রয়েছে যারা তাদের পছন্দসই কতিপয় মানদণ্ড দাঁড় করিয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে যে তারাই একমাত্র সত্যের উপর আছে এবং অন্যান্যরা সবাই সত্যকে পাশ কাটিয়ে চলছে।

কতিপয় এমনও রয়েছে যারা চিন্তা-চেতনা, কাজ-কর্ম, আকিদা-বিশ্বাস ও আচার-আচরণ ইত্যাদির আলোকে একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করে থাকে, যাতে এর মাধ্যমে তাদের পছন্দসই দলকে 'সত্যপন্থী' হিসেবে এবং অন্যান্যদেরকে 'বাতিল' হিসেবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। এটি এক ধরনের বাড়াবাড়ি ও অন্যায়, বিবেক-বুদ্ধির কাঠগড়ায় কখনো তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

অনেকে এমনও রয়েছে যারা সময়ের দিক থেকে অগ্রগামীতাকে সত্য ও সঠিক হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। সুতরাং বয়সে যে পুরাতন হবে সেই সত্যপন্থী হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

এমনকি কতিপয় মুসলিম ভূখণ্ডের কোনো কোনো দল ও সংগঠন মনে করে থাকে যে তারা একমাত্র সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে; কারণ তারাই হচ্ছে সর্বপ্রথম দল যে বিভিন্ন কর্মতৎপরতা নিয়ে মাঠে এগিয়ে এসেছে। পরবর্তীতে যে সকল দল গঠিত হয়েছে সবগুলোর অস্তিত্ব থেকে মুছে দেওয়া দরকার, তাদের অবশিষ্ট থাকার কোনো অধিকার নেই। তাদের দৃষ্টিতে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতাই তো তাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করার নামান্তর, আর হাদিস শরিফে এসেছে "যখন দু'জন খলিফার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে থাকে তখন তাদের শেষোক্তজনকে হত্যা করে ফেলো"।[২১]

এ ধরনের নির্বোধ ও দুঃসাহসিক হুকুম ও ফতোয়া এমন সকল লোকদের থেকে এসে থাকে যাদের শরিয়তের জ্ঞানের ময়দানে কদম আদৌ মজবুত নয়। এ ধরনের ফতোয়া সর্বদাই উম্মতের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদের বাতাস বয়ে আনে এবং পরবর্তীতে উম্মতের ধ্বংসকে অনিবার্য করে তোলে। তাই এ সকল ফতোয়া দেখে সুদূর অতীতের ফকিহ তথা ইসলামি আইনবিদদের বলতে শোনা যায় 'আজকের যুগে এমন সকল লোকও ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে যারা চোর-ডাকাতের তুলনায় কারাবাসের বেশি উপযুক্ত; কারণ চোর-ডাকাতের তুলনায় কারাবাসের বেশি উপযুক্ত; কারণ চোর-ডাকাতরা তো মানুষের পার্থিব জীবন বরবাদ করে থাকে, কিন্তু এ সকল লোকেরা মানুষের দ্বীনকে বরবাদ করে দিচ্ছে'!

বর্তমান সময়ে আমরা ফতোয়ার যে অবস্থা দেখছি এবং শুনছি তা জেনে এ সকল ফকিহগণ কি বললেন?! আল্লাহ আমাদের নিগাহবান, তিনি ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি-সামর্থ নেই।

---

[২১] আহমদ ও মুসলিম আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন, দেখুন : সহিহ জামে' সগীর (৪২১)।

পার্লামেন্ট নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে

মহিলারাও পুরুষের মতো দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ। আল্লাহর ইবাদাত করতে, ইকামাতে দ্বীনের কাজ আঞ্জাম দিতে, ধর্মের বিধি-বিধান পালন করতে, ধর্মীয় নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিহার করতে, আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে আহবান করতে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধানসহ শরিয়তের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করতে আদিষ্ট এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত।

শরিয়তের যাবতীয় সম্বোধনে পুরুষের ন্যায় মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে যে বিষয়গুলো শুধুমাত্র পুরুষের সাথে সংশ্লিষ্ট সেখানে এর জন্য নির্দিষ্ট দলিল-প্রমাণ ও আকার-ইঙ্গিত রয়েছে। যখন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন 'হে মানব সকল' কিংবা 'হে ইমানদারগণ', এ জাতীয় সম্বোধনে সন্দেহাতীতভাবে মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উম্মে সালমা রা. যখন আল্লাহর রসুলকে সা. বলতে শুনেছিলেন 'হে মানব সকল', তখন তিনি কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তা ছেড়ে দিয়ে দ্রুত রসুলের ডাকে সাড়া দিয়ে এসে পড়লেন। এমনকি সাড়াদানের ক্ষেত্রে তার দ্রুততা দেখে অনেকে আশ্চার্যবোধ করতে লাগলে তিনি তাদেরকে বললেন, আমিও তো মানুষের অন্তর্ভুক্ত।

মৌলিক বিধান হচ্ছে ব্যতিক্রমী বিষয়গুলো ব্যতীত বাকি সকল দায়িত্ব পালন ও দায়িত্বপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে মহিলারাও পুরুষের ন্যায়; কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "পুরুষ হও বা নারী, তোমরা সবাই একই জাতির অন্তর্ভুক্ত"[২২] এবং রসুলের সা. বাণী "নিশ্চয় মহিলারা পুরুষের সহধর্মীনী"। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ এবং দারেমী কর্তৃক বর্ণিত।

কুরআন নারী পুরুষ উভয়েরই কাঁধে সমাজ পরিবর্তন, সংশোধন এবং সংস্কারের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় যাকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিবিধান বলে নামকরণ করা হয়। ইরশাদ হয়েছে; "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এরা ভালো কাজের হুকুম দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হবেই"।[২৩]

---

[২২] সুরা আলে ইমরান : ১৯৫

[২৩] সুরা আত্ তাওবা : ৭১

কুরআনের এক স্থানে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য সমূহ উল্লেখ করার পর পরই ইমানদারদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে "মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরের দোসর। খারাপ কাজের হুকুম দেয়, ভালো কাজে নিষেধ করে এবং কল্যাণ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে"।[২৪]

যেহেতু মুনাফিক পুরুষদের পাশাপাশি মুনাফিক নারীরাও সমাজে ধ্বংসের কাজে ভূমিকা পালন করে থাকে; তাই এর বিপরীতে মুমিন নারীরাও মুমিন পুরুষদের পাশাপাশি সমাজ গঠন ও সমাজের সংস্কার সাধনে ভূমিকা পালন করবেই।

রসুলের সা. যুগে মহিলারা তাদের এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে, এমনকি সর্বপ্রথম যে কণ্ঠ রসুলের সা. নব্যুয়তকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়েছে তা ছিল এক নারীর কণ্ঠ, তিনি হলেন হজরত খাদীজা রা.। ইসলামের পথে সর্বপ্রথম যিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছিলেন তিনি ছিলেন এক নারী, হজরত আম্মারের মা সুমাইয়া রা.।

এমনকি তাদের মধ্যে কতিপয় এমনও ছিলেন যারা রসুলের সা. সাথে 'উহুদ' ও 'হুনাইন' ইত্যাদি যুদ্ধ লড়াই করেছিলেন। তাই ইমাম বুখারি হাদিসের শিরোনাম দিয়েছেন 'মহিলাদের যুদ্ধ ও লড়াই করা সংক্রান্ত হাদিসের অধ্যায়"।

শরিয়তের বিধি-বিধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, প্রায়ই সকল বিধানই সাধারণত নারী পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য, তবে কতিপয় বিধান এমন রয়েছে যেখানকার প্রকৃতিই দাবি করে যে, এখানে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক বিধানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন হায়েজ, নিফাস, ইস্তেহাজা, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসবকরণ, দুধপান করানো এবং শিশুদের লালনপালন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধি-বিধান যেগুলো একান্ত মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য।

এমনিভাবে পুরুষের রয়েছে পরিবারের তত্ত্বাবধায়ন ও দেখাশোনা এবং তাদের ভরণপোষণ প্রদান ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধান।

এখানে কতিপয় বিধান রয়েছে উত্তরাধিকারী সম্পদ সংক্রান্ত, সেখানে পুরুষকে মহিলা থেকে দ্বিগুণ দেওয়া হয়েছে। এর কারণ সুস্পষ্ট। এটি নারী পুরুষের আর্থিক দায়-দায়িত্বের পার্থক্যের ভিত্তিতেই দেওয়া হয়েছে; কারণ জগত-সংসারের প্রায়ই সকল আর্থিক দায়-দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে।

---

[২৪] সুরা আত্ তাওবা : ৬৭

এছাড়াও রয়েছে আর্থিক ও নাগরিক ইত্যাদি লেনদেনের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধান। এখানে দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান ধরা হয়েছে। এটিও জেনেটিক ও বাস্তবিক কারণেই দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা দলিল-প্রমাণের সত্যতার নিশ্চিতকরণ এবং মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

এমন কতিপয় বিধানও রয়েছে যেখানে একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। যেমন সন্তান প্রসবকরণ, দুধ পান করানো ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধান।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

এ পর্যায়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:

এক. যে সকল বিধান সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত শরিয়তের টেক্সট দ্বারা প্রমাণিত এগুলো ব্যতীত অন্য কোনো বিধি-বিধান পালনে আমরা নিজেদের উপর বাধ্য-বাধকতা আরোপ করতে পারি না। সুতরাং যে সকল বিধান শরিয়তের সুপ্রতিষ্ঠিত বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত নয়, যেমন দুর্বল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, অথবা যে সকল বিধান একাধিক অর্থ নানাবিধ ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে এ সকল ক্ষেত্রে একটি অর্থ গ্রহণ করে অপরের উপর তা চাপিয়ে দেওয়া কারো জন্য জায়েজ হবে না। বিশেষ করে সামাজিক বিষয়াদি যেগুলো সাধারণ জনসমাজের সাথে সম্পৃক্ত এবং যেগুলো সহজ-সরলতার অবকাশ রাখে এ সকল ক্ষেত্রে তা মোটেও জায়েজ হবে না।

দুই. এমন অনেক বিধান রয়েছে যেগুলোকে আমরা স্থান, কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে পারি না। এ জাতীর বিধানগুলো চাহিদার আলোকে পরিবর্তিত হওয়ার দাবি রাখে। তাই গবেষক বুদ্ধিজীবিদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদির পরিবর্তনে শরিয়তের বিধানও পরিবর্তিত হবে।

মহিলা সংক্রান্ত অধিকাংশ বিষয় অনেকটা এর সাথে সম্পৃক্ত। তাদের বিষয়াবলীতে অনেক কঠোরতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে, এমনকি তাদের মসজিদে গমনও হারাম করা হয়েছে, যদিও তা বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট টেক্সটের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাবধানতা এবং পাপাচারের পথ বন্ধ করা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, আর সময় ও কালের পরিবর্তনকেই বিবেচনায় রেখে তা করা হয়েছে!

তিন. সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারীরা নারী ইস্যু নিয়ে এখন ব্যবসায় মেনে পড়েছে। তারা এর মাধ্যমে ইসলামের উপর এমন কিছু অপবাদ চাপিয়ে দিতে চায় যা

থেকে ইসলাম সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ। তারা বলতে চায় ইসলাম নারীদের উপর জুলুম ও অবিচার করেছে এবং তাদের যাবতীয় কর্মক্ষমতা ও প্রতিভাকে অকর্মণ্য করে রেখেছে। আর এ ক্ষেত্রে তারা অতীতের পশ্চাৎপদ যুগের কতিপয় ঘটনাবলী এবং কঠোরতা অবলম্বনকারী কতিপয় সমসাময়িক ব্যক্তিত্বের বক্তব্য ইত্যাদিকে যুক্তি-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে।

বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ

উল্লেখিত আলোচনার আলোকে আমাদেরকে শরিয়তের দলিল-প্রমাণের নিরিখে মহিলাদের পার্লামেন্টে অথবা মজলিশে শুরায় প্রবেশ, মনোনয়নপত্র দাখিল এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে। একটি দল মনে করে থাকে এটি হারাম এবং সুস্পষ্ট গুনাহের কাজ, অথচ সন্দেহমুক্ত এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ থেকে মুক্ত সুস্পষ্ট দলিল ব্যতীত কোনো কাজ হারাম হওয়ার হুকুম দেওয়া যায় না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এ সকল কাজের ক্ষেত্রে শরিয়তের মৌলিক বিধান হচ্ছে বৈধতা, যতক্ষণ পর্যন্ত তা হারাম হওয়ার উপর সুস্পষ্ট কোনো দলিল পাওয়া না যায়। সুতরাং এখানে যারা হারাম মনে করেন এক্ষেত্রে তাদের ভিত্তি কি, তারা কোন দলিলের উপর ভিত্তি করে এ হুকুম দিয়ে থাকেন?

অনেকে এ ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে পেশ করেন কুরআনের বাণী "তোমরা তোমাদের গৃহমধ্যে অবস্থান করো", সুতরাং একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কোনো মহিলার জন্য তার বাড়ি ছেড়ে বের হওয়া বৈধ হতে পারে না। এ দলিলটি এখানে যথার্থ নয়। কারণ-

প্রথমত: আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট থেকে এটি স্পষ্ট যে এ আয়াত নবির সা. স্ত্রীদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। আর মান-মর্যাদা ও পর্দা পালনের ক্ষেত্রে অন্যান্য নারীদের তুলনায় তাদের উপর একটু বেশি কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। তাই তারা কোনো সৎকর্ম করলে অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ প্রতিদানের অধিকারী হবে, তেমনিভাবে তারা কোনো অসৎকর্ম করলে অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

দ্বিতীয়ত: এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও হজরত আয়েশা রা. গৃহ ত্যাগ করে উষ্ট্রীর যুদ্ধে গমন করেছিলেন, যখন তিনি মনে করেছিলেন হজরত উসমানের হত্যার কিসাস নেওয়ার জন্য বের হওয়া তার উপর দ্বীনি দায়িত্ব, যদিও তার এ ইজতেহাদ তথা চিন্তা-ভাবনা পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত: নারীরা কার্যত ঘর থেকে বের হচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষিকা, ডাক্তার, তত্ত্বাবধায়ক এবং অফিসিয়ালসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র থেকে কোনো ধরনের প্রতিবাদ বা বিধি-নিষেধ উত্থিত হয়নি। তাই অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে মহিলাদের ঘরের বাহিরে কাজ করার বৈধতার বিষয়ে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

চতুর্থত: পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বাস্তবতার দাবি হচ্ছে মুসলিম ধার্মিক মহিলারাও ভোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে যাতে সেক্যুলারিজম ও প্রগতিশীল মহিলাদের মোকাবিলা করা যায়, যারাই এখন কার্যত মহিলা সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে চলছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন কখনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ ও বড় হয়ে দেখা দিতে পারে, যা মহিলাদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের বৈধতাকে জোরদার করে।

পঞ্চমত: মহিলাদের ঘরে আটক রাখা বা থাকার বিষয়টি ইসলামি শরিয়ত পুরোপুরী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বকালীন সামান্য সময় ব্যতীত কখনো পাওয়া যায় না, যা ছিল ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ "তোমাদের নারীদের মধ্যে থেকে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী নিয়ে এসো। আর চার জন সাক্ষ্য দিয়ে যাবার পর তাদেরকে (নারীদের) গৃহে আবদ্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো পথ বের করে দেন"।[২৫] সুতরাং কিভাবে তা (ঘরে আবদ্ধ থাকা) স্বাভাবিক অবস্থায়ও মুসলিম নারীদের স্থায়ী ও আবশ্যকীয় গুণ হিসেবে গণ্য হতে পারে?

পাপাচারের প্রতিরোধ

এখানে অনেকে অবশ্যই এ বিষয়টিকে অন্য দিক থেকে দেখতে চান। অনেকে এ বিষয়টিকে 'পাপাচার রোধ' শীর্ষক ইসলামিক আইনের মৌলিক ধারার আলোকে দেখতে চান। মহিলারা যখন পার্লামেন্টে সদস্য পদপ্রার্থী হবে এবং এ জন্য নির্বাচনী প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চলাকালীন তারা পুরুষদের সাথে মেলামেশার সম্মুখীন হতে পারে এবং কখনো তা নির্জন অবস্থায়ও হয়ে যেতে পারে যা ইসলামি শরিয়তে হারাম এবং যা হারামের দিকে ধাবিত করে তাও হারাম।

নিঃসন্দেহে পাপাচারের প্রতিরোধ এবং এর দ্বার বন্ধ করে দেওয়া কাঙ্ক্ষিত বিষয়। কিন্তু ইসলামি আইনবিদসহ আলেম-উলামাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে পাপাচার

---

[২৫] সুরা নিসা ৪ : ১৫

রোধে বাড়াবাড়ি করা এর দ্বার উন্মোচনে বাড়াবাড়িই নামান্তর। কখনো এর মাধ্যমে আতঙ্কিত ক্ষতিকর বিষয়ের তুলনায় অনেক কল্যাণকর বিষয়ও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ফিতনা-ফ্যাসাদের আশঙ্কায় যারা মনে করে থাকেন নির্বাচনে ভোট প্রদানে অংশগ্রহণ করাও মহিলাদের জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ, 'পাপাচার রোধ' শীর্ষক উল্লেখিত মূলনীতি এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য দলিল হতে পারে, কিন্তু এর মাধ্যমে মূলত ইসলামপন্থীদের অনেকগুলো ভোট নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হবে এ সকল মহিলাদের ভোট প্রদানে বিরত থাকা ইসলাম বিরোধী শিবিরের জন্য কল্যাণ ও আর্শীবাদ বয়ে আনতে পারে.. বিশেষ করে যেখানে তাদের মহিলাদের ভোটগুলো পূর্ণমাত্রায় সংগৃহীত হয়ে থাকে।

এক সময়তো কতিপয় আলেম-উলামা 'পাপাচার রোধ' শীর্ষক উল্লেখিত মূলনীতির আলোকে মহিলাদের শিক্ষাগ্রহণ এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ভর্তির ব্যাপারেও আপত্তি তুলেছিলেন, এমনকি তাদের অনেকের বক্তব্য ছিল পড়তে পারে, কিন্তু লেখালেখি নয়! যাতে তাদের কলম প্রেমপত্র ইত্যাদি লিখতে ব্যবহৃত না হতে পারে। কিন্তু অবশেষে এর বিপরীত চিন্তাধারাই বিজয় লাভ করে এবং সবাই বুঝতে পারে যে পড়ালেখা মৌলিকভাবে কোনো অকল্যাণ বা খারাপ কিছু নয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষে এটি কল্যাণের অনেক পথকে সুগম করে দেয়।

এখানে আমরা বলব ভোটার হোক কিংবা পদপ্রার্থী হোক, এ ক্ষেত্রে মুসলিম ধার্মিক মহিলাকে অবশ্যই পুরুষদের সাথে কাজকর্ম, লেনদেন বা সাক্ষাত ইত্যাদিতে ইসলামি বিধি-বিধান বিবর্জিত বিষয়গুলো পরিহার করতে হবে। যেমন- নম্র স্বরে কথা বলা, পোষাক-পরিচ্ছদে সৌন্দর্য প্রদর্শন বা রূপচর্চা কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ এমন কেউ ব্যতিরেকে অন্য কারো সাথে একাকী হওয়া অথবা প্রয়োজনোতিরিক্ত মেলামেশা করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অবশ্যই মুসলিম ধার্মিক মহিলাদেরকে পরিহার করতে হবে।

পুরুষের উপর নারীর কর্তৃত্ব

পার্লামেন্ট নির্বাচনে মহিলাদের প্রার্থীর নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে দলিল-প্রমাণ হিসেবে অনেকে উল্লেখ করে থাকেন যে, এর মাধ্যমে পুরুষের উপর মহিলাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে যা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। বরং কুআনের মাধ্যমে যে মৌলিক বিষয়টি প্রমাণিত তা হচ্ছে পুরুষরাই হচ্ছে নারীদের তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং আমরা কিতাবে তা পরিবর্তন করে নারীদেরকে পুরুষের তত্ত্বাবধায়ক বানাতে পারি?

এখানে দু'টি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়াস পাচ্ছি।

এক: পার্লামেন্টে সাধারণত মহিলাদের সংখ্যা স্বল্প এবং সীমিতই থাকে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পুরুষেরই বজায় থাকে এবং এ সংখ্যারিষ্ঠতাই মূলত নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে থাকে। এদের রায় এবং মতামতের ভিত্তিতেই বিভিন্ন প্রকারের আইন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। সুতরাং গুটিকয়েক মহিলার প্রার্থীতার মাধ্যমে পুরুষের উপর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়ে যাচ্ছে, এখানে এমনটি বলার বা ভাবার সুযোগ কোথায়!

দুই: আয়াতে বলা হয়েছে তত্ত্বাবধায়নের লাগাম পুরুষেরই হাতে থাকবে। আর তা শুধুমাত্র দাম্পত্য জীবনের জন্যই প্রযোজ্য। পুরুষ হচ্ছে পরিবারের কর্তা এবং সে-ই এ ব্যপারে দায়িত্বশীল। কুরআনের বাণী "পুরুষ নারীর কর্তা। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে"।[২৬] আয়াতের এ অংশ: 'এবং এ জন্য যে, পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে' এ দিকেই দিচ্ছে যে এখানে পরিবারের উপর পুরুষের তত্ত্বাবধায়ন বলতে ওই মর্যাদা বুঝানো হয়েছে যা পুরুষকে দেওয়া হয়েছে। অপর একটি আয়াত "নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের অধিকার আছে তাদের উপর। তবে পুরুষদের তাদের উপর একটি মর্যাদা আছে"।[২৭]

পরিবারের উপর পুরুষদের এ তত্ত্বাবধায়নের পাশাপাশি মহিলাদেরও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত এবং পারিবারিক বিষয়াদিতে তাদের মতামতও গ্রহণ করা উচিত। দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুধ ছাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কুরআন এ দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে: "যদি উভয় পক্ষ অর্থাৎ সন্তানের পিতা-মাতা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে এমনটি করায় কোনো ক্ষতি নেই"।[২৮]

এমনিভাবে হাদিস শরিফে এসেছে: "কন্যাদের বিবাহের ব্যাপারে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করে নাও" (আহম্‌দ)।

কিন্তু পারিবারিক গণ্ডির বাইরে কোনো ক্ষেত্রে কতিপয় পুরুষের উপর কোনো নারীর কর্তৃত্বের বিষয়ে আয়াতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা হচ্ছে পুরুষদের উপর নারীর সর্বসময় ও ব্যাপক কর্তৃত্ব।

---

[২৬] সুরা নিসা ৪: ৩৪

[২৭] সুরা বাকারাহ ২: ২২৮

[২৮] সুরা বাকারা, ২: ২৩৩

ইমাম বুখারি আবু বাকরাহ রা. থেকে মারফু সনদে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন "যে জাতির নেতৃত্ব মহিলা থাকে সে জাতি কখনো সফল হতে পারে না" এর দ্বারা সমগ্র জাতির উপর সর্বময় ও ব্যাপক নের্তৃত্ব তথা রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হাদিসে উল্লেখিত 'আমরাহুম' অর্থাৎ তাদের বিষয় দ্বারা তাদের উপর সার্বিক নের্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব বুঝানো হয়েছে। সুতরাং বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয়ে মহিলাদের কর্তৃত্বের বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। যেমন ফতোয়া বা শরয়ী সমাধান প্রদান, ইজতিহাদ তথা চিন্তা-গবেষণা, শিক্ষা প্রদান, হাদিস বর্ণনা করা কিংবা কোনো অফিস-আদালত পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে মহিলাদের কর্তৃত্ব বৈধ এবং যুগ যুগ ধরে মহিলারা তা আঞ্জাম দিয়ে আসছে। এমনকি ইমাম আবু হানিফা রা. যে সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণ বৈধ, অর্থাৎ হুদুদ তথা ইসলামি দণ্ডবিধি এবং কিসাস তথা রক্তপণ আদায়ের বিষয় ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে বিচারকার্য সম্পাদন করা মহিলাদের জন্য বৈধ বলেছেন। এছাড়াও অতীত ফকিহদের অনেকেই আবার হুদুদ এবং কিসাসের ক্ষেত্রেও তাদের বিচারকর্যে নিয়োগ দানকে বৈধ বলেছেন। যেমনটি ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম তাঁর রচিত 'আত্ তুরুক আল হুকমিয়াহ' গ্রন্থ উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও ইমাম তাবারী এবং ইবনে হাযম সার্বিকভাবে সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের বিচারকার্য সম্পাদনকে বৈধ বলেছেন। এখান থেকে এটাই বোধগম্য যে, মূলত ইসলামি শরিয়তে মহিলাদের বিচারকের দায়িত্ব পালন নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য সুস্পষ্ট কোনো দলিল-প্রমাণ নেই, অন্যথায় ইবনে হাযম তা অবশ্যই গ্রহণ করতেন এবং এর বাহ্যিক অর্থগ্রহণ করে তিনিই সর্বাগ্রে তা অবৈধ বলতেন, পাশাপাশি যারা এর বিরোধিতা করত তার অভ্যাস মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিতেন।

উল্লেখিত হাদিসটি বর্ণনার প্রেক্ষাপটও এ কথার জোরদার করে যে এখানে সর্বময় ও ব্যাপক কর্তৃত্ব তথা রাষ্ট্র প্রধানের কর্তৃত্ব বুঝানো হয়েছে। রসুলের সা. কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, পারসিক জাতি তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকেই তাদের নেত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তখন তিনি বললেন, "ওই জাতি সফল হতে পারে না..." আল হাদিস।

একটি আপত্তি এবং তার জবাব

মহিলাদের পার্লামেন্টে প্রবেশের বিরোধী শিবির থেকে যে সংশয় প্রকাশ করা হয় তা হচ্ছে পার্লামেন্ট সদস্য সরকার থেকে, বরং স্বয়ং সরকার প্রধান থেকেও বেশি ক্ষমতাবান ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। কারণ সংসদ সদস্য হিসেবে সে ইচ্ছে করলে সরকার এবং সরকার প্রধানের কাজের পর্যালোচনা করতে এবং তার উপর খবরদারি

করতে পারে। সুতরাং মহিলাদের সংসদ সদস্য হওয়ার বৈধতার অর্থ হচ্ছে আমরা তাদেরকে ব্যাপক ও সর্বময় ক্ষমতা তথা রাষ্ট্রপতির পদ থেকে নিষেধ করে অন্য উপায়ে তা অর্জনের সুযোগ করে দিচ্ছি।

উল্লেখিত সংশয়ের অপনোদন করে আমাদেরকে এখানে সংসদ কিংবা মজলিশে শুরার সদস্য হওয়ার তাৎপর্য এবং তাদের কর্মপরিধি ইত্যাদি একটু খতিয়ে দেখা দরকার।

সংসদ সদস্যের মিশন

এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদে সদস্যের কাজ দু'দিক থেকে হয়ে থাকে, তা হচ্ছে পর্যালোচনা কিংবা সরকারের যাবতীয় কার্যক্রমের খবরদারি করা এবং আইন প্রণয়ন। এ দু'টি বিষয়ে আলোচনায় আমাদের কাছে যা স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো:

পর্যালোচনার তাৎপর্য

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রচলিত পর্যালোচনা কিংবা তত্ত্বাবধায়ন ইত্যাদি মূলত ইসলামি শরিয়তের প্রচলিত পরিভাষা 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধান' এবং 'সুপরামর্শ দান ও অপরের কল্যাণ কামনা' ইত্যাদিরই নামান্তর। আর মুসলমানদের ইমাম থেকে শুরু করে সকলের উপর এ কাজ আঞ্জাম দেওয়া আবশ্যক।

'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধান' এবং 'সুপারামর্শ দান ও অপরের কল্যাণ কামনা' ইত্যাদি পুরুষ ও নারী সকলের উপর আবশ্যক এবং তাদের প্রত্যেকেরই কাছে তা কাম্য। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছেঃ "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এর ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে" (সুরা তাওবা, ৯: ৭১)।

রসুল সা. বলেন, "অপরের কল্যাণ কামনা করা, নসিহত করা কিংবা সুপরামর্শ দেওয়া ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়, আর তা হবে আল্লাহ, তাঁর রসুল, তাঁর কিতাব, মুসলমান জাতির ইমাম এবং তাদের সর্বসাধারণের জন্য" (মুসলিম)। অত্র হাদিসে রসুল সা. এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য সীমাবদ্ধ করেননি।

ইতিহাস অধ্যয়নে আমরা দেখি যে, এক মহিলা মসজিদে আমিরুল মোমেনিন হজরত উমরের কথার প্রতিবাদ করেছিলেন; অতঃপর উমর তাঁর মতামত ত্যাগ করে উক্ত মহিলার মতামত গ্রহণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন "উক্ত মহিলা সঠিক মতামত দিয়েছে, উমর ভুল করেছে" (ইবনে কাসীর উত্তর সনদে বর্ণনা করেন)।

রসুল সা. হুদাইবিয়ার ময়দানে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমর সাথে পরামর্শ করলে তিনি সঠিক একটি চিন্তার দিকে রসুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, আর রসুল সা.

দ্রুতবেগে তা বাস্তবায়ন করেছিলেন। পরবর্তীতে দেখা গেল বাস্তবে এটি একটি সঠিক ও কল্যাণকর চিন্তা ছিল।

যেহেতু কাউকে পরামর্শ দেওয়া, কোনো বিষয়ে সঠিক মনে করলে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎকাজ থেকে বারণ করা এবং কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত দেওয়া। এটি ভুল কিংবা এটি সঠিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণে মহিলাদের ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে। সুতরাং এ সকল দায়িত্ব পালনার্থে পার্লামেন্ট সদস্যপদ গ্রহণ করতেও কোনো বিধি-নিষেধ না থাকাই স্বাভাবিক। আর বাস্তবেও এ ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞামূলক কোনো দলিল-প্রমাণ ইসলামি আইনে নেই। মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম আচার-আচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক বিধান হচ্ছে বৈধতা। শুধুমাত্র যে সকল বিষয় অবৈধ হওয়ার জন্য সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ দলিল-প্রমাণ পাওয়া যাবে তাই অবৈধ হবে এবং এছাড়া অন্যান্য সকল বিষয় মৌলিক বিধানের আলোকে বৈধ হবে। এখানে যা কিছু বলা হয়ে থাকে যে, মহিলাদের সংসদে প্রবেশ কিংবা শুরার সদস্য গ্রহণে ইতিহাসে ইতিবাচক কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না, তা অবৈধ হওয়ার জন্য এটি কোনো শরীয় ভিত্তি বা দলিল নেই। এ বিষয়টি এখন "স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে শরিয়তের বিধান পরিবর্তন হয়ে থাকে" ইসলামি আইনের এ ধারার অন্তর্ভুক্ত। সুদূর অতীতের সে সময়ে বর্তমানের এ আকৃতিতে শুরা ব্যবস্থা ছিল না, পুরুষের জন্যও নয়, মহিলাদের জন্যও নয়। এটি এমন সকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যেখানে শরিয়তের দলিল ও ভাষ্যগুলো সংক্ষিপ্ত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যতীত এসেছে এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং বাস্তবায়ন পক্রিয়া মুসলমানদের ইজতেহাদ তথা চিন্তা-গবেষণার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মুসলিম গবেষকরা তাদের স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঠিক করে নিবে।

যেখানে রসুলের সা. কাজ শুধুমাত্র বৈধতা ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি নির্দেশ করে না, সেখানে রসুল ব্যতীত অন্যের কাজের কি বিধান থাকতে পারে, যাদের ভুল কিংবা ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকার কোনো গ্যারান্টি নেই?

আমরাতো এখন মহিলাদেরকে এমন সকল কাজের সুযোগ দিচ্ছি যা ইতোপূর্বে ছিল না। তাদের জন্য এখন আমার স্কুল, কলেজ কিংবা ভার্সিটি নির্মাণ করছি যেখানে শত শত তরুণী পড়াশোনা করছে এবং যেখান থেকে শিক্ষিকা, ডাক্তার, হিসাবরক্ষক কিংবা প্রশাসনিক অফিসার ইত্যাদি বের হচ্ছে। এদের অনেকেই এখন এমন সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে যেখানে তার তত্ত্বাবধানে পুরুষও রয়েছে। শত শত এমন স্কুল রয়েছে যেখানে মহিলার পরিচালনায় পুরুষরাও শিক্ষকতা করছে। মহিলা কলেজ ও ভার্সিটিগুলোতে পুরুষরাও অধ্যাপনা করছে, অথচ

অধিকাংশ মহিলারাই এখানে প্রিন্সিপাল কিংবা ডিনের দায়িত্ব পালন করছে। মহিলাদের তত্ত্বাবধানে কিংবা তাদের মালিকানাধীন এমন অনেক প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি ইত্যাদি রয়েছে যেখানে শত শত পুরুষ কর্মচারী-কর্মকর্তা কাজ করছে। কখনো কোনো মহিলার স্বামী এমন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল কিংবা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকে যার তত্ত্বাবধান কিংবা পরিচালনায় তার স্ত্রী স্বয়ং রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে কাজ করছে, অথচ যখন তারা ঘরে ফিরে যায় তখন স্বামী হয়ে যায় তার তত্ত্বাবধায়ক।

যে কথাটি বলা হয়েছে যে, পার্লামেন্ট কিংবা মজলিসে শুরার ক্ষমতা ও মর্যাদা সরকার এবং সরকারের কার্যনির্বাহী কমিটি যেখানে রাষ্ট্র প্রধানও রয়েছে তাদের থেকেও বেশি; কারণ পার্লামেন্ট বা শুরাই সরকারের নজরদারি করে থাকে, এ ধরনের বক্তব্য আদৌ সঠিক নয়।

যে পর্যালোচনা করার অধিকার রাখে সে সর্বদা তার থেকে উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতাবান হিসেবে বিবেচিত হয় না। আসল বিষয় হচ্ছে তার পর্যালোচনা করার অধিকার রয়েছে যদিও সে মর্যাদা ও ক্ষমতার দিক থেকে তার থেকে নিম্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে আমীরুল মোমেনিন কিংবা সরকার প্রধান সর্বদা রাষ্ট্রের সর্বময় ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তা সত্ত্বেও তার প্রজাতন্ত্র থেকে সাধারণ ব্যক্তিরও এ অধিকার রয়েছে যে, সে প্রয়োজনবোধ করলে সরকারের কাজের পর্যালোচনা করতে, তাকে সুপরামর্শ দিতে এবং সৎ কাজে তাকে উপদেশ দিতে ও অসৎ কাজ থেকে তাকে বারণ করতে পারবে। যেমনটি বলেছেন ইসলামের প্রথম খলিফা "তোমরা যদি আমাকে সত্যের উপর দেখ তাহলে সহযোগিতা করবে, আর যদি অন্যায়ের উপর দেখ তাহলে আমাকে সোজা করে দিবে"।

এমনিভাবে দ্বিতীয় খলিফাও এমনটি বলেছেন "তোমাদের যে কেউ আমার মধ্যে কোনো বক্রতা দেখতে পায় সে যেন আমাকে সোজা করে দেয়"।

এমনিভাবে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, মহিলাদের অধিকার রয়েছে স্বামীর কাজের পর্যালোচনার কিংবা প্রয়োজনবোধে তাকে পরামর্শ ইত্যাদি দেওয়ার, যদিও পারিবারিক জীবনে সে তার স্ত্রীর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বিবেচিত। মহিলা তার স্বামীকে বলতে পারবে এটি কেন ক্রয় করেছে? বেশি বেশি এ কাজ করে কেন? সন্তানদের যত্ন করে না কেন? আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ-খবর রাখে না কেন? ইত্যাদি সকল বিষয়াদি মূলত যা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবিধানেরই অন্তর্ভুক্ত।

তারপরও আইন প্রণয়ন কিংবা পর্যালোচনা করা ইত্যাদির বিচারে যদি পার্লামেন্ট বা শুরাকে সরকার থেকে উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে তবে তা হতে পারে সামগ্রিক বিবেচনায়, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেচনায় নয়, আর সামগ্রিক বিচারে অধিকাংশ সদস্য সাধারণত পুরুষই হয়ে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে সাধারণত মহিলা আসন সীমিত ও স্বল্প হয়ে থাকে।

পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন

পার্লামেন্ট বা আইন মিশনের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে আইন প্রণয়ন।

আবেগপ্রবণ অনেক ব্যক্তি এখানে এ মিশনকে খুব বড় করে দেখেন। তারা মনে করেন যে এটি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব থেকেও অধিকতর ক্ষমতাবান ও মর্যাদাসম্পন্ন; কারণ এরাই রাষ্ট্রের জন্য আইন প্রণয়ন করে থাকে। সুতরাং অতিরিক্ত আবেগের বশবর্তী হয়ে তারা অবশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এত বড় একটি কাজের আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব মহিলাদের জন্য কখনো বৈধ হতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এর থেকে অনেক সহজ ও সাধারণ। মৌলিক আইন প্রণেতা আল্লাহ তায়ালা। শরিয়তের আদেশ-নিষেধ সম্বলিত মৌলিক বিধি-বিধান মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। আমরা মানুষের মিশন হচ্ছে শুধুমাত্র এমন সকল বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে কোনো বিধান জারি করা কিংবা সংক্ষিপ্ত কোনো ভাষ্যের উপযুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করানো। অন্য ভাষায় আমাদের কাজ হচ্ছে শরিয়তের বিধান বের করা, বিধি-বিধানের উপযুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং এর প্রয়োগরূপ ইত্যাদিতে 'ইজতিহাদ' তথা সর্বোচ্চ চিন্তা-গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

আর ইসলামি শরিয়তে 'ইজতিহাদ' নারী-পুরুষ সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইসলামি আইনবিদদের যারা ইজতিহাদের শর্তাবলী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাদের কেউই এ কথা বলেননি যে, ইজতিহাদের জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত এবং মহিলাদের জন্য ইজতেহাদ নিষিদ্ধ।

হজরত আয়েশা রা. সাহাবিদের মধ্যে মুজতাহিদ এবং মুফতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বিশিষ্ট সাহাবিদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে তার পর্যালোচনা পাওয়া যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহাবিদের মতামতের উপর তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণী পওয়া যায় যেগুলো সুপরিচিত অনেক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।[২৯]

---

[২৯] যেমন ইমাম যারকাশী রচিত "সাহাবিদের উপর হজরত আয়েশার যাবতীয় দৃষ্টিআকর্ষণীর জবাব" শীর্ষক গ্রন্থ। ইমাম সুয়ূতী তার "আইনুল ইসাবাহ" শীর্ষক গন্থে তা সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হ্যাঁ, আমাদের ইতিহাসে পুরুষের ন্যায় মহিলাদের ইজতেহাদ তেমন একটা প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি; এর কারণ হচ্ছে সুদুর অতীতের পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে মহিলা সমাজে শিক্ষার আলো উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়নি। কিন্তু বর্তমানে সম্পূর্ণ এর বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছে। মহিলাদের শিক্ষার হার বর্তমানে পুরুষের সমান কিংবা অনেকটা তাদের কাছাকাছি এবং তাদের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাবান রয়েছে যা অনেকাংশে পুরুষকেও হার মানিয়েছে। শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রতিভার জ্যোতি শুধুমাত্র পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এমন অনেক মহিলাও রয়েছে যাদের মধ্যে এমন সকল প্রতিভার সমাহার ঘটে থাকে যা একজন পুরুষের পক্ষে অর্জন করা অনেকটা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কুরআন আমাদের জন্য সাবা' সম্প্রদায়ের রানির ঘটনা বর্ণনা করেছে। হুদহুদ পাখি কর্তৃক সুলাইমানের আ. চিঠি পাওয়ার পর থেকে তার সাথে রানির যে ভূমিকা বা অবস্থান তাতে তার প্রজ্ঞা এবং সঠিক চিন্তার জ্যোতি দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে রানি সংক্ষিপ্ত ও সামান্য একটি চিঠিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে, অন্য সকল ফায়সালার ন্যায় এখানেও তার সকল নেতৃস্থানীয় সভা সদস্যদেরকে আহ্বান করেছে। "তোমাদের বাদ দিয়ে তো আমি কোনো বিষয়ের ফায়সালা করি না" এবং কিভাবে শক্তিশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা রাণীর প্রজ্ঞার উপর ভরসা করে স্বেচ্ছায় বিষয়টি তার উপর ছেয়ে দিয়েছে "তারা জবাব দিল আমরা শক্তিশালী ও যোদ্ধা জাতি, তবে সিদ্ধান্ত আপনার হাতে, আপনি নিজেই ভেবে দেখুন আপনার কি আদেশ দেওয়া উচিত"।[৩০]

এরপর কুরআন আরো বর্ণনা করেছে কিভাবে রানি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সুলাইমানের আ. সাথে আচরণ করেছেন এবং অবশেষে তিনি আল্লাহর সামনে আনুগত্য প্রকাশ করেছেন "আমি সুলাইমানের সাথে নিজেকে আল্লাহর সামনে সমর্পণ করলাম"।

কুরআনে এ ঘটনা বর্ণনা দেওয়া অনর্থক নয়; বরং শাসনকার্য কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী যে এমন সকল বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, সুকৌশল কিংবা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাক্ষর রাখতে পারে যা কখনো পুরুষের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে উঠে, কুরআনে বর্ণীত উল্লেখিত ঘটনা এ দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করছে।

এখানে দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই যে, কতিপয় বিষয় এমন রয়েছে যা স্বয়ং নারী সম্পর্কিত এবং পরিবারে নারীর ভূমিকা, উপস্থিতি ইত্যাদি সংক্রান্ত, যেখানে অবশ্যই নারীর মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং যেখান থেকে নারীর অনুপস্থিত

---

[৩০] সুরা নামল, ২৭: ৩৩।

থাকার কোনো সুযোগ নেই; হয়তবা এ সকল বিষয়ে কখনো কখনো নারী পুরুষের তুলনায় বেশি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারে।

যে মহিলা মসজিদে হজরত উমরের মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিল তা ছিল পারিবারিক বিষয়ে শরিয়তের বিধান সম্পর্কিত। আর তা হচ্ছে মোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করার বিষয়। উক্ত মহিলার উল্লেখিত পর্যালোচনার কারণেই হজরত উমর মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন থেকে হাত গুটিয়ে নেন।

এছাড়াও হজরত উমর এমন অনেক আইন প্রণয়ন ও প্রচলন করেছেন যে সকল ক্ষেত্রে মহিলার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ পরামর্শ ও ভূমিকা ছিল। যেমন কোনো সৈনিকের ছয় মাসের বেশি পরিবার থেকে অনুপস্থিত না থাকার বিধান। হজরত উমর তাঁর কন্যা হাফসাকে রা. জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী সর্বোচ্চ কতদিন ধৈর্য ধারণ করতে পারে? হাফসা বললেন, চার মাস কিংবা ছয় মাস।

গভীর রজনীতে এক মহিলার কবিতা আবৃত্তি শুনে হজরত উমর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন, একাকীত্ব যে মহিলার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল এবং নিঃসঙ্গতা যাকে পাগল করে তুলছিল, সে মহিলা খাটে শোয়া অবস্থায় আবৃত্তি করে চলছিল। দীর্ঘ রজনীর এই নীরব কালো অন্ধকারে প্রিয়তমের অনুপস্থিতি আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, আল্লাহর শপথ! যদি পরকালের ভয় না থাকত তাহলে হয়তবা এ খাট থেকে নেমে পড়তে বাধ্য হতাম!

এমনিভাবে ইসলামের সকল নবজাতককে রেশন প্রদান সংক্রান্ত আইন। অথচ ইতোপূর্বে হজরত উমরের আইন ছিল দুধ ছাড়ানোর পূর্ব সময়ে কাউকে রেশন দেওয়া হবে না। তখন মায়েরা তাড়াতাড়ি রেশন পাওয়ার আশায় যথা সময়ের পূর্বে সন্তানদেরকে দুধ পান করানো বন্ধ করে দিত। হজরত উমর একদিন একটি শিশুর ধারাবাহিক ক্রন্দন শুনতে পেয়ে তার মাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে উমরকে না চিনেই উত্তর দিয়েছিল, আমিরুল মোমেনিন এর আইন হচ্ছে দুধ ছড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত কাউকে রেশন দেওয়া হবে না; তাই আমি তাড়াতাড়ি একে দুধ পান করানো বন্ধ করে দিয়েছি, আর এ জন্যই সে কাঁদছে।

উমর বললেন, ধ্বংস তোমার জন্য হে উমর, কত মুসলমান শিশুকে তুমি হত্যা করেছো! এরপর তিনি প্রত্যেক নবজাতকের জন্য রেশন প্রদানের আইন জারি করেন।

উল্লেখিত আলোচনার আলোকে আমরা যখন মহিলাদের পার্লামেন্টে প্রবেশের বৈধতার কথা বলি, আমরা এর দ্বারা এটি উদ্দেশ্য করি না যে, মহিলাদের অবাধে অপরিচিত পুরুষের সাথে মেলামেশা করবে কিংবা এর জন্য তার পরিবার ও স্বামী-সন্তানদেরকে চরম মূল্য দিতে হবে। অথবা এও বলি না যে, পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে তার মিশন আঞ্জাম দিতে গিয়ে পোশাক-পরিচ্ছেদ, কথা-বার্তা, চাল-চলন ইত্যাদিতে লজ্জাশীলতা ও শালীনতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বরং নিঃসন্দেহে তাকে সর্বদা এগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত করার কোনো অবকাশ নেই।

মহিলাদের থেকে উল্লেখিত বিষয়গুলো যেভাবে পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে কাম্য, তেমনিভাবে মহিলা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে থাকবে, কিংবা কোনো ফ্যাকাল্টির ডিন হিসেবে থাকবে, অথবা এছাড়াও অন্য যেখানেই থাকুক না কেন সকল ক্ষেত্রেই তা কাম্য। ঘরের বাইরে মহিলারা যে কাজেই থাকুক না কেন সর্বদা তাদেরকে উপরোক্ত বিষয়াবলীর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

ইসলামি রাষ্ট্রের উচিত যে সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের কাজ করার সুযোগ থাকে বা সাধারণত মহিলারা কাজ করে থাকে সে সকল স্থানে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত বসার স্থান বা কাজের স্থান, কিংবা স্পেশাল মহিলা কর্নার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, যাতে মহিলারা নিঃসংকোচে, নিরাপদে ও প্রশান্ত মনে তাদের কাজ করে যেতে সক্ষম হয়।

'রাজনৈতিক কার্যক্রম মহিলাদের জন্য হারাম' শীর্ষক ফতোয়ার পর্যালোচনা

পার্লামেন্টে মহিলাদের মনোনয়ন পত্র দাখিল করা এবং সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য প্রার্থী হওয়া সংক্রান্ত উল্লেখিত কয়েক পৃষ্ঠা লেখার পর কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আল আযহারের আলেমদের প্রাচীন একটি ফতোয়ার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, যার সারাংশ হচ্ছে রাজনৈতিক অধিকার চর্চা করা মহিলাদের জন্য হারাম; এরমধ্যে সর্বাগ্রে হচ্ছে ভোটাধিকার 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলার মাধ্যমে কোনো প্রার্থীর প্রতি সাক্ষ্য দেওয়া। যেখানে শুধুমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ করা মহিলাদের জন্য হারাম সেখানে সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য প্রার্থী হওয়াতো অবশ্যই হারাম হবে।

নবির সা. স্ত্রীদের অবস্থান এবং সাজ-সজ্জার প্রতি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা

'মহিলাদের জন্য রাজনৈতিক অধিকার চর্চা হারাম' এ মতের প্রবক্তাগণ দলিল-প্রমাণ হিসেবে যা উল্লেখ করে থাকেন:

মহিলাদের স্বভাব-চরিত্র ও সৃষ্টিগত গুণাগুণের দাবি হচ্ছে যে, তাদের জন্য ওই সকল মিশনই প্রযোজ্য যে জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা তাদের রক্ত-মাংসের সাথে জড়িয়ে আছে। আর তা হচ্ছে মাতৃত্বের মিশন এবং সন্তানদের নার্সিং ও তাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান। এ সকল মিশনই তাদের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের আবেগ-অনুভূতির জন্ম দিয়ে থাকে, যার প্রভাব থেকে তারা কখনো মুক্তি পেতে পারে না।

জীবনের সকল স্তরে, সকল পর্যায়ে এবং সব ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মহিলারা যে আবেগ তাড়িত হয়ে থাকে, আবেগ-অনুভূতি দ্বারা কঠিনভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে তার জন্য একাধিক বাস্তব দৃষ্টান্ত খুঁজে পেতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না এর আদৌ এর কোনো প্রয়োজন নেই।

সর্বোত্তম পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েও এক ধরনের অনুভূতির সামনে মহিলাদের বিবেক-বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটে থাকে।

নবির সা. স্ত্রীদের কথা বলতে গিয়ে সুরা আল আহযাবের কতিপয় আয়াত এ দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করেছে যে: রসুলের সা. স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার সাজ-সজ্জা এবং ভোগ সামগ্রীর প্রতি তাদের কিরূপ কামনা-বাসনা ছিল! রসুলের কাছে তাদের দাবি ছিল তিনি যেন আল্লাহর প্রদত্ত গনিমত থেকে তাদেরকে বিশাল এক অংশ প্রদান করেন, যাতে তারা রাজা-বাদশাহদের স্ত্রীদের ন্যায় ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করতে পারে।

কিন্তু কুরআন এ ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধির দাবির প্রতিই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে: "হে নবি! তোমার স্ত্রীদেরকে বলো, যদি তোমরা দুনিয়া এবং তার ভূষণ চাও, তাহলে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমার আল্লাহ, তাঁর রসুল ও আখেরাতের প্রত্যাশী হও, তাহলে জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে যারা কর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহা প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন" (সুরা আহযাব, ৩৩: ২৮-২৯)।

সুরা আত্ তাহরীমের এক আয়াতে নবির কতিপয় স্ত্রীদের ঈর্ষা ও আত্মসম্মানবোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা তাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর জয়ী হয়ে বসেছিল, যার ফলশ্রুতিতে তারা রসুলের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতেও দ্বিধাবোধ করে নি। তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত করে তাদেরকে রসুলের প্রতি পুনরায় আগ্রহী ও আন্তরিক করে তুলতে কুরআনে বলা হয়েছে: "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম), কেননা তোমাদের মন সোজা পথ থেকে

বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে, আর যদি তোমরা নবির বিরুদ্ধে পরস্পর সংঘবদ্ধ হও তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ তার অভিভাবক; তাছাড়া জিবরাঈল, নেককার ইমানদারগণ এবং সকল ফেরেশতা তার সাথী ও সাহায্যকারী” (সুরা আত-তাহরিম, ৬৬: ৪)।

এরা এমন সব মহিলা যারা সর্বোত্তম পরিবেশে থেকেও তাদের আবেগ-অনুভূতির লাগামকে টেনে ধরতে সক্ষম হননি। নবি, নবুয়্যত ও ওহির ছত্রছায়ায় পরিপূর্ণ ইমান-আমলের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ঈর্ষা ও আত্মসম্মানবোধের উপর তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি বিজয়ী হতে পারেনি! সুতরাং অপরাপর সকল মহিলাদের ব্যাপারে কি চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে, যারা এমন সকল পরিবেশ, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও ইমান-আমলের সামান্যতমও লাভ করতে পারেনি?!

নবির সা. স্ত্রীদের দৃষ্টান্ত এনে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ এমনটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তারা এ কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন যে, যখনি নবির স্ত্রীদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে থেকে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তখনি তারা আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং আখেরাতকেই বেছে নিয়েছিলেন। সুতরাং অন্যান্য সকল মহিলা, বিশেষ করে রাজা-বাদশাহদের স্ত্রীদের ন্যায় দুনিয়ার ভোগসামগ্রী এবং সাজ-সজ্জার প্রতি কামনা-বাসনা কখনো তাদের বিবেক-বুদ্ধি স্বল্পতা এবং সার্বিক বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার অনুপযুক্ততার প্রতি ইঙ্গিতবহ হতে পারে না। বরং নারী জাতির স্বভাব-প্রকৃতি এবং মানবিক চাহিদার আলোকে এ ধরনের কামনা-বাসনা স্বাভাবিকই ছিল; কিন্তু যখনি দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোনো একটি বেছে নেওয়া সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সাথে সাথে তাদেও কামনা-বাসনার মেঘমালাও কেটে গিয়েছিল।

পুরুষরা কি এ ধরনের অবস্থান থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকতে পেরেছিল? তারাও তো সময়ে সময়ে দুনিয়া অভিমুখী হয়ে পড়েছিল, তারপর খোদায়ী প্রত্যাদেশ তাদেরকে ভুল-ত্রুটি কিংবা অমনোযোগীতা থেকে সাবধান করলে তাদের সচেতনতা ফিরে এসেছিল।

কুরআন সাহাবিদের সম্পর্কে রসুলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল “আর যে সময় তারা ব্যবসায় ও খেল তামাশার উপকরণ দেখলো তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে দৌড়ে গেল। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়ের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা” (সুরা জুমআ, ৬২: ১১)।

ওহুদ যুদ্ধের পর মানবতার সর্বোত্তম প্রজন্ম রসুলের সা. সাহাবিদেরকে তিরস্কার করে কি কুরআনের আয়াত নাজিল হয়নি, তারা যে রসুলের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিল

এবং তাদের নির্ধারিত অবস্থান ত্যাগ করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আহরণে নেমে পড়েছিল ... পরিণামে যা হওয়ার তাই হয়েছিল? আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আল্লাহ তোমাদের কাছে (সাহায্য ও সমর্থদানের) যে ওয়াদা করেছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন। শুরুতেই তার হুকুমে তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে। কিন্তু যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পারস্পরিক মতবিরোধে লিপ্ত হলে, আর যখনই আল্লাহ তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন যার ভালোবাসায় তোমরা বাঁধা ছিলে (অর্থাৎ গনিমতের মাল) তোমরা নিজেদের নেতার হুকুম অমান্য করে বসলে, কারণ তোমাদের কিছু লোক ছিল দুনিয়ার প্রত্যাশী আর কিছু লোকের কাম্য ছিল আখেরাত, তখনই আল্লাহ কাফেরদের মোকাবিলায় তোমাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য" (সুরা আলে ইমরান, ৩: ১৫২)।

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে দুনিয়ার প্রত্যাশা করে থাকে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আমার জানা ছিল না।

উল্লেখিত ঘটনাবলী যেখানে জাতির উৎকৃষ্ট লোকেরাও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার সামনে তাদের বিবেক-বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে পড়ে, এ ধরনের ঘটনাবলী ও অবস্থানকে বিবেচনায় রেখে এ কথা বলা কি সঠিক হবে যে, পুরুষ জাতি বড় বড় মিশন বাস্তবায়নের উপযুক্ত নয়?

বদরের যুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়কালীন পরিস্থিতিতে কতিপয় মুমিন ব্যক্তির এ ধরনের অবস্থানের কথা কুরআন কারিমে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন "(এই গনিমতের মালের ব্যাপারে ঠিক তেমনি অবস্থা দেখা দিচ্ছে যেমন অবস্থা সে সময় দেখা দিয়েছিল যখন) তোমার রব তোমাকে সত্য সহকারে ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন এবং মুমিনদের একটি দলের কাছে এটা ছিল বড়ই অসহনীয়। তারা এ সত্যের ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করছিল অথচ তা একেবারে পরিষ্কার হয়ে ভেসে উঠেছিল। তাদের অবস্থা এমন ছিল, যেন তারা দেখছিল তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা করছিলেন, দু'টি দলের মধ্যে থেকে একটি তোমরা পেয়ে যাবে। তোমরা চাচ্ছিলে, তোমরা দুর্বল দলটি লাভ করবে ... " (সুরা আনফাল, ৮: ৫-৭)।

যুদ্ধের পরে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে এ সকল লোকদের অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে "তোমরা চাও দুনিয়ার স্বার্থ। অথচ আল্লাহর সামনে রয়েছে আখেরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ। আল্লাহর লিখন যদি আগেই

না লেখা হয়ে যেতো, তাহলে তোমরা যা কিছু করেছো সে জন্য তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো" (সুরা আনফাল, ৮: ৬৭-৬৮)।

মানবিক দুর্বলতা পুরুষ ও নারী সকলকেই পেয়ে বসতে পারে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে শেষ পরিণাম।

কেন আমরা হুদাইবিয়ার দিবসে রসুলকে সা. প্রদত্ত উম্মে সালমার রা. পরামর্শের কথা উল্লেখ করছি না, যার পশ্চাতে ছিল অনেক কল্যাণ?!

বরং কেন আমরা এখানে সেই মহিলার কথা উল্লেখ করছি না কুরআনে যার উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিবেক-বুদ্ধির সাথে তার জাতির শাসনকার্য চালিয়ে যাচ্ছিল, প্রজ্ঞার সাথে তাদের পরিচালনা করছিল এবং কঠিন মুহূর্তে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণকর একটি পথের দিকে তাদেরকে টেনে নিয়ে আসছিল? হ্যাঁ, সে হচ্ছে সাবা' সম্প্রদায়ের রাণী, কোনো শহরে বিজয়ী বেশে প্রবেশকারী ঔপনিবেশিক শাসকের কার্যক্রমকে সে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও চমৎকার ভাষায় তার জাতির সামনে পেশ করেছিল "রানি বললো, কোনো বাদশাহ যখন কোনো শহরে ঢুকে পড়ে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে এবং সেখানকার মর্যাদাবানদেরকে লাঞ্ছিত করে, এ রকম কাজ করাই তাদের রীতি" (সুরা নামল, ২৭: ৩৪)।

মহিলাদের প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ

মহিলাদের সংসদ বা আইন সভায় প্রবেশের অবৈধতার প্রবক্তাগণ দলিল-প্রমাণ হিসেবে যা উল্লেখ করে থাকেন তার আরেকটি হলো যে, মহিলারা সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে যেমন: মাসিক ঋতুস্রাব ও তার ব্যথা-বেদনা, গর্ভধারণ ও এর রোগ-ব্যাধি, প্রসব ও এর সুবিধা-অসুবিধা, দুগ্ধ পান ও এর সমস্যাবলী এবং মাতৃত্ব ও এর দায়-দায়িত্ব ... ইত্যাদির কারণে মহিলারা সাধারণত দৈহিক, মানসিক ও বিবেক-বুদ্ধির দিক থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে আইন-কানুন প্রণয়ন কিংবা সরকারের পর্যালোচনা ইত্যাদি দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

আমরা বলব হ্যাঁ, এটি সঠিক, স্বাভাবিকভাবেই সকল মহিলা সংসদ সদস্যের দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত নয়। মাতৃত্ব ও এর দায়-দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত নারী কখনো নিজেকে সংসদ নির্বাচনের লড়াইয়ে জড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছুক হবে না। যদি সে এমনটি করে থাকে তাহলে নারী-পুরুষ সকলের উচিত তাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করা এবং তাকে না বলা, তোমার সন্তান-সন্ততি বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য।

কিন্তু যে মহিলা মাতৃত্বের দায়-দায়িত্বে ব্যস্ত নয়, যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং তাঁর অতিরিক্ত সময়-সুযোগ, বিদ্যা-বুদ্ধি এবং মেধা ও মননশীলতা রয়েছে, কিংবা যে

মহিলা পঞ্চাশ বা এর নিকটবর্তী বয়সে পা দিয়েছে এবং তাকে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় না, ছেলে-মেয়েদের বিবাহ ইত্যাদি দায়িত্ব থেকেও সে মুক্ত, বয়সের পরিপক্কতা ও অভিজ্ঞতার থলেও যথেষ্ট পরিপূর্ণ এবং জনজীবনের সাধারণ দায়-দায়িত্ব পালনে তার যথেষ্ট সময়-সুযোগ রয়েছে এমন মহিলার সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে সমস্যা কোথায়, যদি এ ক্ষেত্রে অন্যান্য শর্তাবলী থেকে সে পিছিয়ে না থাকে, যা একজন প্রার্থীর মধ্যে থাকা আবশ্যক, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী?

আয়াত: "তোমরা নিজেদের গৃহমধ্যে অবস্থান করো"

মহিলাদের সংসদে প্রবেশের অবৈধতার ক্ষেত্রে কখনো এ আয়াতের মাধ্যমে দলিল পেশ করা হয় "তোমরা নিজেদের গৃহমধ্যে অবস্থান করো" (সূরা আহযাব, ৩৩: ৩৩)। ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে পর্যালোচনা করেছি এবং এর সাথে যোগ করে আরো বলব: এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, এ আয়াতে নবির সা. স্ত্রীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াত সংশ্লিষ্ট অবস্থা থেকে এমনটি বোঝা যাচ্ছে। আর নবির সা. স্ত্রীদের জন্য রয়েছে বিশেষ বিধি-বিধান, যেমন তাদের কেউ কোনো অপরাধকার্যে লিপ্ত হলে দ্বিগুণ শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, এমনিভাবে কোনো ভালো ও সৎ কাজ করলে দ্বিগুণ প্রতিদানের অধিকারী হবে। আর রসুলের ইন্তিকালের পর তাদের বিবাহ করা হারাম। এ ধরনের বিধি-বিধানের উল্লেখ করতে গিয়ে কুরআন কারিমে বলা হয়েছে "হে নবির স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও..." (সূরা আহযাব, ৩৩: ৩২)।

তাইতো বর্তমান সময়ে মুসলমানগণ জ্ঞান অর্জনের জন্য মহিলাদের ঘর থেকে বের হয়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার বৈধতা প্রদান করেছে। শরিয়ত প্রদত্ত সীমারেখার প্রতি লক্ষ্য রেখে মহিলারা প্রয়োজনে বাজারে, দোকান-পাটে কাজ করতে পারবে, ঘরের বাইরে গিয়ে শিক্ষিকা, ডাক্তার কিংবা নার্সিং ইত্যাদি বৈধ কার্যাবলী আঞ্জাম দিতে পারবে।

তাই দেখা যায় "তোমরা নিজেদের গৃহমধ্যে অবস্থান করো", এ আয়াতটি মুমিন জননী, মুসলিম জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আইনবিদ হজরত আয়েশাকে রা. ঘর থেকে বের হতে বাধা দেয়নি। তিনি তাঁর গৃহ থেকে বের হয়েছেন, তথা মদিনা থেকে বের হয়ে একটি সেনাদলের নের্তৃত্ব দিয়ে বসরার উদ্দেশ্যে রওনা হন, যে সেনাদলে অধিক সংখ্যক সাহাবিরা ছিল, তাদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মধ্য থেকে দু'জন ছিল যারা খেলাফতের জন্য মনোনীত ছয় সদস্যবিশিষ্ট শুরার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা হলেন তালহা ও জুবাইর রা.। হজরত আয়েশা যা সত্য ও সঠিক মনে

করেছিলেন তা বাস্তবায়নের দাবি নিয়ে বের হয়েছিলেন, তা ছিল হজরত উসমানের হত্যার কিসাস আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসা।

এভাবে বের হওয়ার কারণে তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন বলে যে কথা প্রচলিত হয়ে আসছে, তা মূলত এ জন্য নয় যে তার এভাবে বের হওয়া অবৈধ ছিল; বরং তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন অন্য একটি কারণে, তা হচ্ছে তাঁর দাবি কিংবা উপর্যুক্ত সে বিষয়ে তার ইজতেহাদ তথা চিন্তা-ভাবনা ভুল ছিল।

মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার চর্চা যারা অবৈধ বলেন তাদের কতিপয় "তোমরা নিজেদের গৃহমধ্যে অবস্থান করো" এ আয়াতকে সার্বিক ব্যাপকতর দলিল হিসেবে গ্রহণ করে একান্ত প্রয়োজনীয় অবস্থা ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া অবৈধ বলেন, এমনকি স্কুল, কলেজ ইত্যাদিতে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা বন্ধ করে দেন! সুতরাং তারা যদি ভোটাধিকার প্রয়োগ তাদের জন্য অবৈধ মনে করেন তাহলে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই!

এ ভাবে তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ তথা জন-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানে মুসলিম জাতির অর্ধেকাংশকে অকেজো অবস্থায় দেখতে চান। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় এভাবে মূলত সৎকর্মশীল ও ইসলামি শিবিরের মহিলাদেরকে ভোটাধিকার প্রদান থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়, যখন ইসলাম বিরোধী শিবিরের, সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারী মহিলারা তাদের ভোটাধিকারের শতভাগ প্রদান করে যাচ্ছে।

এ সকল লোকেরা ভুলে যাচ্ছে যে, উপর্যুক্ত আয়াতের অবশিষ্টাংশ এ দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করছে যে, জাহেলিয়াতের সাজ-সজ্জা পরিহার করে লজ্জাশীলতা ও শালীনতাকে আঁকড়ে ধরে মহিলারা প্রয়োজনে তাদের ঘর থেকে বের হতে পারবে। সাজ-সজ্জা থেকে নিষেধ করা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তা অবশ্যই ঘরের বাইরে হবে; কারণ মহিলাদের গৃহ অভ্যন্তরে সাজ-সজ্জা করতে কোনো বিধি-নিষেধ নেই। সুতরাং জাহেলিয়াতের নিষিদ্ধ সাজ-সজ্জা দ্বারা গৃহের বর্হিভাগেই তা করা উদ্দেশ্য।

হাদিস : ওই জাতি সফল হতে পারে না যাদের নেতৃত্বে থাকে মহিলা

মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান কিংবা সংসদ সদস্যের জন্য তাদের প্রার্থীতা অবৈধকরণের ক্ষেত্রে অপর যে একটি দলিলের উপর নির্ভর করা হয় তা হচ্ছে আবু বাকরাহ রা. বর্ণিত হাদিস, যা ইমাম বুখারিসহ আরো অনেকেই বর্ণনা করেছেন। রসুলের সা. কাছে যখন সংবাদ পৌঁছল যে, পারসিক জাতি তাদের সম্রাট কিসরার মৃত্যুর পর তার কন্যাকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে তখন তিনি বলেন "ওই জাতি কখনো সফল হতে পারবে না যাদের নেতৃত্বে থাকে মহিলা"।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়

প্রথমত: উপর্যুক্ত হাদিসটিকে সার্বিক ও ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করা হবে, না-কি প্রেক্ষাপটের সাথে এটি সীমাবদ্ধ থাকবে? অর্থাৎ রসুল সা. পারসিক জাতির অকল্যাণ ও ব্যর্থতার সংবাদ দিয়েছিলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে যাদের উপর এ বিধান চেপে বসেছিল যে, সম্রাট তনয়াই তাদেরকে শাসন করবে, যদিও জাতির মধ্যে তার সমকক্ষ কিংবা তার থেকে শতগুণ যোগ্য কেউ থাকে?

হ্যাঁ, ইসলামি আইনবিদদের অধিকাংশের মতামত হচ্ছে 'শব্দের ব্যাপক ও সার্বিক অর্থই গ্রহণযোগ্য হবে, প্রেক্ষাপট সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে তা সীমাবদ্ধ থাকবে না', কিন্তু সর্বসম্মত মত নয়। ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রয়োজনে প্রেক্ষাপট সংশ্লিষ্ট অর্থই শুধুমাত্র বিবেচিত হবে, অন্যথায় ভুল অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ থেকে যায়। যেমনিভাবে খারেজি সম্প্রদায়সহ আরো অনেকেই ভুলের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে, মুশরিকদের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে তারা মুমিনদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে।[৩১]

সুতরাং মূল ভাষ্য থেকে অর্থ গ্রহণের আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট, বিশেষ করে হাদিস বর্ণনার প্রেক্ষাপট অবশ্যই বিবেচিত হবে। আয়াত বা হাদিসের শব্দকে সর্বদা সার্বিক ও ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করতে হবে, এটি সর্বজন স্বীকৃত কোনো মূলনীতি নয়।

উপর্যুক্ত হাদিসের দিকে দৃষ্টিপাতে এটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যদি হাদিসটিকে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তা কুরআনের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। কুরআন কারিমে তো এমন মহিলার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যে তার জাতিকে উত্তমভাবে পরিচালনা করেছিল, আদল-ইনসাফের সাথে তার জাতির শাসনকার্য চালিয়ে আসছিল এবং বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাথে তাদের যাবতীয় বিষয় আঞ্জাম দিয়ে আসছিল। এমনকি তার বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার কারণে তার জাতির লোকেরা অবশ্যম্ভাবী একটি যুদ্ধকে এড়াতে সক্ষম হয়েছিল, জান-মালের ক্ষতি ব্যতীত যা তাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনত না। তদুপরি সে শুরা তথা পরামর্শসভার মাধ্যমেই শাসনকার্যের যাবতীয় বিষয় আঞ্জাম দিত। "রানি বললো, হে জাতীয় নেতৃবৃন্দ! আমার উদ্ভূত সমস্যায় তোমরা পরামর্শ দাও, তোমাদের বাদ দিয়ে তো আমি কোনো বিষয়ের ফায়সালা করি না" (সুরা নামল, ২৭: ৩২)। কিন্তু

[৩১] ইমাম শাতেবীর 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে 'কুরআন' সংক্রান্ত আলোচনায় এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। দেখুন : আমাদের রচনা : (আমরা কুরআন কিভাবে অধ্যয়ন করব?)

তা সত্ত্বেও তার সভাসদরা তার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে তারই উপর যাবতীয় বিষয় ছেড়ে দিয়েছিল: "তারা জবাব দিল আমরা শক্তিশালী ও যোদ্ধা জাতি, তবে সিদ্ধান্ত আপনার হাতে, আপনি নিজেই ভেবে দেখুন আপনার কি আদেশ দেওয়া উচিত" (সুরা নামল, ২৭: ৩৩)।

উপর্যুক্ত মহিলা হচ্ছে সাবা' সম্প্রদায়ের রানি 'বিলকিস', কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সুলাইমানের আ. সাথে সৃষ্ট তার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। অবশেষে সে মহিলার এ কথার মাধ্যমে ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল "হে আমার রব! (আজ পর্যন্ত) আমি নিজের উপর বড়ই জুলুম করেছি এবং এখন আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আনুগত্য গ্রহণ করছি" (সুরা নামল, ২৭: ৪৪)। এভাবে সে তার জাতিকে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণের দিকে টেনে এনেছিল।

আমাদের পারিপার্শ্বিক বাস্তব অবস্থাও এ দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে যে হাদিসটি ব্যাপক ও সার্বিক অর্থে নয়; বরং তা প্রেক্ষাপটের সাথে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে আমরা দেখি যে অধিক সংখ্যক মহিলা এমন আছে যে, দেশের জন্য তারা অনেক পুরুষদের থেকেও উত্তম।

দেশের জন্য কল্যাণকর এ সকল মহিলাদের কতিপয় এমনও আছে যে, রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক যোগ্যতা, উপযুক্ততা ও দক্ষতায় এরা অনেকাংশে আরব ও মুসলিম শাসকদের চেয়ে এগিয়ে আছে।

দ্বিতীয়ত: ইসলামি আইনবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মহিলাদের জন্য শাসন ক্ষমতার সর্বোচ্চ দায়িত্বভার গ্রহণ তথা ইসলামি খেলাফাতের প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কেই হাদিস এসেছে এবং হাদিস বর্ণনার প্রেক্ষাপটও এ দিকে নির্দেশনা দিচ্ছে। হাদিসের মধ্যস্থ "ওল্লাও আমরাহুম", অপর বর্ণনায় "তামলিকুহুম ইমরা'তুন" ইত্যাদি শব্দাবলী এ দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করছে। আর এটি তখনি প্রযোজ্য হবে যদি মহিলা মুসলিম জাহানের খলিফার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্কের হাতে মুসলিম খেলাফতের ধ্বংস হওয়ার পর থেকে এর আর কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং মহিলা খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের চিন্তা এখন অবাস্তব।

অবশ্যই কতিপয় আইনবিদ মহিলাদের রাষ্ট্রীয় পদ গ্রহণ কিংবা সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণকে এর সাথে তুলনা করে থাকেন, যেখানে জাতির উপর তার ইচ্ছার বাস্তবায়ন হয়ে থাকে, তার কোনো আদেশ-নিষেধ প্রত্যাখ্যাত হয় না এবং তার আদেশ ব্যতীত কোনো বিষয় চূড়ান্ত হয় না। এভাবেই প্রকৃতপক্ষে সে তার জাতির

সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে পড়ে, জাতির সার্বিক বিষয় তার হাতে এসে পড়ে এবং সকল কিছু তার হুকুমের গোলামে পরিণত হয়।

অনেকে অবশ্যই এখানে এর বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন। তারা মনে করেন যে, বর্তমানের রাষ্ট্রপ্রধানের বা সরকার প্রধানে দায়িত্ব মূলতঃ অতীত ইতিহাসের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন- মিশর, সিরিয়া, হিজাব এবং ইয়ামেন ইত্যাদির গভর্নরের দায়িত্বের পর্যায়ে। কিন্তু ইমামাত কিংবা খেলাফতের দায়িত্ব বর্তমানের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকার প্রধানের দায়িত্বের পর্যায়ে হবে কি-না? এ বিষয়ে বিপরীতধর্মী একাধিক মত রয়েছে। সর্বোপরি বিষয়টি ইজতেহাদ তথা চিন্তা-গবেষণার দাবি রাখে। সুতরাং মহিলার প্রয়োজনীয় শর্তাদির আলোকে মন্ত্রী, বিচারক কিংবা চার্টার একাউন্ট ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করতে পারবে। হজরত উমর শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ আল-আদাওয়ীয়্যাহ নামক এক মহিলাকে বাজার দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সুতরাং এতো এক ধরনের সার্বিক কর্তৃত্ব প্রদানেরই নামান্তর।

পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সমাজের অবস্থা এবং এর উন্নতি ও পরিবর্তনকে সামনে রেখে এ বিষয়ে পর্যায়ক্রমিকতার ধারা অনুসরণ করতে হবে। মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন পদে বা দায়িত্বে পর্যায়ক্রমে তাদেরকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। যেমন প্রথমে পারিবারিক পর্যায়ে, পরর্তীতে নাগরিক বা বেসামরিক পর্যায়ে ... এভাবে ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থাপনা প্রবর্তিত বর্তমান সমাজে যখন কোনো মহিলাকে মন্ত্রণালয়, প্রশাসন কিংবা আদালত ইত্যাদিতে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, এর দ্বারা কখনো এর অর্থ গ্রহণ করা হয় না যে, তাকে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী বানিয়ে দায়িত্বের পুরো লাগাম তার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবতার স্বাক্ষ্য হচ্ছে বর্তমান সময়ে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব হচ্ছে সমষ্টিক এবং সম্মিলিত। বিভিন্ন সংস্থা, কমিটি ও নানাবিধ ব্যবস্থাপনায় এ দায়িত্বের আঞ্জাম দেওয়া হয়। সুতরাং মহিলারাও অন্যান্যদের সাথে এ দায়িত্বের একটি অংশ আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

আমরা জানি বৃটেন, ভারত ও ফিলিস্তিনে যে সকল মহিলারা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিল তা বাস্তবে এবং কল্পনায় কখনো জাতির উপর মহিলার শাসন ছিল না; বরং তা ছিল বিভিন্ন সংস্থা, কমিটি কিংবা শাসনতান্ত্রিক বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার শাসন, যদিও তার শীর্ষভাগে রয়েছ মহিলা! এককভাবে প্রধানমন্ত্রী নয়; বরং মন্ত্রিপরিষদই যৌথভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। এমনিভাবে সংসদ কিংবা পরামর্শ সভা বা মন্ত্রীসভা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকে।

সুতরাং মহিলাই সার্বিকভাবে এমন কোনো শাসক নয় যে তার কথার নড়-চড় করা যাবে না কিংবা তার কোনো আবেদন বা নির্দেশ প্রত্যাখ্যাত হবে না। সে শুধুমাত্র একটি দলের নেতৃত্ব থাকে, অন্যেরা যার মোকাবিলা করে থাকে। কখনো সে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে দারুণভাবে পরাজিত হয়। যেমনটি হয়েছিল ভারতের ইন্দিরার কপালে, নিজের ভোট ব্যতীত সে দলের অন্য কারো ভোট পায় নি। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতার সামনে যখন সে মার খেয়ে যায় তখন মতামত সাধারণ মানুষের মতামততুল্য হয়ে পড়ে। মুসলিম দলসমূহে আজকাল প্রায় ইজমা হয়েছে যে তারা প্রধানমন্ত্রীসহ সকল পদে দায়িত্বপালন করতে পারে। বিশেষ করে ইসলাম যদি বা গণতান্ত্রিক বা পরামর্শ ভিত্তিক হয়।*

* সম্পাদক

অনৈসলামিক সরকারের সাথে কোয়ালিশন

প্রশ্ন: কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমান ব্যক্তি বা সংগঠনের জন্য কি এটি বৈধ হবে যে, অনৈসলামিক কোনো শাসনের সাথে কোয়ালিশন করবে? হোক তা বেসামরিক শাসন কিংবা সামরিক? রাজতন্ত্র হোক কিংবা প্রজাতন্ত্র? গণতন্ত্র হোক কিংবা স্বৈরতন্ত্র? লিবারেল হোক কিংবা সমাজতান্ত্রিক? প্রত্যক্ষভাবে সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারী হোক কিংবা বাহ্যিকভাবে ধর্মের আবরণে আবৃত অথবা এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থানধারী? এখানে কোয়ালিশনের অর্থ হচ্ছে কোনো রাজনৈতিক দায়িত্ব বহন করা, যেমন কোনো মন্ত্রণালয় কিংবা স্টেট গভর্নর ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের রাজনৈতিক পর্যায়ের দায়িত্ব। এ বিষয়ে বিস্তারিত সমাধান কামনা করছি। স্বয়ং ইসলাম পন্থীরাও এ বিষয়ের বৈধতা ও অবৈধতার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। ইসলামি আইনবিদ ও চিন্তাবিদগণও এ বিষয়ে একাধিক মত পোষণ করে চলছেন। তাদের কেউ একে বৈধ, আবার কেউ অবৈধ বলেছে। আবার কতিপয়ের মতে এ ধরনের বিধান সাধারণত ব্যাখ্যামূলক হয়ে থাকে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর আশু সমাধানের দাবি রাখে যাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সবাই একটি আলোর পথ দেখতে পায়। বিশেষ করে একাধিক দেশে কতিপয় ইসলামপন্থীরা ইতোমধ্যে তাদের দেশে চলমান শাসন ব্যবস্থার সাথে কোয়ালিশন করে চলছে। যেমন- জর্দান, ইয়ামেন এবং সর্বশেষ তুরস্ক। এদের কোনটি প্রত্যক্ষভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্র যেমন- তুরস্ক, আবার কোনোটি এরূপ প্রত্যক্ষভাবে সেক্যুলারিজমের পতাকাবাহী নয়; বরং সংবিধান অনেকটা ইসলামি শাসন ব্যবস্থার কাছাকাছি, যেমন ইয়ামেন। এ সকল ইসলামপন্থীরা কি পথচ্যুত হয়ে পড়েছে, না-কি এটি তাদের ইজতেহাদ তথা চিন্তা-গবেষণা, যেখানে ভুল করারও সুযোগ রয়েছে? অর্থাৎ এ বিষয়টি কি সম্ভাব্য বিধান সম্বলিত ইজতেহাদযোগ্য বিষয়, না-কি তা সুস্পষ্ট বিধান সম্বলিত বিষয়ে, যা অবৈধ এবং যেখানে ইজতেহাদের কোনো অবকাশ নেই? যেমনটি বলে থাকেন কতিপয় আবেগপ্রবণ অতি উৎসাহী ইসলামি ব্যক্তিগণ এবং যাদের উৎসাহ ও আবেগের মাধ্যমে প্রভাবান্বিত হয়ে যুবকদের একটি দলও প্রত্যাখ্যানের এ মূলনীতি গিলতে শুরু করেছে, যার মূল দর্শন হচ্ছে চারিদিকে সৃষ্ট নতুন যে কোনো বিষয়ই ইসলামে প্রত্যাখ্যাত!? সময়ের ব্যবধানে অবশেষে যা তাদেরকে সহিংসতার দিকেই টেনে নিয়ে যায়।

সুতরাং আমরা আপনার দরবারে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে শরিয়তের যুক্তি-প্রমাণসহ বিস্তারিত সমাধানের আরজ করছি, যেমনটি আপনার কাছ থেকে পেয়ে থাকি।

ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ আপনাকে ভালো ও উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন॥

(জর্দানের কতিপয় ধর্মপ্রাণ মুসলিম যুবক)

মৌলিক বিধান হচ্ছে কোয়ালিশন না করা

জবাব: নিঃসন্দেহে উল্লেখিত বিষয়ে মৌলিক বিধান হচ্ছে যে শাসন ব্যবস্থায় কোনো মুসলিম ব্যক্তি তার উপর অর্পিত মিশন তথা মন্ত্রণালয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় এবং তার ঈমানের দাবি অনুযায়ী কোন বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আদেশ-নিষেধ ইত্যাদির বিপরীত কিছু করতে বাধ্য হয় না, শুধুমাত্র এ জাতীয় শাসন ব্যবস্থার সাথে কোয়ালিশন করা বৈধ হবে। অন্যথায় কোনো শাসন ব্যবস্থার সাথে কোয়ালিশন করা বৈধ হবে না। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়"। (সুরা আহযাব, ৩৩: ৩৬) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে "রসুলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের ভয় করা উচিত যেন তারা কোনো বিপর্যয়ের শিকার না হয় অথবা তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব না এসে পড়ে" (সুরা নূর, ২৪: ৬৩)।

শাসনব্যবস্থা যদি অনৈসলামিক হয়, অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থায় জীবনের সকল ক্ষেত্র তথা আইন প্রণয়ন, শিক্ষা সংস্কৃতি, প্রশিক্ষণ, মিডিয়া, প্রশাসন, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামি জীবনব্যবস্থা ও ইসলামি বিধি-বিধান বাস্তবায়নের কেন অঙ্গীকার থাকে না, বরং ইসলাম ব্যতীত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে আগত বিভিন্ন উৎস থেকে যাবতীয় বিধি-বিধান নেওয়া হয়ে থাকে, তা ডানপন্থীও হতে পারে আবার বামপন্থীও হতে পারে, যেমন লিবারেল দর্শন কিংবা মার্কসবাদী দর্শন ইত্যাদি, কিংবা কতিপয় বিধি-বিধান ইসলাম থেকে নেওয়া হয়ে থাকে এবং এর সাথে অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন বিধি-বিধানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধানের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, এ জাতীয় সকল কিছুই ইসলামে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যাত। ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে একজন মুসলমান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত যাবতীয় বিধি-বিধানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে। ইসলামের বিধানের সাথে অন্য কিছুকে সংমিশ্রণ করা কিংবা এর কিয়দাংশ মেনে চলা, আবার কিছু বিধান প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদি কখনো

বৈধ হতে পারে না। যেমনটি আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রসুলকে উদ্দেশ্য করে বলেন "হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করে এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না। সাবধান হয়ে যাও, এরা যেন তোমাকের ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করে সেই হেদায়াত থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত করতে না পারে, যা আল্লাহ্ তোমার প্রতি নাজিল করেছেন। যদি এরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ্ এদের কোন কোন গুনাহের কারণে বিপদে ফেলার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। আর যথার্থই এদের অধিকাংশ ফাসেক তথা পাপাচারী" (সুরা মায়েদা, ৫: ৪৯)।

কুরআন বনি ইসরাইলকে কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ করেছে, যারা তাদের ধর্মগ্রন্থের কতিপয় বিধানের অনুসরণ করেছিল এবং কতিপয় বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তাহলে কি তোমরা কিতাবের একটি অংশের উপর ইমান এনেছে এবং অন্য অংশের সাথে কুফরি করছো? তারপর তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যদুস্ত হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে? তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহ্ বেখবর নন। এই লোকেরাই আখেরাতে বিনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। কাজেই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তারা কোনো সাহায্যও পাবে না" (সুরা বাকারা, ২: ৮৫-৮৬)।

শাসনকার্য থেকে আল্লাহর শরিয়াহকে বিতাড়নের জন্য সর্বপ্রথম দায়ী হবে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান, তা রাজা, প্রজাতন্ত্র প্রধান কিংবা সামরিক শাসক যে কেউ হতে পারে। অতঃপর যারা সরকারকে সহযোগিতা করবে প্রত্যেকেই সহযোগিতার সমপরিমাণ অপরাধে অপরাধী হবে। কুরআন শুধুমাত্র ফেরাউনের জন্য শাস্তি বরাদ্দ করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং তার সাথে তার সেনাবাহিনীর জন্যও দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি বরাদ্দ করেছে। যেভাবে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন "যথার্থই ফেরাউন, হামান ও তার সৈন্যরা ছিল বড়ই অপরাধী" (সুরা কাসাস, ২৮: ৮)। অপর আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে "আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সাগরে নিক্ষেপ করলাম। এখন এ জালেমদের পরিণাম কি হয়েছে দেখে নাও। তাদেরকে আমি জাহান্নামের দিকে আহবানকারীদের নেতা করেছিলাম এবং কিয়ামতের দিন তারা কোথাও কোনো সাহায্য লাভ করতে পারবে না। এ দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে বড়ই ঘৃণার্হ ও ধিকৃত" (সুরা কাসাস, ২৮: ৪০-৪২)।

বরং কুরআন কারিমে দেখা যায়, যে সকল জাতি তাদের অত্যাচারী, জালিম ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের সহযোগিতা দিয়েছে, শাসকগোষ্ঠীর সাথে তাদেরকেও অপরাধ ও শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অংশীদার করা হয়েছে।

নূহের আ. জাতির প্রতি নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করে কুরআন কারিমে বলা হয়েছে "নূহে বললো হে প্রভু, তারা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ওই সব নেতার অনুসরণ করেছে যারা সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পেয়ে আরো বেশি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে" (সুরা নূহ, ৭১: ২১)।

হুদের আ. জাতি আ'দ সম্প্রদায়ের নিন্দা করে বলা হয়েছে "এ হচ্ছে আদ, নিজের রবের নিদর্শন তারা অস্বীকার করেছে, নিজের রসুলদের কথাও অমান্য করেছে এবং প্রত্যেক স্বৈরাচারী সত্যের দুশমনের আদেশ মেনে চলেছে" (সুরা হুদ, ১১: ৫৯)।

ফেরাউনের জাতির নিন্দা করে বলা হয়েছে "তারা ফেরাউনের নির্দেশ মেনে চললো। অথচ ফেরাউনের নির্দেশ সত্যাশ্রয়ী ছিল না। কিয়ামতের দিন সে নিজের কওমের অগ্রবর্তী হবে এবং নিজের নেতৃত্বে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। অবস্থানের জন্য কেমন নিকৃষ্ট স্থান সেটা!" (সুরা হূদ, ১১: ৯৭, ৯৮)।

কুরআনের অপর এক স্থানে বলা হয়েছে "সে (ফেরাউন) তার জাতিকে হালকা ও গুরুত্বহীন মনে করেছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল ফাসেক" (সুরা যুখরুফ, ৪৩: ৫৪)।

সুতরাং যে কোনো কাজ, যা ফেরাউন তথা জালিম ও স্বৈরাচারী শাসকের খেদমতে পেশ করা হয়ে থাকে তা ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ এবং নিষিদ্ধ, কারণ ইসলামি শরিয়ত ভালো ও কল্যাণের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে এবং গোনাহ ও পাপাচারের কাজে অসহযোগিতা করতো নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন "নেকি ও আল্লাহভীতির সমস্ত কাজে সবার সহযোগিতা করো এবং গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না" (সুরা মায়েদা, ৫: ২)।

নেকি ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতার যেমনি স্তর রয়েছে তেমনি গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতারও স্তর রয়েছে। সুতরাং ভালো কিংবা অপরাধের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই স্বীয় স্তর মোতাবেক প্রতিদান কিংবা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন "তোমরা জালেমদের দিকে মোটেই ঝুঁকবে না, অন্যথায় জাহান্নামের গ্রাসে পরিণত হবে এবং তোমরা এমন কোনো পৃষ্ঠপোষক পাবে না যে আল্লাহর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আর কোথাও থেকে তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য পৌছবে না" (সুরা হূদ, ১১: ১১৩)।

উপর্যুক্ত আয়াতস্থ 'আর রুকুন' অর্থ হচ্ছে ঝুঁকে পড়া। সুতরাং কোনো মুসলমানের ঝোঁক, কিংবা আবেগ-অনুভূতি কখনো জালিমদের সাথে থাকা বৈধ হবে না। অন্যথায় সে জাহান্নামের খোরাকে পরিণত হবে এবং আল্লাহর সাহায্যে ও সমর্থন সব হারাবে। সুতরাং যেখানে ঝুঁকে পড়া বৈধ নয়, সে ক্ষেত্রে বৈষয়িক সাহায্যে-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কি হুকুম হতে পারে? মুসলমানদের কতিপয় পূর্বপুরুষ এ ব্যাপারে কঠোর ভাষায় সাবধান করে গেছেন।

শরিয়তের বিভিন্ন মূলনীতির বিবেচনায় মৌলিক বিধান থেকে সরে আসা

জালিম-অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতা অবৈধতার যে বিধান উপরে বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে এ ক্ষেত্রে শরিয়তের মৌলিক, স্বাভাবিক ও সার্বজনীন বিধান। কিন্তু কখনো পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন মূলনীতির বিবেচনায় মৌলিক ও স্বাভাবিক বিধান থেকে সরে আসার সুযোগ রয়েছে, তবে এ সরে আসার পরিমাণও শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হতে হবে।

এ ক্ষেত্রে বিবেচনাধীন বিষয়াবলী হচ্ছে-

যথাসাধ্য জালেমের জুলুমের হাতকে গুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করা

১-যে ব্যক্তি কোনো উপায়ে জুলুম, অন্যায়, অবিচার, পাপাচার ইত্যাদি রোধ করতে কিংবা এর গণ্ডিকে সংকুচিত করতে সক্ষম হয় তাকে মজলুমের সাহায্যার্থে, অসহায়ের সহায়তা দানে কিংবা কমপক্ষে জুলুমের পরিধিকে কমিয়ে আনতে সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তোমাদের সাধ্যানুযায়ী" (সুরা তাগাবুন, ৬৪: ১৬)। রসুল সা. বলেন "আমি যখন তোমাদের কোনো কাজের নির্দেশ দেই তোমরা তা করবে যতটুকু তোমাদের সাধ্যের অনুকূলে থাকে"। (বুখারি ও মুসলিম) আল্লাহা তায়ালা আরো ইরশাদ করেন "আল্লাহ মানুষের উপর তাদের সাধ্যাতীত কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না" (সুরা বাকারা, ২: ২৮৬)। ইতিহাস অধ্যায়নে আমরা দেখি ইথিওপিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী রসুলের সা. সময়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার রাজত্বে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি; করণ যদি তা করতে অগ্রসর হতেন তাহলে তার জাতি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করত এবং রসুলের সা. এ ব্যাপারে তাকে কোনো প্রকার নিন্দাবাদ করেননি।

সুতরাং কোনো বস্তু থাকবে কিংবা থাকবে না, অথবা কোনো বিষয় হয় বৈধ হবে অন্যথায় অবৈধ হতে বাধ্য, মধ্যখানে কোনো কিছু নেই, এ ধরনের দর্শন ইসলামি শরিয়তে এবং বাস্তবেও প্রত্যাখ্যাত।

অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকে আলিঙ্গন করা

২-ইসলামি শরিয়তের বিধান হচ্ছে দু'ধরনের ক্ষতি যদি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তাহলে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকে আলিঙ্গন করে বড় ধরনের ক্ষতিকে প্রতিহত করতে হবে। এমনিভাবে দু'ধরনের কল্যাণ যদি বিপরীতমুখী হয়ে পড়ে তাহলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প কল্যাণকে পরিহার করে বেশি কল্যাণ অর্জনের পথকে সুগম করতে হবে। তাই ইসলামি আইনবিদগণ অন্যায় দেখেও চুপ থাকার বৈধতা দিয়েছেন যদি এর প্রতিরোধ; এর থেকেও বড় অন্যায়কে আবশ্যক করে তোলে। এর পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ স্বরূপ তারা হজরত আয়েশা বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করে থাকেন যা রসুল সা. তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন "যদি তোমার জাতির ইসলামের বয়স কম না হতো, তাহলে আমি কাবা ঘরকে ভেঙে ইব্রাহীমের আ. ভিত্তির উপর পুণর্নির্মাণ করে দিতাম" (মুত্তাফাকুন ইলাইহি)।

কাবা ঘরের ভিত্তি পরিবর্তনে মানুষের মধ্যে ফিতনা তথা বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে এ আশঙ্কায় রসুল সা. যা আবশ্যক মনে করেছেন তা করা থেকে বিরত থেকেছেন; কারণ তখনো পর্যন্ত ইসলামে তাঁর জাতির লোকদের কদম মজবুত হয়ে ওঠেনি, তাদের ইসলামের বয়স খুবই স্বল্প এবং তখনো জাহেলিয়াতের চিন্তা-ভাবনা তাদের অন্তর থেকে পুরোপুরি দূর হতে পারেনি।

উক্ত বিধানের যুক্তি-প্রমাণস্বরূপ আমি এখানে কুরআনে বর্ণিত মুসার আ. ঘটনা স্মরণ করতে চাই। যখন তিনি ত্রিশ দিনের জন্য তাঁর প্রভুর দিদার লাভের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, অতঃপর আরো দশ দিন পূর্ণ করে পুরো চল্লিশ দিন তার প্রভুর সাক্ষাত লাভে ধন্য হলেন। ইতোমধ্যে তার অনুপস্থিতিতে সামেরী একটি স্বর্ণের গো-বৎস নির্মাণ করে তাঁর জাতিকে পথভ্রষ্ট করে চলছিল এবং তাদেরকে বলেছিল, এটিই তোমাদের এবং মুসার প্রভু। তাঁর জাতির লোকেরা ওইলোকটির কথা বিশ্বাস করে তাকে অনুসরণ করে চলছিল। মুসার আ. ভাই হারুন আ. তাদেরকে এ বলে সাবধান করেছিলেন "হারুন তাদেরকে বলেছেন, হে লোকেরা! এর কারণে তোমরা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তোমাদের রব তো করুণাময়, কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার কথা মেনে নাও। কিন্তু তারা তাঁকে বলে দিলো, মূসা না আসা পর্যন্ত আমরা তো এর পূজা করতে থাকবো" (সুরা ত্বহা, ২০: ৯০-৯১)।

অতঃপর মূসা আ. ফিরে এসে তার জাতিকে এ অবস্থায় দেখে কঠিন রাগ করলেন এবং তাঁর জাতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা কত জঘন্য ও খারাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে! এরপর তিনি রাগে তার হাতের লিপিগুলো ফেলে দিলেন এবং তাঁর ভাইয়ের মাথা ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে আনলেন ও কঠিনভাবে তাঁকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, "মূসা আ. বললেন, হে হারুণ! তুমি যখন দেখলে এরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন আমার পথে চলা থেকে কিসে তোমাকে বিরত রেখেছিল? তুমি কি আমার হুকুম অমান্য করেছো? হারুন জবাব দিল, হে আমার সহোদর ভাই! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টেনো না। আমার আশঙ্কা ছিল, তুমি এসে বলবে যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং আমার কথা রক্ষা করোনি" (সুরা ত্বহা, ২০ঃ ৯২-৯৪)।

অর্থাৎ আল্লাহর নবি হারুন আ. তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জাতির কর্মকাণ্ডে নীরব থেকেছিলেন, যদিও তা ছিল সর্বনিম্ন খারাপ কাজ, যা ছিল গো-বৎস পূজা; কারণ তার চিন্তা-ভাবনা ছিল হয়তবা তাদের অপকর্মের প্রতিরোধ করতে গিয়ে জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি মূসার আ. অনুপস্থিতিতে জাতির ঐক্যবদ্ধতা ধরে রাখাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, হয়তোবা মূসা ফিরে আসলে দু'জনে চিন্তা-ভাবনা করে উক্ত সমস্যার উপযুক্ত সমাধান সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

সুউচ্চ মূলনীতি থেকে নিম্নতর বাস্তবতায় নেমে আসা

৩-জীবনে চলার পথেয় হিসেবে ইসলাম মানুষের জন্য কতিপয় মূল্যবোধ নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং ইসলামের দাবি হচ্ছে মানুষ এ সকল মূল্যবোধ অর্জনে সচেষ্ট থাকবে, এগুলোকে সর্বদা তাদের দৃষ্টিসীমার পরিধিতে আবদ্ধ রাখবে এবং তাকে করায়ত্ব করতে সর্বদা লালায়িত থাকবে। কিন্তু কখনো বাস্তবতার সামনে মানুষকে পরাজিত হতে হয়। তাই সর্বোচ্চ মূল্যবোধ অর্জনে অক্ষম হয়ে কখনো প্রয়োজনের চাপে মানুষকে একটু নিচে নেমে আসতে হয়। সর্বোচ্চ চূড়া আরোহণের কষ্টকর পথ ছেড়ে দিয়ে কখনো মানুষকে অপেক্ষাকৃত সহজতর পথ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

তাইতো শরিয়াহ স্বীকৃত সুপ্রসিদ্ধ মূলনীতি হচ্ছে :

'প্রয়োজন নিষিদ্ধ কাজগুলোকে বৈধ করে দেয়'

'যেখানেই অসহনীয় কষ্ট সেখানেই সহজতর পথ অবলম্বন করতে হবে'

'যেমনিভাবে নিজের ক্ষতি হতে দেওয়া যাবে না তেমনিভাবে অপরের ক্ষতিও হতে দেওয়া যাবে না'

'দুঃসাধ্য কষ্টকর বিষয়গুলো ইসলামি শরিয়তে প্রত্যাখ্যাত'।

কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন ও গবেষণায় উল্লেখিত বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। কুরআন কারিমে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা সহজ-সরল, হালকা, সহনীয় ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করেই মানুষের জন্য ইসলামের বিধি-বিধান জারি করেছেন, যেখানে যাবতীয় কষ্টকর বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যাত এবং যেখানে পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদা ও অত্যধিক প্রয়োজনের তাগিদ এ জাতীয় বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

যেমনটি আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন: "আল্লাহ্ তোমাদের সাথে নরম নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না" (সুরা বাকারা, ২: ১৮৫)। "এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজকরণ ও অনুগ্রহ" (সুরা বাকারা, ২: ১৭৮) "যে ব্যক্তি অক্ষমতার মধ্যে অবস্থান করে এবং এ অবস্থায় আইন ভঙ্গ করার কোনো প্রেরণা ছাড়াই বা প্রয়োজনের সীমা না পেরিয়ে এর মধ্য থেকে কোনটা খায়, সে জন্য তার কোনো গোনাহ্ হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়"। (সুরা বাকারা, ২: ১৭৩) "আল্লাহ তোমাদের উপর বিধি-নিষেধ হালকা করতে চান, আর মানুষকে তো দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে"। (সুরা নিসা, ৪: ২৮) "তিনি কাজের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি"। (সুরা হাজ, ২২: ৭৮) "যে ব্যক্তি ইমান আনার পর বাধ্য হয়ে কুফরি করে, তবে তার অন্তর ঈমানের উপর নিশ্চিন্ত থাকে (তাহলে তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পাকড়াও নেই)" (সুরা নাহল, ১৬: ১০৬)।

বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে রসুল সা. বলেন "তোমরা সহজ পথ বেছে নাও এবং কঠিন পথে অগ্রসর হয়ো না, সুসংবাদ বহন করো এবং দুঃসংবাদ এড়িয়ে চলো"[৩২]। "কঠিন কাজের জন্য নয়, বরং সহজ সরল কাজের জন্যই তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে"[৩৩]। "সহজ-সরল ও সহনীয় ধর্মই আল্লাহর কাছে অধিকতর পছন্দনীয়"।

ইসলামি আইনবিদগণ মুসলিম ব্যক্তি বা সমাজের জন্য বৈধতা দিয়েছেন যে, প্রয়োজনের নিরিখে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ বা মৌলিক বিধান থেকে বাস্তবতায় নেমে আসা যাবে। অন্যথায় সৃষ্টিকুলের পথগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, মানুষের অধিকার বিনষ্ট হয়ে পড়বে এবং পরিণামে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে বাধ্য হবে। যেমন সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ন্যায়পরায়ণতা মৌলিক শর্ত, কিন্তু যদি কোনো বিষয়ে

---

[৩২] মুত্তাফাকুন আলাইহি, হজরত আনাস থেকে বর্ণিত।

[৩৩] বুখারি, তিরমিজী ও নাসায়ি হজরত আবুহারাইরা থেকে 'তাহারাত' শীর্ষক অধ্যায়ে তা বর্ণনা করেন।

ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী পাওয়া না যায় তাহলে মৌলিক বিধান থেকে নেমে এসে ফাসেক তথা পাপাচারী ব্যক্তির সাক্ষী গ্রহণ করা বৈধ হবে, অন্যথায় হকদার ব্যক্তি তার হক থেকে বঞ্চিত হবে।

এভাবে মুজতাহিদ তথা চিন্তাবিদ ও গবেষক পর্যায়ের বিচারক যদি পাওয়া না যায়, যা বিচারকের পদ অলংকৃত করার জন্য মৌলিক শর্ত, তাহলে মৌলিক বিধান থেকে সরে এসে মুকাল্লিদ তথা অপরের মতামতের অনুসারী ব্যক্তিকে বিচারপতির দায়িত্ব অর্পণ করা বৈধ হবে। এমনিভাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রেও মৌলিক বিধান হচ্ছে মুজতাহিদ হওয়া, কিন্তু তারপরও প্রয়োজনে মুকাল্লিদকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অর্পণ করা বৈধ হবে। বরং প্রয়োজনে মূর্খ ব্যক্তিকেও রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া বৈধ হবে এ শর্তে যে, সে রাষ্ট্রপরিচালনায় জ্ঞানবানদের সহযোগিতা নিবে।

এমনিভাবে পাপাচারী শাসকের সাথে জিহাদ করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে, যদিও এ ক্ষেত্রে মৌলিক বিধান হচ্ছে সৎ শাসকের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা।

ইমাম আহমদকে জিজ্ঞেস করা হলো দু'জন শাসক একজন শক্তিশালী; কিন্তু পাপাচারী, অপর জন সৎ; কিন্তু দুর্বল, কার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা উত্তম হবে? তিনি উত্তর দিলেন প্রথম জন শক্তিশালী কিন্তু পাপাচারী, তার পাপকার্য তো নিজের জন্য; কিন্তু তার শক্তি তো মুসলমানদের কল্যাণ বয়ে আনবে। অপর জন তার সততা তো নিজের জন্য, কিন্তু তার দুর্বলতা তো মুসলমানদের অকল্যাণ বয়ে আনবে! সুতরাং শক্তিশালী শাসকের জিহাদে অংশ গ্রহণ করা উত্তম হবে, সে পাপাচারী হয়। তা হচ্ছে বিজ্ঞ ইমামের বাস্তবতা ভিত্তিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পর্যালোচনা।

মুসলমানদের বর্তমান বাস্তব অবস্থা এবং তারা যে দুর্বলতা, পশ্চাদপদতা এবং বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত শতধাবিভক্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করছে তার দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি এবং এর বিপরীতে মুসলমানদের শত্রু শিবির এবং তাদের শক্তি-সামর্থের দিক পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখব এ কঠিন বাস্তবতাই আমাদেরকে বাধ্য করছে যে, আমরা আমাদের দুর্বল অবস্থায় ওই সকল বিষয় গ্রহণ করব যেগুলো আমাদের সবল অবস্থায় আমরা প্রত্যাখ্যান করতাম। এমনিভাবে আমাদের শতধাবিভক্ত অবস্থায় আমরা এমন সকল বিষয়ে মেনে নিতে বাধ্য যা আমরা আমাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হতাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন "এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হাল্কা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, এখনো তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে"। (সুরা আনফাল, ৮: ৬৬)

সুতরাং উপর্যুক্ত আয়াত এ দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, দুর্বলতার কারণেই কোনো বিষয় সহজ ও হালকা করে দেওয়া হয়। যদিও মুসলমানদেরকে সর্বদা শক্তি-সামর্থ

অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে; দুর্বল মুমিন ব্যক্তির চেয়ে শক্তিশালী মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়।

কোনো ইসলামি দল যদি এককভাবে ক্ষমতায় আরোহণ করতে সক্ষম হয় (যেমনটি বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে বিরাজ করছে), তাহলে বাস্তবতা মেনে নিয়ে অপর দলের সাথে কোয়ালিশন করতে নিষেধাজ্ঞা নেই, যদি এর মাঝে উম্মতের কল্যাণ নিহিত থাকে।

পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি

৪-উপরে যা কিছু বলা হয়েছে তার সাথে সংযুক্ত করে আরো যা বলা যেতে পারে তা হলো: এ জগত সংসার পরিচালনায় রাব্বুল আলামিনের চিরাচরিত কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে, যা থেকে অমনোযোগী হওয়া আমাদের উচিত হবে না। আর তা হচ্ছে পর্যায়ক্রমিকতার নীতি।

সকল কিছুই ছোট থেকে শুরু হয়, তারপর বড় হয়ে থাকে। দুর্বল অবস্থায় সূচনা হয়, তারপর শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। মানুষ থেকে শুরু করে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতেও এমনটি দেখা যায়। মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানবান হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, বরং নবজাতক, তারপর পর্যায়ক্রমে দুগ্ধপোষ্য, দুধ ছড়ানো, কৈশোর, বয়োসন্ধি, যুবক, পৌঁষ, পৌঢ় ... ইত্যাদি স্তর অতিক্রম করে থাকে।

এর পূর্বে মায়ের পেটে সংরক্ষিত স্থানে টপকে পড়া একটি ফোঁটা থেকে মানুষের সৃষ্টি সূচনা হয়ে থাকে। এরপর জমাট বস্তুপিণ্ড, মাংসপিণ্ড, অস্থি-পিঞ্জর, এরপর আল্লাহ তায়ালা অস্থি-পিঞ্জরকে গোশত দিয়ে ঢেকে দিয়ে থাকেন। তারপর এর সকল স্তর অতিক্রম করে মানুষকে দাঁড় করানো হয়ে স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি রূপে। আল্লাহ তায়ালা বড়ই বরকতসম্পন্ন, সকল কারিগরের চাইতে উত্তম কারিগর তিনি।

পর্যায়ক্রমিকতা ও ধারাবাহিকতার এ নীতি ইসলামি শরিয়তেও অনুসরণ করা হয়েছে। সৃষ্টিকুলের মাঝে শরিয়তের বিধি-বিধান প্রবর্তনে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন- মদ, জুয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ বস্তুগুলো অবৈধ করণের ক্ষেত্রে এ নীতির অনুসরণ লক্ষ্যণীয়। এটি আল্লাহর দুর্বল সৃষ্টি মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ মেহেরবানী বটে, যাতে ধীরে ধীরে মানুষের কাছে এ সকল বিধান সহনীয় হয়ে ওঠে।

কখনো কখনো মানুষ তার শত আশা-আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও এক ধাপে বড় কোনো টার্গেট অর্জন করতে সক্ষম হয় না; কিন্তু তার সক্ষমতা ও অবস্থার আলোকে ধাপে ধাপে তা অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এভাবে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা কখনো প্রত্যাখ্যাত নয়। বিবেক-বুদ্ধি, সমাজ-সংস্কৃতি ও ইসলামি শরিয়াহ

ইত্যাদি কোথাও তা নিষিদ্ধ নয়। জ্ঞানবানদের কথা হচ্ছে যা পুরোপুরি আয়ত্ত করা যায় না তাকে পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া যায় না।

পরিপূর্ণ ইসলামি শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন নিঃসন্দেহে বড় ধরনের একটি লক্ষ্য, একটি স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। যে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা সর্বদা মুসলিম ব্যক্তির চোখের সামনে ও অন্তরে মণিকোঠায় থাকা উচিত। কিন্তু কখনো এক ধাপে এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে ওঠে। সুতরাং কেউ যদি এর কিছু অংশ অর্জনে সক্ষম হয় তা অর্জন করতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয়। এর মাধ্যমে মানুষের সামনে একটি নমুনা ও একটি আদর্শ উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করা যায় এবং সাধ্যমতো মানুষের অধিকার আদায়, কল্যাণের প্রসার, আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আঞ্জাম দেওয়া যায় যা হয়তোবা অন্তরে বন্ধ দরজাগুলো খুলে দিতে পারে এবং এ ধরনের সুন্দর ও জনকল্যাণ কাজে উৎসাহী হয়ে এগুলো আঞ্জাম দিতে হয়তোবা অনেকে এগিয়ে আসতে পারে।

ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য উত্তম আদর্শ এবং যার অনুসরণ সঠিক পথ প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে।

ইসলামের পঞ্চম খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযীজের জীবন চরিতে আমরা তা পেয়ে থাকি। তিনি মৃতপ্রায় শরিয়াহকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, আদল-ইনসাফের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং জনকল্যাণমূলক নানাবিধ কাজের প্রসার ঘটিয়েছিলেন যা সকলের কাছে সুস্পষ্ট এবং ইতিহাসে যা এখনো অবিস্মৃত ও অবিস্মরণীয়। কিন্তু তথাপিও তিনি যা চেয়েছিলেন তার সব কিছু করে যেতে পারেনি। যেমন খেলাফত ব্যবস্থায় শুরা প্রতিষ্ঠা ও এর প্রবর্তন করতে সক্ষম হননি যা ইসলামি শাসনের মৌলিক বিষয়াবলীর অন্যতম এবং খেলাফতকে উমাইয়াদের দখলমুক্ত করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে সক্ষম হননি।

কিন্তু তিনি যা কিছু করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা অত্যন্ত প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতির মাধ্যমেই অর্জন করতে পেরেছিলেন। এমনকি তার পুত্র আব্দুল মালেক, যে ছিল সুশিক্ষিত, মুত্তাকি ও অতিউৎসাহী ধর্মপ্রাণ এক যুবক, একদিন তাকে বলেছিল আব্বাজান! কি ব্যাপার, বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি আপনাকে ধীরগতি অবলম্বন করতে দেখছি? আল্লাহর শপথ, আল্লাহর পথে আমাকে এবং আপনাকে যদি উত্তপ্ত কড়াইয়ে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে আমি তার পরোয়া করব না!

অতিউৎসাহী, আবেগে উদ্বেলিত ধর্মপ্রাণ পুত্র তাঁর পিতার কাছে কামনা করেছিলেন, কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের কাজে তিনি যেন দ্রুতগতি অবলম্বন করেন। তা করতে গিয়ে যে

পরিস্থিতি বা পরিণামের সম্মুখীন হতে হয় না কেন তাতে তার কোনো মাথাব্যথা নেই, যদি তা আল্লাহর রাস্তায় তাঁর সন্তুষ্টির নিমিত্তেই হয়ে থাকে!

বিজ্ঞ পিতা উত্তর দিলেন তাড়াহুড়া করতে যেয়ো না হে বৎস! আল্লাহ তায়ালা প্রথমে দু'টি আয়াতে মদের নিন্দা করেছেন, তারপর তৃতীয় আয়াতে তা হারাম তথা নিষিদ্ধ করেছেন! আমি আশঙ্কা করছি, আমি যদি এক সাথে মানুষের উপর পুরো শরিয়াহকে চাপিয়ে দিই তাহলে হয়তবা তারাও এক সাথে পুরো শরিয়াহ থেকে বেঁকে বসবে, যার পরিণাম ফিতনা-ফাসাদ ছাড়া আর কিছুই হবে না![৩৪]

কোয়ালিশনের আবশ্যকীয় শর্তাবলী

ইসলামি আইনে এ ধরনের কোয়ালিশনের বৈধতার জন্য কতিপয় শর্তাদি রয়েছে যেগুলোর বর্তমান থাকা আবশ্যক, অন্যথায় এর মৌলিক বিধান তথা অবৈধতার দিকে ফিরে যেতে হবে।

প্রথমত: শুধুমাত্র কথায় ও কাগজে-কলমে নয়, বরং কার্যকর কোয়ালিশন হতে হবে। শরিক দল যেন অন্যের হাতে সংরক্ষিত হাতিয়ারে পরিণত না হয়ে পড়ে। এমন অবস্থা যাতে না হয় যে, শাসকদল যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে, আর এ ক্ষেত্রে শরিক দলের হাতে সংস্কার সাধনের কোনো ক্ষমতা কিংবা বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে না, যার মাধ্যমে সে ইচ্ছে করলে জুলুম-অত্যাচারের বিতাড়ন করে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে এবং মিথ্যার ফানুসকে ধ্বংস করে সত্যের জয় ধ্বনি করতে সক্ষম হবে, হোক তা আংশিকভাবে কিংবা সীমিত পরিসরে। অন্যথায় কোয়ালিশনের সার্থকতা কোথায়?

দ্বিতীয়ত: যে শাসক দলের সাথে কোয়ালিশন করবে তা যেন জুলুম-অত্যাচারের শাসন না হয়, অন্যায়-অবিচার কিংবা মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনি-মিনি খেলার শাসন না হয়। কারণ এ ধরনের ক্ষেত্রে সত্যিকার মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে সম্ভাব্য যে কোনো উপায়ে এর প্রতিরোধ করা এবং এর পরিবর্তনে এগিয়ে আসা। বাহুবলের সাহায্যে চেষ্টা করবে, তা না হলে মুখের সাহায্যে, অন্যথায় অন্তরে

---

[৩৪] দেখুন : ইমাম শাতেবী রচিত আল মুয়াফাকাত ২/৯৪, আমাদের রচনা 'ফতোয়া মুয়াসারাহ', ২য় খণ্ড, ওমর ইবনে আব্দুল আযীজ কি রাজনৈতিক পলিসি জানতেন না? শীর্ষক জিজ্ঞাসার জবাব।

অন্তরে তা পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, আর তা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দুর্বলতম স্তর।

সুতরাং এ ধরনের শাসনের ক্ষেত্রে সত্যিকার ইসলামি দলের দায়িত্ব হচ্ছে এর সাথে কোয়ালিশন করা নয়; বরং তা প্রতিরোধ ও পরিবর্তনে সচেষ্ট থাকা।

যদি ইউসুফের আ. কাছে ফেরাউন (যে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল এবং তার জাতিকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করে দিয়েছিল) এ আবেদন করত যে আপনি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং আমানতদার হিসেবে আমার কাছে থাকুন, তাহলে তিনি অবশ্যই তা প্রত্যাখ্যান করতেন এবং কখনো তাঁর কাছে মিশরের কোষাগারের দায়িত্ব অর্পণ করতেন না। কারণ ইউসুফের আ. সময়কালীন মিশরের শাসক তথা ফেরাউন এবং মুসার আ. সময়কালীন ফেরাউন এক ও অভিন্ন ছিল না।

তাই ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তি বা দলের জন্য কখনো বৈধ হবে না যে তারা স্বৈরশাসকের সাথে কোয়ালিশন করবে, যে জবর দখল পূর্বক জাতির ঘাড়ে চেপে বসে আছে, হোক তা বেসামরিক শাসন কিংবা সেনাকুঞ্জের শাসন।

কোয়ালিশন হবে শুধুমাত্র ওই শাসনের সাথে যা গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যেখানে মানুষের অধিকারের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত: শরীফ দলের এ অধিকার থাকতে হবে যে, ইসলামের সুস্পষ্ট বিরোধী সকল কাজে বিরোধিতা করতে পারবে, অথবা কমপক্ষে তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারবে। শরিক দলের কোনো মন্ত্রী হয়তোবা নিজের মন্ত্রণালয়ে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ লাভ করতে পারে; কিন্তু কখনো এমনও হতে পারে যে মন্ত্রিপরিষদের একজন হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তার থেকে এমন কতিপয় আইন-কানুন অথবা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট কিংবা চুক্তিতে সমর্থন দাবি করতে পারে, যা সুস্পষ্টভাবে ইসলামের বিধি-বিধান বহির্ভূত। এমতাবস্থায় ইসলামের বিধানের সাথে বৈপরীত্যের মাত্রা অনুযায়ী এতে আপত্তি করা কিংবা কমপক্ষে সমর্থন প্রদান থেকে বিরত থাকার অধিকার ও সুযোগ থাকতে হবে।

যদি এমন ধরনের কাজ হয়ে থাকে ইসলামের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক এবং যেখানে অপরাধের মাত্রা খুবই বেশি ও মারাত্মক, এমতাবস্থায় শুধুমাত্র আপত্তি করা কিংবা সমর্থন দান থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট হবে না; বরং কোয়ালিশন ভেঙে দিয়ে সরকার পরিচালনা থেকে পদত্যাগ করতে হবে। মুসলমানদের কোনো ব্যক্তি কিংবা দল এ ধরনের সুস্পষ্ট অপরাধ ও সরাসরি ইসলাম বিরোধী কাজে সমর্থন দিয়েছে বলে ইতিহাসে কোনো রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এ ধরনের কাজের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত যেমন ইসরাঈলের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, ফিলিস্তিনের যা কিছু ইসরাঈল আত্মসাৎ করেছে তার বৈধতা দেওয়া, বায়তুল মুকাদ্দাসকে তার জন্য ছেড়ে দেওয়া যাতে সে সর্বদা ও সকল স্থানে ঘোষণা দিতে পারে যে কুদসই একমাত্র ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজধানী, লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনি শরণার্থীকে তাদের দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি না দেওয়া যখন ইসরাঈল বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনের মাটিতে অবৈধ আবাসনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, এ জাতীয় কার্যাবলীতে সমর্থন দেওয়া কোনো মুসলিম ব্যক্তি কিংবা দলের জন্য কখনো বৈধ হতে পারে না।

চতুর্থত: সময়ে সময়ে শরিক দলকে তাদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন এবং এর পর্যালোচনা ও এর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যেতে পারে। এর মাধ্যমে হয়তোবা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ ধরনের অভিজ্ঞতা আসলে তাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনছে কি-না? এর মাধ্যমে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন তথা সুবিচার ও জনকল্যাণমূলক কাজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে সফল হতে পারছে কি-না এবং তা কোন পর্যায়ে কতটুকু সম্ভব হচ্ছে? কোয়ালিশন ধারাবাহিকভাবে চলবে, না তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে? উপরোক্ত এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন হয়তোবা বিষয়টির উপযুক্ত জবাব প্রদান করতে সক্ষম হবে।

শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ প্রদত্ত সমাধান

এ বিষয়ে আমরা আমাদের শীর্ষস্থানীয় আলেম সমাজ, প্রখ্যাত ইসলামি আইনবিদ, চিন্তাবিদ ও গবেষকদের থেকে মূল্যবান সমাধান পেয়ে আসছি, যারা জালেম রাজা-বাদশাহ ও শাসকগোষ্ঠীর শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক দায়িত্বসহ বিচারকার্য ও বিভিন্ন সেক্টর পরিচালনার দায়িত্ব ইত্যাদি গ্রহণ করা বৈধ বলেছেন,

যদি এর মাধ্যমে অগ্রাধিকারযোগ্য কল্যাণের কোনো পথ সুগম করা কিংবা অবশ্যম্ভাবী কোনো অকল্যাণকে প্রতিহত করা নিশ্চিত করা যায়।

তাদের এ সমাধান 'ফিকহুল মুয়াজানাত' তথা 'তুলনামূলক বিধিমালা'র উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত হয়েছে। যার সারকথা হচ্ছে কল্যাণের পথ যদি একাধিক হয়ে থাকে এবং একটি অপরটির সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে তাহলে এমতাবস্থায় কোনটি গ্রহণ করতে হবে এবং কোনটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে, কোনটি অগ্রাধিকারযোগ্য এবং কোনটি পরবর্তীতে করলেও চলবে, এ সকল বিষয়ে পর্যালোচনা ও তুলনা করে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার মূলনীতির সমম্বয় হচ্ছে 'ফিকহুল মুয়াজানাত' তথা তুলনামূলক বিধি-বিধান।

এমনিভাবে ক্ষতিকর বিষয়ও যদি একাধিক হয়ে পড়ে এবং একটি অপরটির সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে হড়ে তাহলে এমতাবস্থায় কোনটা রেখে কোনটাকে প্রতিহত করতে হবে, এ সকল মূলনীতির সমম্বয় হচ্ছে 'ফিকহুল মুয়াজানাত'।

এমনিভাবে কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ যদি পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে তাহলে এমতাবস্থায় শরিয়তের নিক্তিতে কোনটি প্রাধান্য পাবে? এও ফিকহুল মুয়াজানাতের আলোচ্য বিষয়।

এ ধরনের তুলনা ও অগ্রাধিকার দু'ধরনের ফিক্হ শাস্ত্রকে আবশ্যক করে:

১. কুরআন-হাদিসের ভাষ্য ও শরিয়তের মৌলিক উদ্দেশ্যের আলোকে ইসলামি আইনের সমুদয় দলিল-প্রমাণ ও যাবতীয় বিধি-বিধান।

২. কোনো প্রকারের অবহেলা ও উদাসীনতা ব্যতীত বিদ্যমান বাস্তবতার জ্ঞান লাভ এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান; হোক তা মুসলমানদের কিংবা তাদের শত্রু শিবিরের বর্তমান বাস্তবতা, এবং তা দেশীয়, মহাদেশীয় ও আন্তর্জাতিক, যে কোনো পর্যায়ের বিদ্যমান বাস্তবতা হতে পারে।

এ ধরনের ফিক্হ তথা 'তুলনামূলক বিধিমালা'র আলোকেই উল্লেখযোগ্য এ সকল ফতোয়া তথা সমাধান দেওয়া হয়েছে।

ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম প্রদত্ত ফতোয়া

এ ধরনের ফতোয়ার মধ্যে ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য, যা তিনি তার রচনা "সৃষ্টিকুলের কল্যাণেই শরিয়তের বিধান" শীর্ষকগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

"কাফিররা যদি কোনো দেশ বা অঞ্চল দখল করে সেখানে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে, অতঃপর বিচারক হিসেবে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে চায় যে

মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিবে, এমতাবস্থায় এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের কাউকে এ দায়িত্ব অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, যাতে সার্বিক কল্যাণের পথ সুগম এবং যাবতীয় অকল্যাণকে প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়; কারণ ইসলামি শরিয়াহ যা মানুষের জন্য রহমতের আধার এবং যেখানে সর্বদা মানুষের কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে, এ ধরনের শরিয়তের এ বিধান হতে পারে না যে, শুধুমাত্র নিয়োগকর্তা ব্যক্তি বা প্রশাসনের মধ্যে পরিপূর্ণতা না থাকা তথা মুসলিম না হওয়ার কারণে জাতির সার্বিক কল্যাণের পথ অকেজো ও নষ্ট হয়ে পড়বে এবং অপর দিকে যাবতীয় অকল্যাণকে আলিঙ্গন করে নেওয়া হবে..." ।[৩৫]

তিনি এখানে যা বললেন তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা এবং তা মুসলিম উম্মাহর সার্বিক কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ বর্জনে যথাসাধ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া প্রদত্ত ফতোয়া

জুলুম-অত্যাচারের শাসনে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের বৈধতা সম্বলিত শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার রা. সুপরিচিত ফতোয়া রয়েছে, এর মাধ্যমে জুলুমের রাস্তাগুলো বন্ধ করা কিংবা এর বোঝা হালকা করা ও যাবতীয় অন্যায়-অবিচারের পরিধিকে কমিয়ে আনা সম্ভব হয় এবং যদি এ লক্ষ্যেই দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়। আমাদের রচনা 'ইসলামি আন্দোলনের অগ্রাধিকার কর্মসূচি'র পরিশিষ্ট (১) অংশে ইবনে তাইমিয়ার উক্ত ফতোয়া সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে যার মূল ভাষ্য হচ্ছে :

ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে জিজ্ঞেস করা হলো:

এক ব্যক্তি জুলুমের শাসনাধীনে কতিপয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যেমন- বিভিন্ন ধরনের দায়িত্বে লোক নিয়োগ করা কিংবা জায়গিরদারী প্রদান করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে চলছে। মূলত জুলুম-অত্যাচার দূর করার লক্ষ্যেই সে এ দায়িত্ব হাতে নিয়েছে এবং তা করার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবে। সে জানে যদি সে এ দায়িত্ব পালন ছেড়ে দেয় তাহলে তার স্থানে অপর জনকে এ দায়িত্ব দেওয়া হবে, এর মাধ্যমে জুলুম-অত্যাচার তো কমবে না; বরং আরো বৃদ্ধি পাবে। সে ইচ্ছে করলে জায়গিরদারীতে সরকার আরোপিত ট্যাক্সের পরিমাণ কমাতে পারবে। সে তা কমিয়ে অর্ধেকে নিয়ে আসতে পারবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক বিভিন্ন খরচাদি বাবদ

---

[৩৫] দেখুন : কাওয়াইদুল আহকাম : ৮৫

নেওয়া হয়ে থাকে যা মওকুফযোগ্য নয়। যদি সে তাও মওকুফ করতে যায় তাহলে যাবতীয় খরচাদি তাকেই বহন করতে হবে যা তার জন্য অসাধ্য ও কষ্টকর হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্য এ ধরনের রাষ্ট্রীয় এবং জমিদারীর দায়িত্বে অব্যাহত থাকা বৈধ হবে কি-না? যেখানে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চিন্তা-ভাবনা স্পষ্ট যে, সে এর মাধ্যমে যথাসাধ্য জুলুমের পরিধি এবং এর গতিবেগ হ্রাস করতে চায় এবং তা করা তার পক্ষে সম্ভবপর হবে; না কি সে এ ধরনের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে চলে আসবে, যার ফলশ্রুতিতে জুলুম-অত্যাচার দূর হওয়া বা হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা; বরং তা আরো বেগবান হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এরূপ দায়িত্ব পালন করে যাওয়া বৈধ হবে কি-না? এ ধরনের দায়িত্ব পালন করতে থাকলে তার কোনো গুনাহ হবে কি-না? যদি গুনাহ না হয়ে থাকে তাহলে এ ধরনের কাজের জন্য আবেদন করা বৈধ হবে কি-না? দু'টি বিষয়ের মধ্যে কোনটি তার জন্য উত্তম হবে জুলুম-অত্যাচার দূর করা বা এর পরিধি কমিয়ে আনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে দায়িত্ব পালন করে যাওয়া, জুলুম-অত্যাচার অবশিষ্ট থাকা কিংবা আরো বেগবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া? যেহেতু এর মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র উপকৃত হচ্ছে এবং জুলুমের গতিবেগ হ্রাস পাচ্ছে, তাই তারা যদি চায় যে, সে দায়িত্বে অবশিষ্ট থাকুক, এমতাবস্থায় উক্ত দায়িত্ব পালন করে যাওয়া উত্তম হবে, না-কি জুলুমের গতিবেগ বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া উত্তম হবে?

বিজ্ঞ ইমাম উত্তর দেন সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য নিবেদিত। হ্যাঁ, এ ব্যক্তি যদি জুলুম-অত্যাচার দূর করে আদল-ইনসাফ কায়েমে যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়ে থাকে তাহলে অন্যের চেয়ে তার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব উত্তম এবং মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হবে। এমনিভাবে জায়গিরদারীতেও তার দায়িত্ব-কর্তৃত্ব অপরের চেয়ে উত্তম হবে। এ ধরনের দায়িত্ব ও জায়গিরদারীতে অবশিষ্ট থাকা তার জন্য বৈধ, এতে কোনো গুনাহ নেই; বরং এমতাবস্থায় যদি তার চেয়ে উত্তম কেউ দায়িত্বে আসার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে উক্ত দায়িত্বে অবশিষ্ট থাকা উত্তম হবে।

আবার কখনো এ ধরনের দায়িত্বে অবশিষ্ট থাকা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যখন এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম অন্য কাউকে পাওয়া না যায়। যথাসাধ্য আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়-অবিচার অপসারণের চেষ্টা করা সাধারণভাবে সকলেরই উপর আবশ্যক। প্রত্যেক মানুষই এ দায়িত্ব পালনে বাধ্য যদি তার স্থানে অপর কেউ এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসে। কিন্তু জুলুম-অবিচারের অপসারণ কিংবা এর গতিবেগ হ্রাসকরণ যদি অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে এমতাবস্থায় এ ধরনের দায়িত্ব পালনের কামনা কিংবা আবেদন করা বৈধ হবে না।

রাজা-বাদশাহ বা শাসকগোষ্ঠী যদি এমন কতিপয় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে যার অপসারণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় তার জন্য আবেদন করা যাবে না। শাসকগোষ্ঠী কিংবা তাদের দোসরগণ যদি এমন ধন-সম্পদ দাবি করে, যা উক্ত দায়-দায়িত্বের কিয়দংশ হলেও গ্রহণ করা ব্যতীত প্রদান করা সম্ভব হয় না এবং যদি তাদেরকে কোনো ধন-সম্পদ প্রদান না করা হয় তাহলে জায়গিরদারীসহ বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সকল লোকের হাতে দেওয়া হবে যারা জুলুমের ভিতকে আরো মজবুত করতে সচেষ্ট থাকবে, এমতাবস্থায় ধন-সম্পদ দিয়ে হলেও উক্ত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হবে। এমন পরিস্থিতিতে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও কমপক্ষে জুলুম-অবিচারের অপসারণ কিংবা এর গতিবেগ হ্রাসকরণ ও এর পরিধি কমিয়ে আনতে সচেষ্ট থাকার মধ্যেও মুসলমানদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। এমতাবস্থায় কেউ যদি জুলুম-অত্যাচার পুরোপুরি অপসারণ করতে সক্ষম না হয়; কিন্তু তার কর্মের মাধ্যমে সে জুলুম নয়; বরং সুবিচার ও কল্যাণের প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে তাহলে সে এর জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে। উক্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি কেউ শাসকগোষ্ঠীর নির্ধারিত নিয়ম-নীতি মোতাবেক কারো থেকে কোনো ধন-সম্পদ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে থাকে তাহলে এর জন্য তার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না এবং দুনিয়া-আখেরাতে সে অপরাধী হবে না, যদি সে সাধ্যমত আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকে।

উক্ত আলোচনার দৃষ্টান্ত যেমন এতিম অভিভাবক, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক এবং মুদারাবা ব্যবসায়ের অংশীদার ইত্যাদি যারা কর্তৃত্ব কিংবা প্রতিনিধির আলোকে পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করে থাকে, এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ যদি তাদের কাছে বিদ্যমান আমানতের সংরক্ষণ করতে গিয়ে জালেমকে কিছু ধন-সম্পদ প্রদান করতে বাধ্য হয়ে পড়ে তাহলে এমতাবস্থায় তারা অপরাধী হবে না; বরং প্রতিদানের উপযুক্ত হবে। এমনিভাবে রাস্তা-ঘাটে প্রদত্ত টোল এবং গচ্ছিত ধন-সম্পদ কিংবা ঘর-বাড়ি ও বসত-ভিটে ইত্যাদির উপর প্রদত্ত ট্যাক্স ইত্যাদিও উক্ত বিধানের আওতাভুক্ত হবে। কারণ বর্তমান সময়ে নিজের হোক বা অপরের হোক, এ ধরনের বিধি-বিধান মেনে চলা ব্যতীত কোনো কাজই আঞ্জাম দেওয়া যাবে না। যদি তা করা অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে অন্যের পক্ষ থেকে কোনো দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে, যার ফলে জনজীবন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

স্বল্প পরিমাণ জুলুম থেকে বাঁচার জন্য যারা উল্লেখিত বিধানকে অবৈধ মনে করে তা থেকে নিষেধ করে থাকে, তাদের বক্তব্য মেনে নিলে জুলুম-অত্যাচার ও ফিতনা-ফ্যাসাদ আরো বেগবান হবে। তাদের বক্তব্যের দৃষ্টান্ত দিতে গেলে বলা যায়

পথচারী একটি কাফেলা ডাকাতের মুখোমুখি অবস্থায় ডাকাত দলকে যদি কিছু মাল দিয়ে হলেও সন্তুষ্ট করতে না চায় তাহলে তাদের সমুদয় ধন-সম্পদই আত্মসাত করা হয় এবং তাদেরকে হত্যা করা হয়। এমতাবস্থায় উক্ত কাফেলার কেউ যদি বলে তোমাদের কাছে নিজের হোক বা অপরের হোক, যে ধন-সম্পদ রয়েছে তা থেকে এ ডাকাতদলকে কিছু প্রদান করা বৈধ হবে না। উক্ত ব্যক্তি এর মাধ্যমে ওই সামান্যতম সম্পদ সংরক্ষণের চিন্তা-ভাবনা করেছে যা প্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কাফেলা যদি তার কথা মেনে নেওয়া হয় তাহলে এমতাবস্থায় স্বল্প ও অধিক সকল কিছুই ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং জীবনের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে। আল্লাহর শরিয়াহ তো দূরের কথা, সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে এমন ব্যক্তিও এ ধরনের বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত হবে না। আর মূলত যথাসাধ্য মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় সকল কল্যাণের পরিপূর্ণতা দান করতে এবং সকল অকল্যাণকে প্রতিহত ও অকেজো করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা যুগ যুগ ধরে নবি রসুল প্রেরণ করেছেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত এরূপ জায়গীরদার তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শাসকগোষ্ঠীকে জনগণের যে ধন-সম্পদ বা ট্যাক্স প্রদান করে থাকে, যদিও তাতে তার অন্যায় ও অপরাধ হয়ে থাকে, কিন্তু এর মাধ্যমে মুসলমানদের যে কল্যাণ হয়ে থাকে তা এর তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। এমতাবস্থায় এছাড়া তার হাতে বিকল্প কোনো উপায়ও নেই; কারণ যদি সে দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে চলে আসে তাহলে হয়তোবা এমন ব্যক্তির হাতে এ দায়িত্ব পড়তে পারে যার মাধ্যমে জুলুমের পরিধি কমবে তো না; বরং বাড়তে পারে। উক্ত পরিস্থিতিতে তার কোনো গুণাহ হবে না এবং দুনিয়া-আখেরাতে এ জন্য সে পাকড়াও হবে না।

এর দৃষ্টান্ত এতিমের অভিভাবক কিংবা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের ন্যায়, যার পক্ষে জালেম শাসককে কোনো কিছু দেওয়া ব্যতীত তার অর্পিত আমানতের সংরক্ষণ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সে যদি এ দায়িত্ব ছেড়ে দেয় তাহলে হয়তবা এমন ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব পড়তে পারে যে এ আমানতের সংরক্ষণতো দূরের কথা; বরং আরো বেশি পরিমাণে তা আত্মসাত করতে পারে। তাই এমতাবস্থায় তার কর্তৃত্ব দায়িত্ব বৈধ হবে এবং সে এ আমানত থেকে যে পরিমাণ দিয়েছে তাতে কোনো গুনাহ হবে না; বরং কখনো এ দায়িত্ব পালনে তার উপর আবশ্যক হয়ে পড়বে।

এমনিভাবে জায়গীরদারিতে নিয়োজিত সৈনিক যে দেশের পক্ষ থেকে তার উপর আরোপিত দায়িত্ব বহন করে চলছে, যা পুরোপুরিভাবে এড়িয়ে যাওয়ার তার কোনো সুযোগ নেই; কারণ ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচাদি তাকেই বহন

করতে হয়ে, আর এ ধরনের কতিপয় দায়-দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া ব্যতীত তার পক্ষে তা বহন করা কখনো সম্ভব হতে পারে না। তা সত্ত্বেও এটি জিহাদের সময়ে মুসলমানদের কাজে আসবে। যদি তাকে বলা হয় এ ধরনের জায়গীরদারি কাজ গ্রহণ করা তোমার জন্য বৈধ হবে না; বরং হাত গুটিয়ে তা থেকে চলে এস, অতঃপর সে তা ছেড়ে দিলো এবং অপর একজন যার জুলুমের পরিধি খুবই বেশি সে তা গ্রহণ করল, আর তা মুসলমানদের জন্য আদৌ কোনো কল্যাণকর হবে না; এ ধরনের বক্তা আল্লাহর শরিয়তের নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ; বরং তুর্কি কিংবা আরবদের থেকে যারা অপরের তুলনায় উত্তম তাদেরকে সৈনিক হিসেবে অবশিষ্ট রাখা উত্তম এবং এতে মুসলমানদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং সাধ্যমতো জুলুমের পরিধি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে উক্ত জায়গীরদারিতে দায়িত্ব গ্রহণ করা আদল-ইনসাফের কাছাকাছি এবং তা মুসলমানদের জন্য উত্তম, যখন অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাতে কল্যাণের পাল্লা হালকা এবং জুলুমের পাল্লা ভারী হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

জায়গীরদারিসহ এ জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যারাই সাধ্যমতো আদল-ইনসাফ কায়েমের চেষ্টা করবে আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করবেন, আর যে সকল ক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতা থাকবে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন। আর এ ক্ষেত্রে তাদের কোনো কর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না, যদি তারা তা করতে বাধ্য হয়ে পড়ে এবং তারা যদি এ দায়িত্ব ছেড়ে দেয় তাহলে এর থেকেও বড় ক্ষতি এবং অনিষ্টতার সম্ভাবনা থেকে যায় ... আল্লাহই এ সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।[৩৬]

[৩৬] দেখুন : ইবনে তাইমিয়া ফতোয়া সমগ্র : ৩০/৩৫৬-৩৬০।

ইবনে তাইমিয়ার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের পরস্পর বিরোধিতা ও অসঙ্গতি

শাইখ ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ভালো-মন্দের অসঙ্গতি সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যখন প্রমাণিত হয় যে, ভালো কাজে কল্যাণ রয়েছে এবং তা যদি আবশ্যক হয় তাহলে তা পরিত্যাগ করার মধ্যে ক্ষতি রয়েছে, খারাপ কাজেও অকল্যাণ ও ক্ষতি রয়েছে, মাকরুহ তথা অপছন্দনীয় কাজে কিছু অকল্যাণ থাকতে পারে। দ্বন্দ্ব বা সাংঘর্ষিক অবস্থা যা বিরাজ করে থাকে তা হয়তোবা কখনো দু'টি ভালো কাজের মাঝে হতে পারে যার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম ভালো কাজটি ছেড়ে দিয়ে বেশি ভালো কাজটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অথবা দু'টি খারাপ কাজের মাঝে সংঘর্ষ বিরাজ করতে পারে যা থেকে মুক্ত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম খারাপটিকে মেনে নিয়ে বেশি খারাপটিকে প্রতিহত করতে হবে। অথবা কখনো ভাল ও খারাপ, এ দু'য়ের মাঝে সংঘর্ষ বিরাজ করতে পারে, যেখানে উভয়ের মাঝে পার্থক্য সাধন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। যেমন- ভালো কাজ করতে গিয়ে মন্দ বিষয়টি আলিঙ্গন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, আবার মন্দ কাজ পরিত্যাগ করতে গিয়ে ভালো কাজটিকেও পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই এখানে ভালো কাজের কল্যাণ এবং মন্দ কাজের ক্ষতি, এ দু'য়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণে যেটি অগ্রাধিকারযোগ্য হবে তাই গ্রহণ করতে হবে।

প্রথমত: ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব এর মধ্যে ওয়াজিব কে, ফরজে আইন এবং ফরজে কিফায়া এর মধ্যে ফরজে আইনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেমন-নফল দান-সদকা করার উপর ঋণ পরিশোধ করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত: যেমন, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ জিহাদের ব্যায় ভার বহন করার উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে, যদি তা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নির্ধারণ করে দেওয়া না হয়। এমনিভাবে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ প্রদানও এর উপর অগ্রাধিকার পাবে। যেমন- সহিহ হাদিসে এসেছে রসুলকে সা. জিজ্ঞেস করা হলো কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বলেন "যথাসময়ে সালাত আদায় করা"; তারপর কোনটি তা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন "পিতা-মাতার আনুগত্য ও দেখাশোনা করা";

তারপর কোনটি তা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা"। কুরআন ও হাদিসে জিহাদকে হজের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আবশ্যক জিহাদ আবশ্যক হজের উপর। এমনিভাবে মুস্তাহাব জিহাদ মুস্তাহাব হজের উপর প্রাধান্য পাবে। কুরআন তিলাওয়াতকে জিকিরের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে যখন অন্তর ও জিহ্বার ইবাদাত হিসেবে উভয়ই সমান পর্যায়ের হবে। আর উভয়ের উপর সালাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যদি তাতে অন্তরের ইবাদাতও সংযুক্ত হয়ে থাকে। অন্যথায় মনের মাধুরী মিশিয়ে খোদাভীতির সাথে যে জিকির করা হয় তা ওই ধরনের কুরআন তিলাওয়াত থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে না যা কণ্ঠনালীর নিম্নভাগও অতিক্রম করে না।

তৃতীয়ত: যেমন, দারুল হারব তথা শত্রুদেশে কোনো মহিলার বসবাসের চেয়ে মুহরিম নয় তথা যাদের সাথে বিবাহ হারাম নয়, তাদের সাথে হিজরতের সফর করা অগ্রাধিকার পাবে। যেমনটি করেছিলেন উম্মে কুলছুম রা., যার সম্পর্কে আয়াত নাজিল করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "হে ইমানদাররা, ইমানদার নারীরা যখন হিজরত করে তোমাদের কাছে আসবে তখন (তাদের ইমানদার হওয়ার বিষয়টি) পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নাও" (সুরা মুমতাহিনা, ৬০: ১০)।

বুদ্ধিমান তো ওই ব্যক্তি, যখন তার দেহে ভিন্নধর্মী একাধিক রোগ দেখা দেয় সে সবচেয়ে কঠিন রোগটির চিকিৎসা সর্বাগ্রে শুরু করে।

এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা কিংবা মূলনীতি সকল বিষয়েই সুস্পষ্ট

মানুষের বিবেক-বুদ্ধির কাছে এটি সুস্পষ্ট যে, দুর্ভিক্ষ পীড়িত অবস্থায় বৃষ্টির অবতরণ সকলের জন্য রহমত স্বরূপ, যদিও এর মাধ্যমে জালেম সম্প্রদায় তাদের জুলুমের হাতকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়, কিন্তু বৃষ্টি না হওয়া তাদের জন্য আরো বেশি ক্ষতিকর। এমনিভাবে জালেম হলেও না থাকার চাইতে শাসকের অস্তিত্ব সকলের কাছে অগ্রাধিকারযোগ্য। জ্ঞানবানদের কেউ বলেন শাসকহীন এক রাতের চেয়ে জালেম শাসকের ষাট বৎসর উত্তম!

এরপরও শাসক তার যাবতীয় অন্যায়-অবিচার এবং সক্ষমতা সত্ত্বেও অধিকার প্রদান না করে তা হরণ করা ইত্যাদির জন্য পাকড়াও থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু আমি এখানে বলব রাষ্ট্রের সার্বিক দায়িত্ব কিংবা এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যেমন, সেনাপ্রধান, স্টেট গভর্নর কিংবা বিচারক ইত্যাদিতে দায়িত্বরত কেউ যদি তার উপর আরোপিত

আবশ্যকীয় কার্যাবলী আঞ্জাম দিতে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়াবলী বর্জন করতে সক্ষম না হয়, কিন্তু এগুলোর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে তার আন্তরিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পাওয়া যায় যেখানে অপর কেউ যাবতীয় সক্ষমতা সত্ত্বেও তার বাস্তবায়নের কোনো আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করে না এমতাবস্থায় এ ধরনের দায়িত্বভার গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে; বরং কখনো তা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ স্টেট গভর্নরসহ এ ধরনের দায়িত্ব এমন সকল আবশ্যকীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে অর্জিত ফসলগুলো আহরণ করাও আবশ্যক। যেমন- শত্রুর সাথে যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সুষম বণ্টন, শরিয়তের শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন এবং পথিকের রাস্তা নিরাপদ করা ইত্যাদি। সুতরাং এ জাতীয় ফসলগুলো আহরণ করা যেহেতু আবশ্যক, তাই যে কাজের মাধ্যমে তা আহরণ করা যায় তাও গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু তা করতে গিয়ে যদি উপযুক্ত নয় এমন কাউকে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করতে বাধ্য হতে হয়, বৈধ নয় এমন কিছু গ্রহণ করতে এবং উচিত নয় এমন কাউকে কিছু দান করতে বাধ্য হতে হয় এবং যা থেকে বিরত থাকারও কোনো সুযোগ পাওয়া যায় না, এমতাবস্থায় তা 'যা ব্যতীত কোনো আবশ্যক কিংবা মুস্তাহাব কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয় না তাও আবশ্যক কিংবা মুস্তাহাব হয়ে পড়ে' এ মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং উল্লেখিত কাজগুলো আবশ্যক কিংবা মুস্তাহাব হয়ে পড়বে যদি তাতে অকল্যাণ বা ক্ষতির চেয়ে কল্যাণ ও লাভ বেশি থাকে। এ ধরনের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব যদিও তাতে জুলুম-অত্যাচারের সংস্পর্শ রয়েছে তথাপিও তা গ্রহণ করা অবৈধ হবে না; কারণ এর মাধ্যমে হয়তবা এমন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে যে মূলত জুলুমের বোঝা হালকা করার জন্য এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণ জুলুমকে মেনে নিয়ে বড় ধরনের জুলুম-অত্যাচার থেকে জাতিকে হেফাজত করার নিমিত্তেই এ দায়িত্বভার গ্রহণ এগিয়ে আসতে পারে। আর এ ধরনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার কারণে তার এ দায়িত্ব সৎ ও ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি সে কোনো খারাপ কাজ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে তবে তা এর থেকে বড় ও কঠিন কোনো খারাপকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে হওয়ার কারণে তাও ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ জাতীয় কার্যাবলী, দায়িত্ব পালন ইত্যাদি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিচারে ভিন্নতর হতে বাধ্য। কোনো জালেম যদি কারো কাছ টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ ইত্যাদি দাবি করে এবং তা প্রদান করতে তাকে বাধ্য করে, এমতাবস্থায় অপর এক ব্যক্তি যদি মজলুমকে অত্যধিক জুলুম থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে তাদের মাঝে মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসে এবং নির্ধারিত একটি পরিমাণ সম্পদের মাধ্যমে জালেমকে সন্তুষ্ট করতে ও তার থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিতে সক্ষম হয় যে, সে আর কোনো প্রকার

জুলুম করবে না, এবং উক্ত পরিমাণ সম্পদ দিয়ে যথাসম্ভব তার ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে মজলুমকে বাঁচাতে সক্ষম হয়, তাহলে তৃতীয় পক্ষের এ কাজ অবশ্যই সম্পদ দিয়ে যথাসম্ভব তার ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে মজলুমকে বাঁচাতে সক্ষম হয়, তাহলে তৃতীয় পক্ষের এ কাজ অবশ্যই ভালো ও কল্যাণকর হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু সে যদি জালেমকে সহযোগিতার নিয়তে এ ধরনের মধ্যস্থতায় এগিয়ে আসে তাহলে অবশ্যই গুনাহগার ও অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে।

এভাবে 'জিহাদের অধ্যায়ে' কেউ যদি যাদেরকে হত্যা করা নিষেধ, যেমন- নারী, শিশু ইত্যাদিকে হত্যা করে বসে এবং তা যদি যুদ্ধে আবশ্যকীয় পরিস্থিতি, যেমন- যখন ব্যাপক আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিংবা মেনজানিক (কামান জাতীয় একটি অস্ত্র) নিক্ষেপ করা বা রাত্রের অন্ধকারে আক্রমণ করা ইত্যাদি কারণে হয়ে থাকে তাহলে তা বৈধ হবে। হাদিস এসেছে রসুল সা. তায়েফ অবরোধ করেছিলেন এবং তাদের উপর মেনজানিক নিক্ষেপ করেছিলেন।

ইসলামি আইনবিদগণ বর্ণিত "কাফের কর্তৃক মুসলমানকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার বিধান" এখানে উল্লেখযোগ্য। কুফরি এবং অবিশ্বাসের ফিতনার নির্মূলের লক্ষ্যেই জিহাদ। আর তা করতে গিয়ে এর থেকে স্বল্প পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতিকে বরণ করে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ফকিহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যাদেরকে ঢাল হিসেবে কাফিররা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে হত্যা করা ব্যতীত মুসলমানদের অস্তিত্বের হেফাজত করা যদি অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ হবে। যদি এতে মুসলমানদের বড় কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, তথাপি যাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা ব্যতীত কাফিরদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার যদি অন্য কোনো উপায় না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় তাদেরকে হত্যার ব্যাপারে ফকিহদের দ্বিমত রয়েছে।

চতুর্থ হচ্ছে যেমন, অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত অবস্থায় মৃত জন্তু ভক্ষণ করা। কারণ খাবার গ্রহণ হচ্ছে আবশ্যকীয় ভালো কাজের অর্ন্তভুক্ত যা এখানে এ মন্দ কাজের আশ্রয় নেওয়া ব্যতীত সম্ভব, আর এর কল্যাণ ও উপকারিতা এখানে অগ্রগণ্য। এর বিপরীত হচ্ছে অপবিত্র ও খারাপ ঔষধ। যে চিকিৎসায় কল্যাণ ও লাভের চেয়ে অকল্যাণ এবং ক্ষতির দিক সুস্পষ্ট। এমনিভাবে চিকিৎসার নিমিত্তে মদ্য পান ইত্যাদি।

সুতরাং এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, দু'অবস্থায় ক্ষতি ও মন্দ কাজকে মেনে নিতে হবে এর থেকেও বেশি মন্দ এবং বেশি ক্ষতিকে প্রতিহত করার জন্য এবং যদি তা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় না থাকে। কোনো কাজ ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে যদি এর

থেকেও অধিক প্রয়োজনীয় ও উপকারী কোনো কিছু অর্জন করা যায় এবং এর ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে তা অর্জন করা যায় না। এমনিভাবে দু'অবস্থায় ভালো কাজ পরিত্যাগ করতে হবে যদি তা করতে গিয়ে এর থেকেও অধিক কল্যাণকর কিছু বাদ পড়ে যায় কিংবা এ ভালো কাজ মন্দ ও খারাপ কিছুকে আবশ্যক করে যার ক্ষতি উক্ত ভালো কাজের কল্যাণের তুলনায় অধিক। এটা হচ্ছে ধর্মীয় বিষয়ে ভালো-ক্ষতির তুলনামূলক পর্যালোচনা।

অপর দিকে পার্থিব কোনো ক্ষতির কারণে কোনো আবশ্যকীয় কাজ বাদ পড়ে যাওয়া এবং দুনিয়ার প্রয়োজনে কোনো নিষিদ্ধ বস্তু হালাল হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত হচ্ছে সফরের কারণে রোজার আবশ্যকতা বাদ হয়ে যাওয়া এবং অসুস্থতার কারণে ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো এবং সালাতের আরকান তথা আভ্যন্তরীণ মৌলিক বিষয়গুলো বাদ পড়ে যাওয়া ইত্যাদি। বিষয়টি অন্য একটি অধ্যায়, দ্বীনের প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা এবং কষ্ট লাঘবের মূলনীতি ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত, যেখানে বিভিন্ন শরিয়তে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়াদি এর বিপরীত; কারণ এ জাতীয় বিষয়টিতে মতানৈক্য করার কোনো সুযোগ নেই। আর এ বিষয়টি বিবেক-বুদ্ধির কাছেও স্পষ্ট। তাই বলা হয়, সত্যিকারের জ্ঞানী ওই ব্যক্তি নয় যে ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম; বরং সত্যিকার জ্ঞানী হচ্ছে যে দু'টি কল্যাণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি কল্যাণকর এবং দু'টি মন্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি মন্দটিকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়।

এ সকল বিষয়াবলিতে সাধারণত যা বিরাজ করে থাকে তা হচ্ছে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কাজের বিকৃতি। লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিকৃতি হচ্ছে এর মাধ্যমে ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করা। কাজের বিকৃতি হচ্ছে নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে যাওয়া এবং আবশ্যকীয় কাজ পরিত্যাগ করা, যা ভালো-মন্দের সংঘর্ষের কারণে কিংবা অত্যধিক কল্যাণকর ও উপকারী বিষয়টি অর্জনের জন্য নয়।

অতঃপর স্টেট গভর্নরসহ বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব, তা জায়েজ, কিংবা উত্তম অথবা আবশ্যক যাই হোক না কেন, কখনো কখনো এটি কোনো ব্যক্তির জন্য অত্যাবশ্যক কিংবা অত্যধিক পছন্দনীয় ও উত্তম হয়ে যেতে পারে। তখন দু'টি কল্যাণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি কল্যাণটিকে প্রাধান্য দিতে হবে, আর তা কখনো আবশ্যিকভাবে হতে পারে কিংবা কখনো এমনটি করা উত্তম হতে পারে।

এরই ধারাবাহিকতায় হজরত ইউসুফ আ. মিশরের শাসকের তত্ত্বাবধানে অর্থ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন; বরং তিনি শাসকের কাছে আবেদন করেছিলেন তাকে যেন অর্থ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়, অথচ সে সময় শাসকসহ তার জাতির

লোকেরা অবিশ্বাসীদের দলভুক্ত ছিল।[১] যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "এর আগে ইউসুফ তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু তোমরা তার আনীত শিক্ষার ব্যাপারে সন্দেহই পোষণ করেছো..." (সুরা মুমিন ৪০: ৩৪)। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন "হে জেলখানার সাথীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না এক আল্লাহ, যিনি সবার উপর বিজয়ী। তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগি করেছো তারা শুধুমাত্র কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ-পুরুষরা রেখেছো, আল্লাহ এগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ পাঠাননি ..." (সুরা ইউসুফ ১২: ৩৯)। এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, কুফরি ও অবিশ্বাসের সাথে সাথে নিশ্চয়ই বাদশাহের পরিবার-পরিজন, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেনাবাহিনী ও তার প্রজাতন্ত্র ইত্যাদির সাথে ধন-সম্পদের আদান-প্রদান ও লেন-দেনে তাদের বিশেষ নিয়ম-নীতি ও আচার-অভ্যাস ছিল, যা অবশ্যই নবিদের সুন্নাত ও আদল-ইনসাফ অনুযায়ী ছিল না। আর এমতাবস্থায় ইউসুফের জন্য আল্লাহর দ্বীন মোতাবেক তার যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া ও কামনা-বাসনার বাস্তবায়ন নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না; কারণ এতে তার জাতির লোকেরা সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে নি। তথাপিও তিনি যা করতে পেরেছিলেন তা হচ্ছে আদল-ইনসাফ ও ধন-সম্পদের সুষম বন্টন এবং উক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে তার পরিবারের মুমিন-মুসলমানরা যে মান-মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলো, অন্য কোনো উপায়ে তা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। এসব কিছু আল্লাহর এ বাণীর অন্তর্ভুক্ত "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যতটুকু তোমাদের সাধ্য ও সামর্থের পরিধিতে থাকে" (সুরা তাগাবুন, ৬৪: ১৬)।

সুতরাং যখন দু'টি আবশ্যকীয় দায়িত্ব একত্রিত হয়ে যায়, যার মধ্যে সমন্বয় সাধন অসম্ভব তখন অপেক্ষাকৃত বেশি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অপর কাজটি তখন আর আবশ্যক থাকে না এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের কারণে যে কাজটি ছেড়ে দেওয়া হয় প্রকৃতপক্ষে তার মাধ্যমে কোনো ওয়াজিব তথা আবশ্যক কাজ পরিত্যাগ হয় না।

এমনিভাবে যখন দু'টি হারাম তথা নিষিদ্ধ কাজ একত্রিত হয়ে যায় যেখানে অপেক্ষাকৃত হালকাভাবে নিষিদ্ধ কাজটি করা ব্যতীত বড়টি থেকে বিরত থাকার সুযোগ থাকে না, তখন হালকা কাজটি প্রকৃতপক্ষে আর নিষিদ্ধ থাকে না। যদিও

---

[১] এটি এ দিকেই দিকনির্দেশনা দিচ্ছে যে, অমুসলিম শাসনের অধীনে মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করা বৈধ হবে। তবে তা ইতিপূর্বে উল্লেখিত শর্তাবলীর আলোকে হতে হবে।

সাধারণ বিবেচনায় ইতোপূর্বে বলা হয়েছে ওয়াজিব ত্যাগ করা এবং এখন বলা হচ্ছে নিষিদ্ধ কাজ করা, কিন্তু এতে অপরাধ বা ক্ষতিকর কিছুই নেই। এ সকল ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে ওয়াজিব ত্যাগ করা হয়েছে তা ওজর বা সমস্যার বিবেচনায় এমনিভাবে যে নিষিদ্ধ কাজটি করা হয় তা প্রয়োজনীয় বা অগ্রাধিকাযোগ্য কোনো কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কিংবা তার থেকেও কঠিনভাবে নিষিদ্ধ কোনো বিষয়কে প্রতিহত করার লক্ষ্যেই এমনটি করা হয়ে থাকে।

ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের পরস্পর বিরোধিতার এ অধ্যায় খুবই প্রশস্ত ও ব্যাপক। বিশেষ করে স্থান কাল নির্বিশেষে যখন নবুয়্যতের আলোকরশ্মি হালকা হয়ে আসে তখন এ ধরনের জিজ্ঞেসার আধিক্য দেখা দেয়। যখনি নবুয়্যতের শিক্ষার ঘাটতি দেখা দেয় তখনি এ ধরনের বিধান বেশি পরিমাণে দেখা দেয়। এ ধরনের জিজ্ঞাসা উম্মতের মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদের জন্ম দেয়। কারণ যখন ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণ সংমিশ্রিত হয়ে যায় তখন মানুষ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। কতিপয় সম্প্রদায় ভালো কাজের বিবেচনা করে থাকে এবং তারা এটিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে যদিও তা বড় বড় অনেক খারাপ বিষয় ও কাজকে আবশ্যক করে। অপর এক সম্প্রদায় মন্দ কাজের বিবেচনা করে থাকে এবং তারা এটিকেই অগ্রাধিকার দিতে থাকে যদিও তা করতে গিয়ে বড় বড় অনেক ভালো বিষয় ও কাজ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। মধ্যমপন্থী এবং উত্তম হচ্ছে তারাই যারা উভয় দিকই বিবেচনা করতে সক্ষম হয়।

এ জাতীয় জিজ্ঞাসা ও সমস্যাদিতে আলেম-উলামাদের উচিত গভীর চিন্তা-গবেষণা করা। এ ধরনের বিষয়ে কখনো আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি এড়িয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন- এমন কাজের নির্দেশ দেওয়া যা এর থেকে বড় অপরাধের জন্ম দেয়, এমতাবস্থায় এ অপরাধ প্রতিহত করার লক্ষ্যে এ ধরনের নির্দেশ লঙ্ঘন করতে হবে। যেমন- জালেম শাসকের কাছে কোনো অপরাধীকে পেশ করা, অতঃপর সে শাস্তি প্রদানের বাড়াবাড়ি করবে যা অপরাধকর্মের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর এবং মারাত্মক হতে পারে। সুতরাং এমতাবস্থায় শাসকের কাছে এ ধরনের কোনো অপরাধীকে পেশ করা বিরত থাকতে হবে। এমনিভাবে এমন কোনো গর্হিত কাজ থেকে সাবধান করা যা থেকে দূরে থাকতে গিয়ে এর থেকেও বড় কোনো লাভ কিংবা কল্যাণ হাতছাড়া হয়ে যায়। সুতরাং শুধুমাত্র এ ধরনের গর্হিত কাজ ত্যাগ করতে গিয়ে যদি আল্লাহ ও তাঁর রসুল নির্দেশিত এমন কাজ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে যে এর থেকেও বেশি বড় ও কল্যাণকর, তাহলে এমতাবস্থায় তা থেকে নিষেধ করার ব্যাপারে নীরব থাকাই উত্তম হবে।[২]

---

[২] ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া সমগ্র থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত : ৩০/৪৮-৬১।

অমুসলিমদের পার্লামেন্টে মনোনয়ন প্রদান

প্রশ্ন: রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রশ্নের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি কামনা করছি। সত্যিকার ইসলামি রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় এর সমাধান জানিয়ে আমাদেরকে বাধিত করার বিনীত আবেদন করছি।

প্রশ্ন হচ্ছে অমুসলিম যারা ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে থাকে তারা কি পার্লামেন্ট কিংবা মজলিসে শুরা তথা মন্ত্রিপরিষদ ইত্যাদিতে প্রবেশের জন্য চেষ্টা করতে পারবে? অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করা বা প্রার্থী হওয়ার কি সুযোগ থাকবে? যদি তাদের এ সুযোগ থাকে তাহলে মুসলমানদের জন্য কি বৈধ হবে তাদেরকে নির্বাচন করা বা ভোট দিয়ে তাদেরকে সমর্থন দেওয়া, না-কি তা হারাম বলে বিবেচিত হবে? কারণ এর মাধ্যমে মুসলিমের উপর অমুসলিমের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, অথচ আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন "আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করার কোনো পথই রাখেননি" (সূরা নিসা, ৪: ১৪১)।

আমাদের প্রবীণদের কয়েকজনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তারা এমনটি সমাধান দিয়েছেন।

আবার হয়তোবা অনেকেই একে অমুসলিমের সাথে মুসলিমের বন্ধুত্ব বা বিশেষ সম্পর্ক বলে বিবেচনা করে থাকেন। কুআনের একাধিক আয়াতে এ ধরনের বন্ধুত্ব বা বিশেষ সম্পর্ক থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন- ইরশাদ হয়েছে "মুমিনরা যেন ইমানদারদের বাদ দিয়ে কখনো কাফেরদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে গ্রহণ না করে। যে এমনটি করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ, তাদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা যদি বাহ্যত এ নীতি অবলম্বন করে তাহলে তা মাফ করে দেওয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন আর তোমাদেরকে তো তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে" (সূরা ইমরান, ৩: ২৮)। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে "হে ইমানদারগণ! যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য (জন্মভূমি ছেড়ে ঘর থেকে) বেরিয়ে থাকো তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। তোমরা যাদের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করো, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাদের আচরণ হলো, তারা রসূলকে এবং তোমাদেরকে শুধু এই অপরাধে জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছো। তোমরা গোপনে তাদের কাছে বন্ধুত্বমূলক পত্র পাঠাও; অথচ তোমরা গোপনে যা করো এবং প্রকাশ্যে যা করো তা সবই আমি ভালো করে জানি। তোমাদের মধ্য থেকে যে

ব্যক্তিই এরূপ করে নিশ্চিতভাবেই সে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে"। (সুরা মুমতাহিনা ৬০: ০১)

এ বিষয়টি ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের অন্তরে বিশেষ করে যুবকদের মাঝে নানাবিধ সন্দেহ ও প্রশ্নের সৃষ্টি করে চলছে। ইসলামি আইনবিধি বিশেষ করে যারা মধ্যমপন্থাকে তাদের কর্মনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাদের কাছে আমাদের দাবি হচ্ছে তারা যেন এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে স্টাডি করে শরিয়তের যুক্তি-প্রমাণসহ এর বিস্তারিত সমাধান পেশ করেন, যাতে কওে আমরা কট্টরপন্থীদের বাড়াবাড়ি এবং অবহেলা প্রদর্শনকারীদের খেয়ালিপনার মাঝে হারিয়ে না যাই।

আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার তওফিক দান করুন এবং প্রত্যেক ভূখণ্ডে আপনাদের মাধ্যমে ইসলামের সন্তানদের উপকৃত করুন।

কতিপয় ধর্মপ্রাণ মুসলিম যুবক

জবাব: সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্যই নিবেদিত। দরুদ ও সালাম মুহাম্মদ রসুলুল্লাহর সা. প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম এবং সকল অনুসারীর প্রতি। আল্লাহ তায়ালা সকলের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

আল্লাহর প্রশংসা ও দরুদ সালামের পর ...

অধিকাংশ শিক্ষার্থী, বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান সমস্যা হচ্ছে: বড়, গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক বিষয়দিতেও তারা কোনো গভীর অধ্যয়ন, বিশেষ চিন্তা-গবেষণা এবং জ্ঞানবান বুদ্ধিজীবীদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ ব্যতীত তাড়াহুড়া করে সমাধান দেওয়া এবং ফতোয়া প্রদানের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের মধ্যে যারা বয়সে একটু বড় কিংবা পড়াশোনার ময়দানে যাদের কদম একটু মজবুত তারা এ ধরনের কাজে বেশি অগ্রসরমান। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গই কখনো নিজের অজান্তে শরিয়াহ বর্ণিত হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করে দেয়, কিংবা কোনো আবশ্যক করণীয় কাজকে রহিত করে দেয়। আবার কখনো কোনো মুস্তাহাব কাজকে ওয়াজিব বানিয়ে দেয় কিংবা কোনো মাকরুহ কাজকে হারামের পৌঁছে দেয়। কখনো আবার সগিরা গুনাহকে কবিরাহ গুনাহের সমপর্যায়ের বিবেচনা করে থাকে। এ সকল লোকদের কতিপয়কে দেখা যাবে তারা আল্লাহ প্রদত্ত সহজ-সরল বিধি-বিধানকে কঠিন করে তুলছে কিংবা শরিয়তের সাধারণ বিষয়াবলী জটিল করে দেখতে অথবা শরিয়তের ব্যাপক গণ্ডিকে সংকীর্ণ করে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ বিষয়টি নিয়েই রসুল সা. কতিপয় সাহাবিকে নিন্দাবাদ করেছিলেন, যখন তারা তাড়াহুড়া করে না জেনেই ফতোয়া প্রদান করেছিল এবং তাদের এ ফতোয়া অন্যায়ভাবে একজন মুসলিমের মৃত্যুর হয়েছিল। কোনো এক যুদ্ধে জনৈক সাহাবি

যখন হয়ে আহত হয়ে পড়ছিল, অতঃপর তাকে নাপাকী পেয়ে বসলে পবিত্রতা অর্জন করা তার উপর আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। তখন তার সাথীরা তাকে গোসল করার আবশ্যকতার ফতোয়া দিয়েছিল। আহত লোকটি গোসল করলে তার রোগ বেড়ে যায় এবং সে কারণে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন! রসূল সা. কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি বলেন, তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে এর প্রতিদান দান করুন! সমাধান জানা না থাকলে তারা কেন জিজ্ঞেস করে নেয় নি? অক্ষমতা ও অজ্ঞতার চিকিৎসা হচ্ছে জিজ্ঞাসা। তার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে সে তার জখমের উপর পট্টি বেধে অতঃপর তার উপর তায়াম্মুম করে নিবে..."।

এই ধারাবাহিকতায় যখন আমরা দেখি এদের কেউ পার্লামেন্ট কিংবা আইনসভা অথবা মজলিশে শুরা ইত্যাদিতে অমুসলিমদের প্রবেশ বা মনোনয়ন আদান-প্রদানকে হারাম বলে এবং তাদেরকে ভোট প্রদান করা মুসলমানদের জন্য হারাম হাওয়ার ফতোয়া দেন, তাহলে এতে আমরা অবাক হওয়ার কিছু দেখি না। বরং আমরা দেখি এদের কেউ মুসলমানদের ক্ষেত্রেও তা হারাম হওয়ার ফতোয়া দিয়ে থাকেন, অর্থাৎ স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও পার্লামেন্ট কিংবা আইনসভা অথবা মজলিশে শুরা ইত্যাদিতে প্রবেশ বা মনোনয়ন নেওয়া হারাম! আর এ ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হচ্ছে যে ব্যক্তি সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দেয় সে মূলত নিজেই নিজের জন্য কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কামনা করে থাকে। আর যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব কামনা করে তাকে তা দেওয়া হয় না। যেমন সহিহ হাদিস এসেছে, রসুল সা. বলেন "যারা ক্ষমতা প্রার্থনা করে কিংবা তার আকাঙ্ক্ষা করে আমরা তাদের হাতে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করি না"। সাহাবি আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ কে রসূল সা. বলেন "কখনো ক্ষমতা কিংবা নেতৃত্ব কামনা করবে না, তুমি যদি তা চেয়ে নাও তাহলে এর দায়িত্ব তোমার কাঁধেই তুলে দেওয়া হবে, আর যদি না চেয়ে তা পাও তাহলে তোমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সহযোগিতা করা হবে"। সুতরাং যেখানে তারা মুসলমানের জন্য সংসদ ইত্যাদিতে মনোনয়ন নেওয়াকে হারাম বলে থাকে সেখানে অমুসলিমদের জন্য তা হারাম বলার মধ্যে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। আমি যা মনে করি সংসদে এ ধরনের মনোনয়ন সুনির্দিষ্ট একটি এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব মাত্র, এটি এমন কোনো ক্ষমতা বা নেতৃত্বের কোনো অংশ নয়, যার প্রতি কামনা-বাসনাকে হাদিস শরিফে নিন্দা করা হয়েছে। সংসদ সদস্য সে রাষ্ট্রপতি কিংবা আমির নয়, নয় কোনো মন্ত্রী অথবা স্টেট গভর্নর ইত্যাদি; বরং সে সংসদে তার এলাকার জনগণের প্রতিনিধি মাত্র, যেখানকার কাজ হচ্ছে আমির-ওমরাহ, মন্ত্রী কিংবা গভর্নর ইত্যাদির যাবতীয় কর্মতৎপরতার পর্যালোচনা করা। তাই সে অপরের পর্যালোচনা করে থাকে, তাকে কোনো প্রকার পর্যালোচনা করা হয় না; কারণ তার এমন কোনো কর্মতৎপরতা নেই যার পর্যালোচনা করা হবে।

এরপর সে এমন বিষয়ে জাতির জন্য আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকে যেখানে ইসলামের সুস্পষ্ট আক্ষরিক কোনো বিধান নেই। আর তা করা হয় "ক্ষমা ও উদারতার এলাকায়" যেখানে কোনো আক্ষরিক বিধান পাওয়া যায় না অথবা এমন শব্দ বা বাক্য পাওয়া যায় যার অস্তিত্ব, কিংবা অর্থ ও ব্যাখ্যা কিংবা উভয়টিতে একাধিক সম্ভাবনা রয়েছে। অমুসলিমরাও ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক, তাই সংসদ কিংবা আইন সভা ইত্যাদিতে তাদের প্রবেশাধিকার প্রদানে শরিয়তে কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা না থাকাটাই স্বাভাবিক, যাতে তারা তাদের এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাছাড়া ইসলামি রাষ্ট্রের সংসদ, আইনসভা কিংবা শুরা ইত্যাদিতে মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যেহেতু থাকছেই; সুতরাং এতে অসুবিধার কিছু নেই। ইতোপূর্বে আমরা নারীদের মনোনয়ন এবং তাদেরকে ভোট প্রদানের বিষয়ে বলেছিলাম; কারণ স্বাভাবিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পুরুষেরই থাকে। তাই-নারীদের সংসদে প্রবেশাধিকার প্রদানে সমস্যার কিছু নেই। একই ভাষায় আমরা এখানে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রসঙ্গেও বলব যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্রের সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা মুসলমানদেরই থাকে; তাই কতিপয় অমুসলিমকে এখানে প্রবেশাধিকার প্রদানে কোনো সমস্যা বা বিধি-নিষেধ নেই। ইসলামি আইনবিদগণের মতামত হচ্ছে কোনো ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলিম নাগরিকের যে সুযোগ-সুবিধা রয়েছে একই রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদেরও একই সুযোগ-সুবিধা থাকবে। এমনিভাবে মুসলমানদের উপর যে দায়-দায়িত্ব রয়েছে অমুসলিমদের উপরও একই দায়-দায়িত্ব রয়েছে। কুরআন কারিম ঘোষণা দিচ্ছে "যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়িঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের পছন্দ করেন" (সুরা মুমতাহিনা, ৬০: ৮)।

তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচারের মধ্যে রয়েছে সংসদ ইত্যাদিতে তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া যাতে তারা তাদের জনগোষ্ঠীর চাওয়া-পাওয়ার বিষয়গুলো পেশ করতে পারে, যেমনিভাবে নারীরা স্বজাতির দাবিগুলো পেশ করে থাকে এবং তারা যাতে তাদের স্বদেশীয় ভাইদের থেকে একাকীত্ব ও অসহায়ত্ব অনুভব না করে। এমনটি হলে ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনরা তাদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা ও প্রতিহিংসার বীজ ঢুকিয়ে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করবে। আর তা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য ক্ষতি ও অকল্যাণ ডেকে আনবে।

ইতিহাসের পাতায় চোখ ফেরালে দেখা যায় যে, মুসলমানরা তাদের রাষ্ট্রে কর দিয়ে বসবাসরত অমুসলিমদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব দিয়েছে, এর মধ্যে

কার্যনির্বাহী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও ছিল। এছাড়াও আব্বাসীয় আমলে আরো নানাবিধ মন্ত্রণালয়ে তাদের দায়িত্ব পালনের উদাহরণ পাওয়া যায় এবং এও দেখা যায় যে, সে সময়ের কোনো আলেম এ বিষয়টিকে অস্বীকার ও নিন্দাবাদ করেননি। তবে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জুলুম-অত্যাচার, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিল তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। তবে-দুঃখের বিষয় হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এমনটিই বেশি ঘটেছে। মুসলিমের উপর অমুসলিমের কোনো কর্তৃত্ব নেই, এ যুক্তির আলোকে অমুসলিমদেরকে মন্ত্রণালয় বা এ জাতীয় কোনো দায়িত্ব দেওয়া যাবে না - এমনটি কোনো নির্ভরযোগ্য ইসলামি আইনবিদ বলেননি। কারণ মুসলমানরাই তো তাদের দ্বীনের দিকনির্দেশনার আলোকে অমুসলিমদেরকে এ সকল পদের দায়িত্ব দিয়েছিল। আর তাদের মন্ত্রণালয় কিংবা কর্মপরিধিতে তারাই তো পৃষ্ঠপোষক ও কর্তা; কিন্তু তা মুসলমানদের সার্বিক নেতৃত্ব ও ক্ষমতার তত্ত্বাবধানেই ছিল।

ইসলামের বিধান হচ্ছে মুসলমানরা আহলে কিতাবের রমণীদের বিবাহ করতে পারবে। সুতরাং আহলে কিতাবের রমণীরা তাদের ঘরের রানি এবং তাদের সন্তানের মাতা হবে। আর এর মাধ্যমে তারা পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের উপর এক প্রকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে থাকে। যেমনটি ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত মুত্তফাকুন আলাইহি হাদিসে এসেছে "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। এর মধ্যে রয়েছে নারী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল এবং তাকে তার প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে"। কিন্তু স্বামীর ঘরে মহিলার এ দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব পুরুষের তত্ত্বাবধানে এবং মুসলিম সমাজের সার্বিক নেতৃত্বের আয়ত্তাধীনেই হয়ে থাকে।

অপরদিকে অমুসলিমদেরকে সংসদে ইত্যাদিতে প্রবেশাধিকার প্রদানে নিষেধাজ্ঞার ওপর যে যুক্তি পেশ করা হয় তা হচ্ছে যে, এটি অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করার অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে কুরআন কারিমে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ কথার প্রবক্তাদের আমরা বলব যে, আমাদেরকে সর্বপ্রথম তাদের সাথে নিষিদ্ধ বন্ধুত্বের পরিধি এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা জানতে হবে যাতে এর উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত বিধান সঠিক ও শুদ্ধ হয়। কোনো বিষয়ে হুকুম জারি করার পূর্বে বিষয়টির সঠিক অর্থ ও পরিধি জেনে নেওয়া একান্ত জরুরি যাতে যাবতীয় বিষয় এলোমেলো হয়ে না পড়ে।

অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত আয়াত থেকে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ যা বুঝে নিয়েছেন তা হচ্ছে, উক্ত আয়াতে অমুসলিমদের সাথে যাবতীয় সম্পর্কচ্ছেদ, তাদের বিরোধিতা এবং তাদেরকে অপছন্দ ও ঘৃণা করার প্রতিই নির্দেশনা দিয়েছে, যদিও তারা ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক, মুসলমানদের একান্ত

অনুগত এবং দুশমন ও সীমালঙ্ঘনকারীদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সাথে একই সারিতে দণ্ডায়মান হোক না কেন।

অথচ বাস্তব কথা হচ্ছে যে, কেউ যদি উক্ত আয়াত নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করবে এবং তা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় অধ্যয়ন করে তার কাছে নিম্নোক্ত বিষয়াদি স্পষ্ট হয়ে যাবে :

প্রথমত: কুরআনের আয়াতে যে ধরনের বন্ধুত্ব থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা হচ্ছে অমুসলিমদের দ্বীন-ধর্ম, আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা ও যাবতীয় রীতি-নীতি ইত্যাদির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা। অর্থাৎ প্রতিবেশী কিংবা সহকর্মী অথবা একই দেশের নাগরিক হিসেবে নয়; বরং ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক ইত্যাদি পরিচয় হিসেবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানের বন্ধুত্ব ও আনুগত্য তো অবশ্যই এককভাবে তার জাতির প্রতিই হতে হবে। তাইতো মুসলমানদের বাদ দিয়ে অমুসলিমদেরকে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করা থেকে সাবধান করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "মুমিনরা যেন ইমানদারদের বাদ দিয়ে কখনো কাফেরদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে গ্রহণ না করে। যে এমনটি করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ, তাদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমরা যদি বাহ্যত এ নীতি অবলম্বন করো তাহলে তা মাফ করে দেওয়া হবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন আর তোমাদেরকে তো তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে" (সুরা ইমরান, ৩: ২৮)। অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে "হে ইমানদারগণ! মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও?"। (সুরা নিসা, ৪: ১৪৪) অপর এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে "আর যেসব মুনাফিক ইমানদারদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে, এ 'সুসংবাদটি' তাদেরকে জানিয়ে দাও। এর কি মর্যাদা লাভের সন্ধানে তাদের কাছে যায়? অথচ সমস্ত মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত" (সুরা নিসা, ৪: ১৩৮, ১৩৯)। অর্থাৎ অপর একটি দলের বা দ্বীনের অনুসারী হিসেবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং তাদেরকে সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করা। কোনো জীবনব্যবস্থাই, তা পার্থিব হোক কিংবা ধর্মীয় হোক, এটা কখনো

মেনে নিবে না যে তার অনুসারীরা অপর একটি দ্বীন বা অপর কোনো জীবনব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার অনুসারীদের সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং তাদেরকেই সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করে চলবে, আধুনিক ভাষায় যা খেয়ানত ও অবিশ্বাসেরই নামান্তর।

দ্বিতীয়ত: যে বন্ধুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে তা সাধারণভাবে অন্য ধর্মের অনুসারী সকলের সাথে নয়। যদি তারা মুসলমানদের অনুগত থাকে এবং তাদের সাথে সহাবস্থান মেনে নেয় তাহলে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এবং বন্ধুত্ব করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে শুধুমাত্র তাদেরই সাথে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সা. সাথে বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে থাকে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ এ দিকেই নির্দেশনা দিচ্ছে:

১. ইরশাদ হয়েছে: "তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ইমান পোষণ করে তারা এমন লোকদের ভালো বাসছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে চলছে"। (সুরা মুজাদালা, ৫৮: ২২) আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা শুধুমাত্র তাদের প্রতি অবিশ্বাস করার নাম নয়; বরং তাদের দাওয়াতের বিরোধিতা করা ও এর বিরুদ্ধাচরণ করা, তাদের অনুসারীদের কষ্ট দেওয়া এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

২. অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: "হে ইমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। তোমরা যাদের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করো, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাদের আচরণ হলো, তারা রসুলকে এবং তোমাদেরকে শুধু এই অপরাধে জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছো" (আল মুমতাহিনা, ৬০: ১)।

৩. অত্র আয়াতে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে এবং আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ শুধুমাত্র তাদের অবিশ্বাস এবং কুফরির কারণে নয়, বরং এর সাথে অপর একটি অপরাধ মিলিত হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহর রসুল ও মুমিনদের অন্যায়কে অন্যায়ভাবে তাদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত

করার অপরাধে তাদের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব বজায় রাখা চলবে না।

৪. উক্ত সুরার অপর এক স্থানে বলা হয়েছে "যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়িঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের পছন্দ করেন। আল্লাহ তোমাদেরকে শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে, বাড়িঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্যে করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারাই হবে জালেম" (সুরা মুমতাহিনা, ৬০: ৮-৯)।

দ্বীনের যারা বিরোধীতায় লিপ্ত তাদেরকে অত্র আয়াতে দু'দলের বিভক্ত করা হয়েছে। এক দল যারা মুসলমানদের সাথে শান্তিতে সহাবস্থানে অভ্যস্ত। দ্বীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো যুদ্ধ লিপ্ত হয় না এবং অন্যায়ভাবে তাদেরকে তাদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করে না। তাদের সাথে সদ্ব্যবহারও আদল-ইনসাফ করতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়নি।

অপর দল যারা মুসলমানদের সাথে শত্রুতামূলক অবস্থানে অভ্যস্ত। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাদেরকে অন্যায়ভাবে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করে এবং এ ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। এদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে এবং এদেরকে পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমনটি করেছে মুশরিক সম্প্রদায় যাদের হাতে মুসলমানদেরকে অনেক দুঃখ-যাতনা সইতে হয়েছিল। আয়াতের ভাবার্থ থেকে বোঝা যাচ্ছে এরা ব্যতীত অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং তাদেরকে সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

তৃতীয়ত: আহলে কিতাবের রমণীদের সাথে মুসলমানদের বিবাহ ইসলামে বৈধ করা হয়েছে। আর আত্মিক প্রশান্তি, ভালোবাসা, মিল-মহব্বত ইত্যাদির মাধ্যমেই সর্বদা বৈবাহিক সম্পর্ক সার্থক হয়ে ওঠে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া দৃষ্টি করেছেন" (সুরা রুম, ৩০: ২১)।

অত্র আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করতে মুসলমানদের কোনো অসুবিধা নেই। ভালোবাসা ও আত্মিক প্রশান্তি ব্যতীত কিভাবে একজন মুসলমান তার স্ত্রী ও জীবন সাথীর সাথে জীবন অতিবাহিত করবে, যদিও সে আহলে কিতাবের সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে থাকে? কিভাবে সে তার শ্বশুরালয়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় না রেখে থাকতে পারবে, অথচ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "আর তিনিই তো পানি থেকে মানুষ তৈরি করেছেন, আবার তার থেকে বংশীয় ও শ্বশুরালয়ের দু'টি আলাদা ধারা চালিয়েছেন"। (সুরা ফুরকান, ২২: ৫৪) কিভাবে সন্তান তার নানা-নানী ও খালা-মামা ইত্যাদির সাথে বন্ধুত্বহীন ও আত্মীয়তার সম্পর্কে ছিন্ন অবস্থায় জীবনকাল অতিবাহিত করবে যদি তার মাতা আহলে কিতাবের সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে থাকে? এমনিভাবে খালা-মামা ইত্যাদির সন্তান-সন্ততিরাও 'আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ', যাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে, সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণে সচেতন হতে কুরআন ও হাদিসে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থতাঃ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যাবতীয় সম্পর্কের চেয়ে দ্বীনের সম্পর্ক মজবুত করার প্রতি ইসলামে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা বংশীয় সম্পর্ক, কিংবা আন্তদেশীয়, জাতিগত বা শ্রেণিগত যাই হোক না কেন। সকল কিছুর উপর ইসলাম দ্বীনের সম্পর্ককে স্থান দিয়েছে। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, মুমিনরা পরস্পরে ভাই ভাই এবং মুসলমানরা সবাই মিলে এক ও অভিন্ন জাতি। তারা সবাই মিলে একে অপরকে সহযোগিতা করবে এবং তারা একে অপরের সহায়ক শক্তি। যে কোনো কাফিরের তুলনায় এক মুসলিম অপর মুসলিমের বেশি নিকটে, যদিও সে কাফির তার পিতা কিংবা সন্তান অথবা ভাই-ভ্রাতার মধ্য থেকে হোক না কেন।

এটি এককভাবে শুধু ইসলাম ধর্মে নয়; বরং প্রতিটি ধর্মেই এমনটি রয়েছে। ইঞ্জিল অধ্যয়নে এ ধরনের বিষয় একাধিক স্থানে পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা আবশ্যক যে, ধর্মীয় সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ব ছাড়াও আরো একাধিক ভ্রাতৃত্ব রয়েছে, ইসলাম যেগুলোর স্বীকৃতি দিয়েছে।

এখানে রয়েছেঃ দেশীয় সম্পর্ক, জাতিগত ভ্রাতৃত্ব, মানবিক সম্পর্ক ইত্যাদি। কুআনের ইরশাদ করা হয়েছে "নূহের সম্প্রদায় রসূলদেরকে মিথ্যুক বললো। স্মরণ করো যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না" (সুরা আশ-শুআরা, ২৬: ১০৫-১০৬)। "লূতের সম্প্রদায় রসূলদেরকে মিথ্যুক বললো। স্মরণ করো যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলেছিল ..." (সুরা আশ-শুআরা, ২৬: ১৬০-১৬১)। আ'দ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "যখন তাদের

ভাই হুদ তাদেরকে বলেছিল ..." (সুরা আশ-শুআরা, ২৬: ১২৪)। এমনিভাবে সামুদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে "যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলেছিল ..." (সুরা আশ-শুআরা, ২৬: ১৪২)। এ সকল নবি-রসুলদের তাদের জাতির ভাই বলা হয়েছে, অথচ তারা তো নবিদের দাওয়াতের প্রতি ইমান আনেনি; বরং তা অবিশ্বাস করে চলছে। এর থেকে যা বোধগম্য হয় তা হচ্ছে, এখানে ভাই বলতে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং জাতিগত ভ্রাতৃত্ব বুঝানো হয়েছে।

সাহাবি যায়েদ ইবনে আরকামের সনদে ইমাম আহমদ বর্ণিত হাদিসে এসেছে "আমি সাক্ষী যে আল্লাহর সকল বান্দা পরস্পরে ভাই ভাই"। এখানে মানবিক ভ্রাতৃত্ব বুঝানো হয়েছে। একই দেশের নাগরিক হিসেবে মিশরের অধিবাসী মুসলিম ও খ্রিস্টান সকলকে যদি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা হয় এবং তাদেরকে পরস্পরে ভাই মনে করা হয় তাহলে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এর দ্বারা মূলত জাতিগত বা সমদেশীয় ভ্রাতৃত্ব বুঝানো হয়ে থাকে। এমনিভাবে লেবানন, সিরিয়া, জর্দানসহ প্রতিটি আরব ও মুসলিম ভূখণ্ডে বসবাসরত মুসলমান ও খ্রিস্টানরা এক ও অভিন্ন দেশের নাগরিক হিসেবে পরস্পরে স্বদেশীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ।

অপর দিকে কট্টরপন্থীদের সকল উগ্র চিন্তা-ভাবনা এখানে প্রত্যাখ্যাত। তাদের চিন্তাধারা দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে মূলত মুসলিম জাতির দুশমনদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা হয়ে থাকে, যারা সর্বদা মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মুসলিম জাতিকে শতধাবিভক্ত করতে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে তারা নানাবিধ কলা-কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কোথাও শিয়া ও সুন্নি, আরব-অনারব ও আরব-কুর্দি ইত্যাদির মাঝে বিরাজমান সমস্যাকে উস্কে দেয়। আবার কোনো এলাকায় মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে হিংসা ও যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সচেষ্ট থাকে। যদি এরূপ কিছু না পায় তাহলে তারা ভাই-ভাই এর মাঝে পার্থক্য ও হিংসার দেওয়াল সৃষ্টি করতে নিত্য-নতুন কুট-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে। তারা নিজেদের কুট-কৌশল প্রয়োগ করে চলছে, অন্যদিকে আল্লাহও তাঁর কৌশল প্রয়োগ করে যাচ্ছেন আর আল্লাহ সবচেয়ে ভালো কৌশল অবলম্বনকারী" (সুরা আন'ফাল, ৮: ৩০)।

সম্প্রতি ইখওয়ানুল মুসলিমুন এবং তাদের রাজনৈতিক শাখা ফ্রিডম এণ্ড জাস্টিস পার্টি ফ্রন্ট খ্রিস্টানদেরকে তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে, পার্লামেন্টে তাদের সমর্থন এবং উচ্চতর পদে তাদের গ্রহণ করেছে।*

---

* সম্পাদক

ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা

ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা শীর্ষক এই পুস্তক। কাছে অতীত মুসলমানরা এ বিষয়ে যথেষ্ট উদাসীনতা দর্শন করেছে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে এ বিষয়কে যথাযথ মূল্যায়ন করেনি, যেমনিভাবে ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে করেছে বিশেষত ইবাদতের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে করেছে। যার ফলস্বরূপ তা বিশাল ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

ইমাম ইবনুল কাইয়েম র. তার যুগের (অষ্টম শতাব্দী) সমসাময়িক ফকিহদের গবেষণার ক্ষেত্রে স্থবিরতার অভিযোগ করেছেন, যার ফলে প্রয়োজনের নিরিখে রাজা-বাদশাহ ও শাসকবর্গ ইসলামি শরিয়াহ থেকে দূরে অবস্থান করে নিজেদের স্বার্থ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনার বিধি-বিধান তৈরি করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়েম র. শাসক গোষ্ঠীর পথভ্রষ্টতা এবং সহজ সরল ইসলামি জীবনব্যবস্থা থেকে তাদের দূরে অবস্থান ও এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির দায়-দায়িত্ব সকল স্থবির ও অলস ফকিহদের উপর চাপিয়েছেন। সম্ভবত এটাই হচ্ছে ইসলামি জীবনব্যবস্থার স্থলে মানব রচিত জীবনব্যবস্থার প্রথম অনুপ্রবেশ।

বর্তমান যুগের এ সকল স্থবির ফিকাহবিদরা পশ্চাতে অবস্থান করেছে। তারা এখন হিজরি পঞ্চদশ শতক বসবাস করছে বটে, কিন্তু এখনও তারা এমন বুদ্ধি-বিবেক চিন্তা করে থাকে যা কয়েক যুগ পূর্বেই দাফন হয়ে গেছে। কয়েক যুগ পূর্বে অতিবাহিত হয়ে যাওয়া ফকিহগণ যে অবস্থায় জীবনাতিবাহিত করেছেন তার সবকিছুই এখন প্রায়ই পরিবর্তন হয়ে গেছে। স্থবিরতায় রোগাক্রান্ত বর্তমানের সকল ফকিহগণ ভুলে বসেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী র. স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তার মতামত (মাজহাব) পরিবর্তন করেছিলেন। প্রাচীন ও নতুন নামে তার দুটি মাজহাব পাওয়া যায়। ইমাম আবু হানিফার র. অনুসারীরা যুগের ভিন্নতার কারণে প্রায়ই এক তৃতীয়াংশ মাসআলায় তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন, এবং তারা এও বলেছেন "যদি আমাদের ইমাম জীবিত থাকতেন তাহলে তিনিও তার মতো পরিবর্তন করে আমাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করতেন"। একই বিষয়ে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের একাধিক মতামত পাওয়া যায়, এমনকি কখনো সাতটি বা ততোধিক পর্যন্ত পাওয়া যায়। ব্যক্তি, সময়, যুগ, অবস্থা ইত্যাদির পরিবর্তনের কারণেই অধিকাংশ সময় এ ধরনের হয়ে থাকে।

ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা সম্বলিত এ পুস্তক। যেখানে ইসলামে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিধি-বিধান তথা এর মর্যাদা কি? এ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকার হুকুম কি? এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী কি? এর প্রকৃতি কি? এটি কি বেসামরিক ও নাগরিক

কোনো রাষ্ট্র যেখানে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়, না স্বৈরাচারী ধর্মীয় পৌরহিত্য কোনো রাষ্ট্র? ইসলামি রাষ্ট্র ঈশ্বরতান্ত্রিক ধর্ম রাষ্ট্রেরই ফটোকপি বলে যারা মনে করেন তাদের প্রতিউত্তরে কি বলা হবে? বহুদলীয় গণতন্ত্র, নারী এবং অমুসলিমদের বিষয়ে এ রাষ্ট্রের অবস্থান কি? কোনো ইসলামি দলের জন্য সেক্যুলারিজম কোনো রাষ্ট্রের শাসনকার্যের অংশগ্রহণ করা বৈধ হবে কি-না? ইত্যাদি যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এ পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে।

আশা করি আলোচ্য বইয়ের এ কয়টি অধ্যায় আমাদেরকে ইসলামে রাষ্ট্রনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করতে, এ বিষয়ে আরোপিত বিভিন্ন সন্দেহের নিরসন ঘটাতে এবং স্থবিরতায় আক্রান্ত ও অস্বীকারকারী উভয় জনগোষ্ঠীর মাঝামাঝি অবস্থান নিতে সহযোগিতা করতে সক্ষম হবে।

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

গ্রন্থ পরিচিতি

গবেষণার ব্যাপ্তি ইবাদতের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিশালতা ও ব্যাপকতা লাভ করলেও রাষ্ট্র গঠণের মূলনীতির বিষয়ে নিকট অতীতের মুসলিম বুদ্ধিজীবিগণ বেশ উদাসীনতাই প্রদর্শন করেছে। তাই ইসলামে রাষ্ট্র গঠনের মূলনীতিসমূহই হচ্ছে এ গ্রন্থের আলোচ্যবিষয়। অর্থাৎ ইসলামে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব কী? এ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকার হুকুম কী? এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী ও প্রকৃতি কী? এটি কি বেসামরিক ও নাগরিক কোন রাষ্ট্র, যেখানে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়, নাকি স্বৈরাচারী ধর্মীয় পৌরহিত্য কোন রাষ্ট্র? ইসলামি রাষ্ট্র ঈশ্বরতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই প্রতিলিপি বলে মনে করেন যার তাদের প্রতিত্তোরে কি বলা হবে? বহুদলীয় গণতন্ত্র, নারী এবং অমুসলিমদের বিষয়ে এ রাষ্ট্রে অবস্থান কী? কোনো ইসলামি দলের জন্য সেক্যুলার কোনো রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা বৈধ হবে কি-না? ইত্যাদি যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক পরিচিতি

বিখ্যাত মিশরীয় পণ্ডিত, ইসলামি চিন্তাবিদ ও কুশলী প্রফেসর ড. ইউসুফ আল-কারযাভীর জন্ম ১৯২৬ সালে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তিনি আল আজহারেই লেখাপড়া করেন। ১৯৭৩ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসুল আল দ্বীন অনুষদ হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. কারযাভী আল আজহার ইনস্টিটিউটে মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনার সময়ই তার প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে শিক্ষকদের কাছ থেকে আল্লামা বা মহান পণ্ডিত খেতাবে ভূষিত হন।

বর্তমানে তিনি জেদ্দাস্থ ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ফিকাহ একাডেমি, মক্কাভিত্তিক রাবেতা আল আলম আল ইসলামির ফিকাহ একাডেমি, রয়াল একাডেমি ফর ইসলামিক কালচার এন্ড রিসার্চ জর্ডান, ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার অক্সফোর্ড-এর সদস্য, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্স- এর প্রেসিডেন্ট এবং কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডীন। তিনি বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম এর ট্রাস্টি বোর্ডেরও সদস্য।

তাঁর এ পর্যন্ত ৪২ টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা, ইংরেজি, তুর্কি, ফার্সি, উর্দু, ইন্দোনেশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য অনেক ভাষায় তার বই অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে- ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, ইসলামের জাকাত বিধান, ইসলামি শরিয়াতের বাস্তবায়ন, ইসলামি পুনর্জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ্ বইগুলো বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ড. কারযাভী পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, আরব ও মুসলিম দেশসমূহ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছেন। তিনি বাংলাদেশেও বেশ কয়েকবার এসেছেন।

ISBN : 978-984-8471-38-8